পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নির্দেশিত নূতন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী স্কুল ফাইনাল, উচ্চমাধ্যমিক ও সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য লিখিত।

মনোবিজ্ঞান

(ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান সহ)

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য)

পুষ্প অধিকারী এম. এ. (ডবল) বি. টি
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), সাহিত্য তীর্থ (বিশ্বভারতী)
প্রধান শিক্ষিকা, দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যামন্দির
অশ্বিনী নগর ২৪ পরগণা।
প্রাক্তন শিক্ষিকা, হোলি চাইল্ড ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা।

মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
পি, ১৮৮ ব্লক সি বাঙুর এ্যাভিন্যিউ
কলিকাতা-৫৫

প্রকাশক :
কনিকা সাহা
মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি
পি, ১৮৮ ব্লক সি
বাঙ্গুর এ্যাভিন্যিউ
কলিকাতা-৫৫

প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ সাল

মূল্য : ৯৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীমতি পুষ্প অধিকারী এম. এ. বিটি লিখিত মনোবিজ্ঞান বইখানির পাণ্ডুলিপি পড়িলাম; পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমার এই আনন্দের কারণ দ্বিবিধ। লেখিকা একজন আমার প্রাক্তন ছাত্রী এবং দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বইখানি রচিত হইয়াছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষ অনুরাগী।

অধুনা মনোবিদ্যাকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সুকুমার মতি বালক বালিকাদের উপযোগী মাতৃভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। লেখিকা একজন কৃতী শিক্ষিকা। শিক্ষণ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর মাধ্যমে মনোবিদ্যার জটিল তত্ত্বগুলির অবতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা আলোচ্য গ্রন্থটির বৈশিষ্টের অন্যতম কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মনোবিজ্ঞানের পরিভাষার তালিকা সম্পূর্ণ নয় বলিয়া তিনি কিছু কিছু নূতন শব্দ আহরণ করিয়াছেন। ইংরাজী প্রতি শব্দগুলিও স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে যে শব্দগুলি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বিষয়বস্তু সহজ হইয়াছে এবং এই বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বইখানির অধ্যায়গুলি সুন্দরভাবে সাজানো। ভাষা সর্বত্র প্রাঞ্জল ও সাবলীল। কাজেই বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষার্থী মনোবিজ্ঞানকে পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে এই বইখানি তাহাদের উপকারে লাগিবে। বাংলা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার ও আদর বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৭০

গৌরবরণ কপাট এম-এস-সি, ডি-ফিল
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর
শিক্ষা বিভাগের রীডার।

ভূমিকা

হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতাকালে ছাত্রীদের প্রয়োজনে মনোবিজ্ঞান প্রথম সংস্করণ রচিত হয়েছিল এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ সমাদরও লাভ করেছিল। প্রথম সংস্করণের বইগুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় আর নূতন করে লেখার খুব বেশী ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নানা জায়গা থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে আবার নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বইখানি রচনা করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলাম।

বইটি রচনা করার সময় প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছি ভাষা বোধগম্য ও সরল করার জন্য এবং যথাসাধ্য বাংলাপরিভাষাও ব্যবহার করেছি; বাংলা পরিভাষাগুলি বোঝার জন্য পাশে ইংরেজী শব্দগুলিও লিখেছি।

বইটি ছাপানোর জন্য শক্তি প্রেস প্রিণ্টার্স আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণের মত এবারের 'মনোবিজ্ঞান'-ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমাদর লাভ করবে বলে আশা করছি।

পি, ১৮৮ ব্লক সি বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৫৫
২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৯

ইতি
পুষ্প অধিকারী

PSYCHOLOGY

Revised syllabi in Psychology for the School Final And Higher Secondary Examinations.

CLASSES IX & X

Page

A. *Theoritical* :

1. Psychology—a study of mind and behaviour. Experience analysed. Subject matter of Psychology distinguished from subject matter of Natural Science. 25
2. Uses of Psychology in different fields of life—Education, Clinicalsphere, Industry and Vocation, Social sphere. 10
3. Physiological basis of mental life. Central Nervous system.
4. Human behaviour—Motives, Needs and Drives, Instincts. 15
5. Feelings and Emotions—Their nature, Fear, Anger, Love. 15
6. Perception—Gateway to Knowledge of the outer world. Perception is sensation plus meaning. Gestalt's view. Types of perception—Visual Auditory etc. Errors in perception, Sensation—Sense Organs—S - O—E. formula. 45
7. Learning—Conditioning, Trial and Error, Insight. 15
8. Remembering. Factors of Memory analysed—Learning, Retention, Recognition and Recall, Economy in memorising, Forgetting. 25
9. Attention—Types of attention. 10
10. Elements of Statistics—Frequency Polygon. Mean, Median and Mode. Average Deviation and Standard deviation. Rank—difference—correlation. 15

CLASS XI

11. Methods of Psychology—Introspection, Observation and Experiment. 10
12. Growth of a child after birth. Motor Development, Language Development, Social Development. Adolescence, its problems and needs. 15
13. Concept of Mental health—Behaviour problems Parent—child relationship and its effect on Mental health of the child. 15
14. Intelligence Tests—Their uses in education. 15

B. *Practical* :

Practical portions of the present syllabus in Psychology for the Higher Secondary course remain unchanged.

For teacher's guidance :

In explaining the central nervous system stress should be given by teachers on the evolution of brain in animals.

N. B. Revised syllabus in Psychology for the School Final course will include all the items under classes IX and X and item No. 11 under class XI as recommended above.

Size of the Book will be Duble Demy with 10 p t. Type.

10 % vaaiation is allowed on the total number of pages on the text portion of the book.

সূচীপত্র

তত্ত্বমূলক

মনোবিজ্ঞান—২য় খণ্ড

(ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান)

নবম শ্রেণীর পাঠ্য

দশম শ্রেণীর পাঠ্য

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য

১ম খণ্ড

তত্ত্বমূলক মনোবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

মনোবিজ্ঞান—মন ও আচরণের বিজ্ঞান

(Psychology study of mind and Behaviour)

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ঃ—মনোবিজ্ঞান শব্দটির মধ্যেই মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিহিত আছে। মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান। কিন্তু মন কি, একে ত আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি না। কোথায় আছে মন? এর স্বরূপই বা কি? পৃথিবীর গাছপালা পাহাড়, পর্বত, শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস প্রভৃতি যেভাবে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে ধরা দেয়, সেভাবে মনকে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু আমার মন আছে। যে মন ভালবাসে, হাসে, কাঁদে, ব্যথা অনুভব করে, আনন্দ লাভ করে এ ত অনুভূত সত্য।—কিন্তু মন থাকলেই ত হবে না তাকে জানব কেমন করে? এই মনকে জানার জন্য মনোবিজ্ঞানী নানা আলোচনা করেছে।—

আমার মনকে শুধু আমিই জানি। অন্যের মনকে জানব কেমন করে? অন্যের আচরণ দেখে তার মনকে জানার চেষ্টা করতে হয়। এই জন্য মনোবিজ্ঞানী বলেছেন মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণের বিজ্ঞান। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরিবেশে জীব বিশেষ আচরণ করে থাকে। সেই আচরণ দেখে তাকে জানতে হবে। অতএব এককথায় বলতে গেলে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে জীবের মনকে জানাই হল মনের বিজ্ঞান। অতএব মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা একদিকে জানার চেষ্টা করব মন কি, কি উপাদানে তৈরী, আবার অন্য দিকে জানব বিভিন্ন পরিবেশে জীব কিরূপ আচরণ করে। এই মনকে জানার জন্য মনোবিদগণ নানা আলোচনা করেছেন। নিচে সেগুলো দেওয়া হল ঃ—

(১) অতীতকালে গ্রীক সভ্যতা তার জ্ঞান বিজ্ঞানের গরিমায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হয়েছিল। তখন মনোবিজ্ঞান ছিল দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, ডেকার্টে (Descartes) প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ বললেন, মনোবিজ্ঞান হল **আত্মার বিজ্ঞান** (science of

soul)। তাঁরা বললেন মনোবিজ্ঞানে শুধু মনকে জানলেই হবে না মনের উৎস আত্মাকে জানতে হবে। আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা সমস্ত চেতনার উৎস, ব্রহ্মসত্তার এক জ্যোতির্ময় প্রকাশ। গ্রীক দার্শনিকগণ বলেন এই আত্মার উৎস ও রহস্যকে জানাই হল মনোবিজ্ঞানের কাজ। তাঁরা মনের উপরে স্থান দিলেন আত্মাকে।

কিন্তু এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়া যায় না। মনোবিজ্ঞান কখনই অধিবিদ্যা বা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়, মনোবিজ্ঞান হল একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। কিন্তু এই সংজ্ঞা মেনে নিলে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তারপর গ্রীক দার্শনিকগণ বললেন মনোবিজ্ঞান হল আত্মার বিজ্ঞান। কিন্তু আত্মা কি? বিভিন্ন দার্শনিক আত্মার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাছাড়া মনোবিজ্ঞান হল বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু আত্মা ত ইন্দ্রিয়াতীত। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের দ্বারা তাকে জানা সম্ভব হবে কেমন করে? পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে যাকে জানা যায় না তাকে ত বিজ্ঞানও বলা যায় না। মনোবিজ্ঞানে মানুষের আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোচনা করা হয় পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে। কিন্তু আত্মাকে জানবার উপায়ই বা কি!

(২) লক্, হিউম, স্পেনসার প্রভৃতি ইংরাজ দার্শনিকগণ প্রতিবাদ করে বললেন, মনোবিজ্ঞান হল **মনের বিজ্ঞান** (Science of mind)। মানসিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পেলেই মনকে জানা হল। এই সংজ্ঞা দেখা গেল গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মনের বাস্তব অস্তিত্ব কোথায় যে মনকে বুঝব। মন বলতে আত্মাকেও বুঝতে পারি, আবার মনের অবস্থাকেও বুঝতে পারি। মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে মন বলতে পারি। অতএব মনোবিদ্যা মনের বিদ্যা এ সংজ্ঞাও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তারপর মনোবিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও দৈহিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আলোচনা করে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এ সংজ্ঞা মেনে নিলে দৈহিক ক্রিয়াকলাপের আলোচনাকে মনোবিজ্ঞান থেকে বাদ দিতে হয়।—এই সংজ্ঞার কোথাও মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়নি! কিন্তু মনোবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। মানুষের আচরণ দেখে মনকে জানার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবে মানুষ যেরূপ আচরণ করে মনোবিজ্ঞান

সেইগুলিরই আলোচনা করে। নীতি দ্বারা তাকে সংশোধন করে আলোচনা করে না। তাছাড়া তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতিও ত মনকে নিয়ে আলোচনা করে। তাহলে মনোবিজ্ঞানকে যদি মনের বিজ্ঞান বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহলে ঐসব বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের তফাৎ কোথায়।

(৩) এরপর দার্শনিক উইলিয়ম জেমস বললেন মনোবিজ্ঞান হল **চেতন মনের বিজ্ঞান** (Psychology is the Science of consciousness)। চেতন মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু।

এই সংজ্ঞাকেও মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ মনোবিজ্ঞান ত শুধু চেতন মন নিয়েই আলোচনা করে না। চেতন মন ছাড়া মানুষের অচেতন মনও আছে। আজকের মনোবিজ্ঞানে মানুষের সেই অচেতন (unconscious) মনকে নিয়েও আলোচনা করে। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাতেও স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে মন হল বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান নয়।

ব্যবহারবাদীরা (Behaviourists) এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করলেন। তাঁদের অভিধানে মন, চেতনা এসবের স্থান নেই। জীবের বাহ্যিক আচরণ দেখেই ব্যক্তিকে জানতে হবে। কিন্তু চেতনা ত ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তবে তাকে জানব কেমন করে!

অপরদিকে ম্যাকডুগাল বললেন মনোবিজ্ঞানকে শুধু চেতনার বিজ্ঞান বললে চলবে কেন! মনোবিজ্ঞান ত শুধু ব্যক্তিমনকে নিয়েই আলোচনা করে না, পশুমন, শিশুমন, অস্বাভাবিক মন নিয়ে আলোচনা করে। তারা ত নিজের মনে কি হচ্ছে বলতে পারবে না। পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে তাদের আচরণ থেকে তাদের মনকে জানতে হবে। মনোবিজ্ঞানের এ সংজ্ঞায় জীবের আচরণ নিয়ে আলোচনার কোন নির্দ্দেশ নেই।

(৪) একদল মনোবিজ্ঞানী বললেন, মনোবিজ্ঞান চেতন মনের বিজ্ঞান হতে পারে, কিন্তু এই **চেতন মনের গঠন ও তার প্রকৃতি** আবিষ্কার করাই হল মনেবিজ্ঞানের কাজ। উণ্ড (Wundt) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ মেনে নিলেন। এঁদের মতবাদকে বলা হয় গঠনমূলক মতবাদ (Structural Psychology)। উণ্ড বললেন আমাদের বস্তু প্রত্যক্ষণ, আবেগ স্মৃতি প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাঁর মতে

মানুষের চেতন মনের দুটো দিক আছে। প্রথম হল সংবেদন যা নাকি বর্হিজগত থেকে আসে, আর দ্বিতীয়টি হল অনুভূতি। এই অনুভূতি আমাদের নিজস্ব। তাঁরা বললেন সংবেদন হল সবচেয়ে সরল অভিজ্ঞতা। প্রাথমিক অনুভূতির মধ্যে তিনি ফেললেন "প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর অনুভূতিগুলিকে। উণ্ড বললেন এছাড়া আরোও দুজোড়া প্রাথমিক অনুভূতি আছে, তা হল উত্তেজিত হওয়া ও শান্ত হওয়া; হাল ধরা এবং হাল ছেড়ে দেওয়া (the tense and relaxed)। এই সমস্ত অনুভূতি ও সংবেদন মিলে আমাদের মন গঠিত। যেমন ধর আবেগ, আবেগের একদিকে আছে সহানুভূতি, অপরদিকে আছে দৈহিক পরিবর্তন। যেমন আরাম অনুভব করিলে হাসি, দুঃখ পেলে কাঁদি, রাগ হলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করি, মুখ চোখ লাল হয়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস নিই ইত্যাদি। উণ্ড বললেন মানুষ কি করে না আলোচনা করে, আলোচনা করতে হবে তার অভিজ্ঞতার। সে কি করে দেখার দরকার নেই, তার চেতন মন কি উপাদানে গঠিত তাই দেখতে হবে।

(৫) কার্য্যধর্ম্মী মতবাদ (functional school) :—গঠনমূলক মতবাদীরা বললেন চেতন মনের গঠন বিশ্লেষণই হল মনোবিজ্ঞান। মনের ক্রিয়া এবং মনের উপাদান সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করেন। আর একদল মনোবিজ্ঞানী বললেন, **চেতনমনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান** দান করাই হল মনোবিজ্ঞানের কাজ। মানুষ কি করে কেন করে এবং কেমন কোরে করে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মনোবিজ্ঞানকে। মানুষ যে কেবল জানতে চায়, ইচ্ছা করে তাই নয়, সে অনুভব করে এবং আবেগ ও বুদ্ধির সাহায্যে অনেক কাজ করে। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তাহলে দাঁড়ালো মনোবিজ্ঞান হল চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ।

(৬) চেতন মনের ক্রিয়াকলাপ হল মনোবিজ্ঞান এ মতবাদও কিন্তু বেশীদিন টিকিল না। এই মতবাদ আক্রান্ত হল দুদিক থেকে। ওয়াটসন প্রভৃতি ব্যবহারবাদীরা প্রতিবাদ করে বললেন মনোবিজ্ঞান হল **জীবের আচরণের** বিজ্ঞান (Psychology is the Science of behaviour)। তিনি বললেন মনোবিজ্ঞানকে শুধু চেতনার বিজ্ঞান কেন বলব? প্রাণীদেরও মনোবিজ্ঞান আছে। মানুষের ব্যবহার এবং প্রাণীদের ব্যবহার নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা

করে। এদের পরিক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্দর্শনের স্থান নেই, বাইরের ব্যবহারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। এ মতবাদে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, আবেগ প্রভৃতির স্থান নেই। উত্তেজক উপস্থিত করিলেই জীব সেই উত্তেজকে সাড়া দেয় এবং তদনুযায়ী ক্রিয়া করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কেবল উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া, শিখন এবং অভ্যাসই হ'ল এই মনোবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু।

ব্যবহারবাদীদের মতে, এই উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া (Stimulus, response) দ্বারা মানুষের সব ক্রিয়ারই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংবেদন, আবেগ প্রভৃতি এই প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। উত্তেজকই এই সংবেদন জাগায় এবং তখন আমরা তার প্রতিক্রিয়া করি। ব্যবহারবাদীরা চেতনা, মন, কল্পনা প্রভৃতি সব বাদ দিলেন। চিন্তা সম্বন্ধেও তাঁরা বললেন চিন্তা হল নিজের কাছে কথা বলা, কোন উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাঁরা নৈর্বক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন; অন্তদর্শনের কোন মূল্যই দিলেন না।

এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেন বহু মনোবিজ্ঞানী। তাঁরা বললেন, মনোবিজ্ঞান যদি ব্যবহারের বিজ্ঞান হয়, যদি মনের বিজ্ঞান না হয় তাহলে ত দেহবিজ্ঞান পড়লেই হত। মনোবিজ্ঞানের পৃথক অস্তিত্বের কি প্রয়োজন? আর একদল বললেন মনোবিজ্ঞান শুধু নৈর্বক্তিক পদ্ধতিতে মনকে জানার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্তদর্শনের সাহায্যেও ত আমরা মানুষের মনকে জানতে পারি। ওয়াটসন আবেগকে বলেছেন দৈহিক পরিবর্ত্তন। আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে বলে আমরা কাঁদি। আমরা চেষ্টা করি, ভুল করি, আবার অন্যভাবে চেষ্টা করি। কিন্তু এসব মতবাদ গ্রহণ যোগ্য নয়। অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে আমরা যা কিছু শিখি, তাই স্থায়ী হয়। আবার আবেগ কেবল দৈহিক পরিবর্তন নয়। চিন্তাও খুব জটিল প্রক্রিয়া, কেবল নিজে নিজে কথা বলা নয়।

ব্যবহারবাদীরা মানুষের জটিল জীবনকে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার ছকে বেঁধে ফেলেছেন। কিন্তু মানুষ ত শুধু যন্ত্র নয়, তার ইচ্ছা আছে, অনিচ্ছা আছে। এসবের ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানীরা করতে পারেন নি। ব্যবহারবাদীরা বলেন পরিবেশের দ্বারা ব্যক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তাও সত্য নয়। পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তিকে যেমন একদিকে প্রভাবান্বিত করে, অপরদিকে সেইরূপ ব্যক্তিও তার ইচ্ছা দ্বারা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আমাদের সব কাজকে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার ছকে ফেলা যায় না। উদ্দীপক প্রয়োগ করলে মানুষ প্রতিক্রিয়া করে না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা তার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই তার প্রতিক্রিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(৭) এর উত্তরে উদ্দেশ্যবাদীরা (Purposive school) বললেন, মানুষ সব উত্তেজককে সাড়া দেয় না। তার প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকে। ম্যাকডুগাল এই উদ্দেশ্যবাদীদের একজন। তিনি বললেন মানুষের সব কাজের পেছনে আছে একটা উদ্দেশ্য। মানুষের কতগুলো সহজাত সংস্কার আছে, এই সংস্কার বশেই সে ক্রিয়া করে। যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির জন্য বিপদ দেখলে পলায়ন করে। অতএব ম্যাকডুগাল প্রভৃতি উদ্দেশ্যবাদীদের মতে মনোবিজ্ঞান হল **উদ্দেশ্যমুখী ব্যবহারের বিজ্ঞান** (Psychology is the Science of purposive behaviour)। ম্যাকডুগালের মতে জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। তাই জীব নির্জীব পদার্থের মত যান্ত্রিক ক্রিয়া করে না। জীব নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সচেতনভাবে ক্রিয়া করে। তাই জীবের ব্যবহার আলোচনা করতে গেলে তার উদ্দেশ্যকে জানতে হবে।

ম্যাকডুগালের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে তিনি মানুষের মনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জীবের ব্যবহার লক্ষ্য করে তার মনকে জানাই হল মনোবিজ্ঞানের কাজ।

তিনি জীবের ব্যবহার থেকে জীবকে জানার কথা বলেছেন। মন চেতনা, আত্মা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের আশ্রয় নেননি। তারপর তিনি মনোবিজ্ঞানকে কেবল মানুষের ব্যবহারের মধ্যে সীমিত করে রাখেননি। সমস্ত প্রাণীর কথাই বলেছেন। ম্যাকডুগালের সংজ্ঞা থেকেই জানা গেল যে মনোবিজ্ঞন অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াতীত নয়, মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। সাধারণ বিজ্ঞানের মতই মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা যায়।

অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী সংজ্ঞাগুলি থেকে ম্যাকডুগালের সংজ্ঞাকে অনেকটা ত্রুটিমুক্ত মনে হয়।

(৮) উডওয়ার্থ ম্যাকডুগালের মতবাদের আর একটু সংস্কার করে বললেন মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির কার্য্যকলাপকে তার পরিবেশের পটভূমিকায় আলোচনা

করে। তাঁর মতে মানুষের যেমন দেহ আছে সেইরূপ মনও আছে। মানুষের ব্যবহার তার মানসক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। মানুষের এই ব্যবহারকে তার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে।

তিনি বললেন মনোবিজ্ঞান হল পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির কার্য্যকলাপের বিজ্ঞান (Psychology is the Science of the activities of the individual in relation to his environment)।

এই সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ম্যাকডুগাল ব্যক্তির কার্য্য-কলাপকে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নিলেন। মানুষের কার্য্যকলাপের আলোচনার একটি উপযুক্ত পথের নির্দ্দেশ দিলেন। উডওয়ার্থ ব্যক্তির মন বা আচরণ কোনটাই ব্যবহার করেননি। তিনি বললেন ব্যক্তির কার্য্য-কলাপকে তার পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে জানতে হবে। কার্য্যকলাপের অর্থ অনেক ব্যাপক। কার্য্যকলাপ বলতে কল্পনা, চিন্তা, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি জ্ঞানমূলক কার্য্যকলাপকে বোঝায় আবার আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি অনুভূতি-মূলক কার্য্যকলাপকেও বোঝায়। অপরদিকে হাঁটা, চলা, কথা বলা, কাজ করা প্রভৃতি পৈশিক ক্রিয়াকেও বোঝায়। এইভাবে ব্যক্তির কার্য্যকলাপকে তিনি একটি ব্যাপকতর অর্থ দিলেন।

এই সংজ্ঞাতে স্বীকার করে নেওয়া হল যে মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিজ্ঞান নয়।

পরিবেশ কথাটির উল্লেখ করে তিনি বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা স্বীকার করে নিলেন। তিনি ব্যক্তি কথাটির ব্যবহার করে সমগ্র ব্যক্তি সত্তাটির কথা বললেন। দেহ ও মন এই দুইএর সমন্বয়েই 'ব্যক্তি'র সৃষ্টি। অতএব উডওয়ার্থের সংজ্ঞায় ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়া ও দৈহিক প্রক্রিয়া দুই প্রকার আচরণকেই স্থান দেওয়া হল।

(৯) **সমগ্রতাবাদ** (Gestalt theory) :—তিনজন জার্মান মনোবিদ কফকা (Koffka), কোহলার (Kohler) ও ওয়ার্দ্দিমার (Wertheimer) এই মতবাদ প্রচার করলেন। তাঁরা বললেন মনোবিজ্ঞান **ব্যক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু এগুলি বিচ্ছিন্ন মানসিক ক্রিয়া নয়** তাঁরা বললেন আমরা যখন কিছু প্রত্যক্ষণ করি, তখন সমগ্র ভাবেই করি। মন কতগুলি খণ্ড ভগ্নাংশের সমষ্টিমাত্র নয়, মন হল একক। মন তাই বিচ্ছিন্নতার

মধ্যে সমগ্রকে দেখে। সংবেদন কতগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদান মাত্র নয়, বাইরের উত্তেজনা ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করার সময় বিচ্ছিন্ন উপাদানই থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয় থেকে সংবাদ বহন করে স্নায়ু যে মুহূর্তে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, সেই মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন উপাদান সংবেদনগুলি মিলিত হয়। একেই সমগ্রতাবাদীগণ বলেছেন গঠন (pattern)। সংবেদনগুলি মস্তিষ্কে নিজেরাই গঠিত হয়। সব জিনিষকেই আমরা বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সম্পূর্ণভাবে দেখি। তিনটি রেখা-সমন্বিত একটি ত্রিভুজকে ত্রিভুজ হিসাবেই আমরা দেখি, তিনটি পৃথক রেখাকে নয়।

এঁরা অন্তদর্শনকে ব্যবহারবাদীদের মত অস্বীকার করেননি। তাঁরা বললেন মানুষের ব্যবহারকেও যেমন আমরা লক্ষ্য করব, সেইরূপ তার অন্তরের অভিজ্ঞতার (inner experience) সম্বন্ধে জানবো। কোহলার বললেন বুদ্ধি বলতে কেবল চেষ্টা করা ও ভুল করা (trial & error) নয়, বুদ্ধি হল অন্তদৃ´ষ্টি (insight)। সমস্ত বিষয়টি গভীরভাবে প্রত্যক্ষণ করে বা অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে আমরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারি।

সমগ্রতাবাদীদের কাছে পরিবেশের দাম অনেক। তাঁরা বলেন পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা আমাদের সম্বন্ধে সচেতন হই। সুতরাং সমগ্রতাবাদীদের মনোবিজ্ঞান হল মনের সমগ্র-মুখীনতা ধর্মের গতি পরিণতি লক্ষ্য করা।

(১০) ডাঃ সিগমণ্ড ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এক যুগান্তকারী প্রতিভা; তাঁর বিভিন্ন মতবাদ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এতদিনের ধারণা বিপর্য্যস্ত করে তুলল। তিনি বললেন মন ত শুধু চেতন মন নয়; চেতন মন মানুষের মনের একটা সামান্য অংশ মাত্র। তিনি মনের তিনটি স্তর বিভাগ করলেন :— (১) **চেতন মন** (Conscious mind) (২) **অবচেতন মন** (Pre-conscious mind), এবং **অচেতন মন** (Unconscious mind)। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করি, সে সব সঞ্চিত থাকে অচেতন মনে। আমাদের অভিজ্ঞতার সামান্য অংশই চেতন মনে থাকে। অতএব এই মনকে জানতে হলে অচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে হবে। এই মন জানার জন্য ফ্রয়েড কতগুলি পদ্ধতির কথা বলেছেন যেমন মন সমীক্ষণবাদ। (Psycho analysis)। ব্যক্তিকে হিপ্নোটাইজ করে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়

এবং তার মনের কথা জানার জন্য নানা প্রশ্ন করা হয়। তিনি অবাধ অনুষঙ্গ (free association) পদ্ধতির কথা বলেছেন, এতে ব্যক্তিকে কথা বলতে বলা হয় এবং প্রসঙ্গ ক্রমে সে যা ব্যক্ত করে লক্ষ্য করা হয়। ফ্রয়েডের এই সব পদ্ধতি অসুস্থ লোকদের জন্য বলে তাঁর মত অনেকে গ্রহণ করেন নি।

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনকে উচ্চাসন দিয়েছে। একদিকে মনোবিজ্ঞান মনের গতি প্রকৃতি ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে যেমন জানার চেষ্টা করবে, অপরদিকে মানুষের ব্যবহারকেও সে পর্যবেক্ষণ করবে। দেহ ও মন উভয়কে জানাই হল মনেবিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু মন হল একক, নিজেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ। অতএব একক সেই সত্তাটিকে জানতে হবে। মনোবিজ্ঞানে আমরা সমগ্র মানুষকে জানব, তার ব্যবহার ও গতি প্রকৃতি দেখে।

মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান ?

(Is psychology a science ?)

এতক্ষণ আমরা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় মনের আলোচনাই করেছি, এখন দেখতে হবে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা। প্রথমে আমরা বিজ্ঞান কি আলোচনা করব পরে দেখবো মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা।

বিজ্ঞান হল সুপরিকল্পিত সুসংবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান কোন এক শ্রেণীর বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে। মনোবিজ্ঞানও মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং তার বহিঃপ্রকাশ। মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি মানস ক্রিয়ার সুষ্ঠু নিয়ম আবিষ্কার করে।

পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় মনোবিজ্ঞান ও বস্তু নির্ভর বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান (normative science) নয়। তবে পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতির বিষয়বস্তু বহির্জগতে বিদ্যমান কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয় মন, আমাদের অন্তর্লোকে তার অবস্থান। মনোবিজ্ঞান বাস্তব বিজ্ঞান, অর্থাৎ নীতি বিজ্ঞানের মত অবাস্তব নয়। মনে যা ঘটে, সেই বাস্তব ক্রিয়ার অনুশীলন হল মনোবিজ্ঞানের কাজ।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সূত্র আবিষ্কার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ (inference) বিজ্ঞান নৈর্বক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মনোবিজ্ঞানেও

পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি করা হয়। মনোবিজ্ঞানেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষণ আছে, ব্যক্তির আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করে এই পরীক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যে হেতু ব্যক্তি নির্ভর, ব্যক্তিমানসকে জানার জন্য তাই মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শনের সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে। অতএব মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি সব সময় নৈর্ব্যক্তিক নয়।

প্রত্যেক বিজ্ঞানের দুই শাখা:—(১) পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental) (২) এবং ফলিত বিজ্ঞান (Applied science)। পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানে নানাবিধ পরীক্ষণের দ্বারা বিবিধ সূত্র আবিষ্কার করা হয়। মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental psychology) ও ফলিত মনোবিজ্ঞান (Applied psychology) আছে। তবে মনের পরিধি সুদূর প্রসারিত বলে পদার্থ, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতির চেয়ে মনোবিজ্ঞানের শাখা অনেক বেশী।

বিজ্ঞান বস্তুকেন্দ্রিক কিন্তু মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ব্যক্তি মানস এবং ব্যবহার পর্যালোচনা করা মনোবিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞানে বস্তুকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সংশ্লেষণ করা হয়। মনোবিজ্ঞানেও মানসিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) আছে। মনোবিজ্ঞানে একক মনকে নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে, একে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের কাজ হল বিশেষ রূপে জ্ঞান দান, বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপরিউক্ত আলোচনার পর আমরা বলতে পারি মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞান। এর বিষয় বস্তু পৃথক হতে পারে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানও মনের বিশেষ জ্ঞান দেয়। মনোবিজ্ঞান অবাস্তব নয়, বিজ্ঞানও তা নয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানে পরীক্ষার জন্য পরিসংখ্যান শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানেও ব্যক্তি মানস ক্রিয়া পরিমাপ করা হয় পরিসংখ্যানের সাহায্যে। বিজ্ঞান জাগতিক বস্তুনিচয়কে নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা করে। মনোবিজ্ঞান মনের গতি প্রকৃতির নিয়ম বাঁধবার চেষ্টা করে। কিন্তু মন গতিশীল, অজর জ্যোতির্ময় সত্ত্বা, তার প্রসার দিগন্ত বিস্তৃত। এই জটিল মানস সত্তার নিয়ম আবিষ্কার করা সহজ নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান, মনোবিজ্ঞান এই পার্থক্যের মধ্যেও ঐক্যের সন্ধান করে। বিজ্ঞানে সমাজের প্রশ্ন আসে না, দেশ কালের ব্যবধান নেই। বৈজ্ঞানিক সত্য চিরকালের সত্য, কিন্তু মনোবিজ্ঞানে সমাজের প্রভাব অস্বীকার করবার

উপায় নেই। তাই মানস ক্রিয়াকে তার পরিবেশের মধ্যে বিচার করতে হয়। সমস্ত বিজ্ঞানের সঙ্গেই দর্শন জড়িত। দর্শন না হলে বিজ্ঞান হয় না। দার্শনিকগণ প্রথমে দার্শনিক মতবাদ দেন, বিজ্ঞান সেগুলি পরীক্ষা করে সত্য নিরূপণ করে। মনোবিজ্ঞানও সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তাই বলে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের শাখা বললে ভুল হবে। পদার্থ বিদ্যা যেমন দর্শন নয়, মনোবিজ্ঞানও সেইরূপ দর্শন নয়।

মনোবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। নীতিবিজ্ঞানের মত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদিও বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

অতএব আমরা মনোবিজ্ঞানকে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বলতে পারি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য থাকলেও মনোবিজ্ঞান 'সুনিশ্চিতরূপে বিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject matter of Psychology) মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল মন। এই মনের উপর সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রভাব ক্রিয়া করে থাকে। পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর অত্যধিক। মনের প্রসার বহু বিস্তৃত। মনের চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা আছে, অনুভূতি আছে। দেহের প্রভাবও মনের উপর কম নয়। দেহ ও মনের আকৃতি ও প্রকৃতি আবার মানুষের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে।—মানুষের বুদ্ধি আছে, স্মৃতি আছে এবং সর্ব্বোপরি মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন আছে।,

মনের অভিব্যক্তি দুই প্রকারের :—(১) স্বাভাবিক মন এবং (২) অস্বাভাবিক মন। মানুষের শুধু চেতন মন নয়, অচেতন মনও আছে। অতএব অস্বভাবী মনকে সুস্থ করা যায় কিভাবে তাও মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

মনের বিষয়বস্তু আলোচনায় অগ্রসর হতে গেলে মনের সঙ্গে জড়িত এই সমস্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে হবে।

(১) মানুষের মনের প্রকাশ ঘটে তিনটি ক্রিয়ার দ্বারা—চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা ও যুক্তি প্রভৃতি চিন্তন ক্রিয়ার অন্তর্গত। অনুভূতি সরল হতে পারে, জটিল হতে পারে। আবেগ হল জটিল অনুভূতি। ঐচ্ছিক ক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া, সহজাত ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া, অভ্যাস প্রভৃতি ইচ্ছার অন্তর্গত।

(২) মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব আছে; বংশগতিরও প্রভাব কম নয়। পরিবেশ আবার প্রাকৃতিক হতে পারে, সামাজিক হতে পারে। অতএব বংশগতি ও পরিবেশ মনোবিজ্ঞানের একটি বিষয়বস্তু।

(৩) মনোবিজ্ঞান আবার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তিত্ব হ'ল একটি সামাজিক সংজ্ঞা। মানুষের চিন্তা, ভাবনা, বুদ্ধি, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সমাজ নির্দ্ধারিত বহুগুণের সমাবেশে ব্যক্তিত্ব নিরূপিত হয়। অতএব ব্যক্তিত্ব কাকে বলে, ব্যক্তিত্বের শ্রেনী বিভাগ, ব্যক্তিত্বের উপর দৈহিক প্রভাব, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

আবার মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকতে থাবে। বুদ্ধিগত পার্থক্য, ব্যক্তিত্বের পার্থক্য, সমাজগত পার্থক্য, দেহগত পার্থক্য ইত্যাদি বহু পার্থক্য মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে। ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরিমাপ হয় কিভাবে তাও মনোবিজ্ঞানকে জানতে হবে।

(৪) মানুষের সহজাত সংস্কার মানুষের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অতএব সংস্কার কি, সংস্কার মানুষের জীবনে কতখানি ক্রিয়া করে; সংস্কারকে মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে কি না, সংস্কার কয়প্রকার ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে হবে।

(৫) মানুষের বুদ্ধি আছে, তাই সে জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধির স্বরূপ কি, বুদ্ধির প্রকাশ হয় কি ভাবে, বুদ্ধির পরিমাপই বা করা যাবে কেমন করে তাও মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করতে হবে।

(৬) মানুষের মধ্যে আগ্রহ আছে, মনোযোগ আছে। আগ্রহ আছে বলে মানুষ কাজে মন দেয়। এই আগ্রহ বহু প্রকারের হতে পারে। মনোযোগ ও আগ্রহ কিভাবে পরস্পর জড়িত হতে পারে; মনোযোগের স্বরূপ কি, কোন কোন অবস্থা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দায়ী, মনোযোগের পরিমাপ হয় কিভাবে ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

(৭) মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই সম্পর্কটি সম্বন্ধে জানতে হবে। আবার মানুষের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র তার বুদ্ধি, ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুর দ্বারা মানুষের মানসিক এবং বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অতএব পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা জানতে হবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

একেই বলে সংবেদন বা প্রাথমিক অনুভূতি। এই সংবেদন, তার শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে।

(৮) মনোবিজ্ঞান কি? মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি, মনোবিজ্ঞানে মনকে জানার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

(৯) মানুষের মন সুস্থ হতে পারে, অসুস্থ হতে পারে। মানুষের চেতন মন আছে, অচেতন মনও আছে। এই অচেতন মনকে উদ্ঘাটিত করে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা কিভাবে করা যেতে পারে, কিভাবে সুস্থ মন গড়ে তোলা যায় ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করতে হবে।

(১০) মানুষ যেমন মনে রাখে, সেইরকম ভুলেও যায়। মানুষের নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতা স্মৃতি-ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয় কিন্তু চেতন মন বর্ত্তমানকে নিয়ে ক্রিয়া করে, অচেতন মনে অতীত ঘটনার স্মৃতি রক্ষিত হয়। তাই মানুষ ভুলে যায়। মানুষ ভুলে যায় কেন, কিভাবে পঠন-পাঠন অভ্যেস করলে সে কম ভুলবে ইত্যাদি বহু কিছু মনোবিজ্ঞানীকে জানতে হবে।

(১১) শিশু যখন জন্মায় তখন দেহ, মন প্রভৃতি থাকে অপরিপক্ক, ধীরে ধীরে তার জীবন কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, জীবনটি তার ধাপে ধাপে বিকশিত হয়। সুস্থ মানুষ গড়ে তুলতে হলে শিশু জীবনকে জানতে হবে, শিশু-জীবনের বিকাশের ধারাটি জেনে, একটি সুস্থ দেহ ও মনের মানুষকে গড়ে তোলা যায় কিভাবে ইত্যাদিও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

(১২) শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য। অতএব কিভাবে শিক্ষা দান করতে হবে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মতবাদ প্রভৃতি জানতে হবে।

(১৩) মনোবিজ্ঞানে একদিকে যেমন মনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে হবে, অন্যদিকে সেইরূপ ফলিত মনোবিজ্ঞান আছে, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান আছে। ফলিত মনোবিজ্ঞান বহু প্রকারের, মনোবিজ্ঞানের শাখা অনেক কারণ মনের প্রসার দিগন্ত বিস্তৃত। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে কিভাবে মানসিক ক্রিয়ার পরিমাপ করা যায় তা জানতে হবে। এই পরিমাপের জন্য পরিসংখ্যান শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অতএব একজন মনোবিজ্ঞানীকে পরিসংখ্যান

শাস্ত্রেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। অতএব পরিসংখ্যানও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে।

এক কথায় মানুষের মনের পরিধি বহু বিস্তৃত। অতএব মনের সঙ্গে জড়িত যা কিছু সবই হবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। মানুষের একক মন আছে আবার সমাজ মনও আছে। সামাজিক মনকেও জানতে হবে। শিল্পে, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানকে জানার দরকার আছে। মনোবিজ্ঞান বহু শাখায় বিভক্ত। দেহতত্ত্ব প্রভৃতি সব কিছুই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে।

মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য—Subject matter of Psychology distinguished from subject matter of natural science.

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল মন। আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল কোন জড় পদার্থ বা প্রাণী বা উদ্ভিদ। মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পার্থক্য আলোচনা করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কি। তারপর মনোবিজ্ঞান প্রাকৃতিক কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড় পদার্থের বিজ্ঞান, প্রাণী বা উদ্ভিদও এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ এবং আরোহ ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতির একরূপতা এবং সৃষ্টির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান ; এই দুইটি সূত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান স্বীকার করে। উণ্ড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ তাই মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাব মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল মন, কোন জড় পদার্থ নয়। এই মন চিন্তা করে, ইচ্ছা করে এবং অনুভব করে। পরিবেশ এই মনকে প্রভাবিত করে। জড়পদার্থ একরূপই থাকে, তাকে ইচ্ছামত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন পরিবেশে তার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনকে জানার জন্য পরীক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও তা সহজ নয় বা কৃত্রিম পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে না। মনোবিজ্ঞানেও মন জানার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় পরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু যেহেতু মন ব্যক্তি কেন্দ্রিক, নিজে ছাড়া নিজের মনকে জানা যায় না; সেইজন্য মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন নেই।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মনোবিজ্ঞানে মনকে জানতে হলে মানুষের ব্যবহার দেখে জানতে হয়। মানুষের ব্যবহার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ গোচর হলেও মন অপ্রত্যক্ষগোচর। ব্যবহার দেখে এই অপ্রত্যক্ষগোচর মনকে জানার কাজই হ'ল মনোবিজ্ঞানের কাজ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি যান্ত্রিক উপায়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে মনের অবস্থা সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; পরিবেশ ইত্যাদি তাকে প্রভাবিত করে বলে শুধু যান্ত্রিক পরীক্ষা মনোবিজ্ঞানে অচল। আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে সমস্ত পরীক্ষা হয় তা পরীক্ষক ভেদে বিভিন্ন হতে পারে না। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্র অঙ্কের মত; যে কেউ তার পরীক্ষা করুক না উত্তর হবে একই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষকের ব্যক্তি মনের প্রভাব আসতে পারে। অতএব মনোবিজ্ঞানকে আমরা বিজ্ঞান বললেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে পারি না।

মনোবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of Psychology)

মনোবিজ্ঞান মন নিয়ে আলোচনা করে। মনের প্রসার বহু বিস্তৃত। মন বহুবিধ ক্রিয়া করে, আবার কেবল মানুষের মন নয়, প্রাণীরও মন আছে। প্রাণী মনকে নিয়েও মনোবিজ্ঞানী আলোচনা করে। মানুষ ও তার সমাজ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানকে জানতে হবে। মানুষের মন সুস্থ হতে পারে, অসুস্থ হতে পারে। অসুস্থ মন নিয়েও মনোবিজ্ঞানকে আলোচনা করতে হয়। আজকাল সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও জীবনযাত্রা প্রণালী জটিল হয়ে উঠেছে। তাই শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এখন আমরা সংক্ষেপে মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(১) **সাধারণ মনোবিজ্ঞান** (General Psychology)—সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ, ক্রিয়া, প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া,

সহজাত ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া বুদ্ধি, মনোযোগ, স্মৃতি, বিস্মৃতি ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পদ্ধতি এর বিষয়বস্তু।

(২) **দেহতত্ব মনোবিজ্ঞান** (Physiological Psychology)—মনোবিজ্ঞানের এই শাখা মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয়গ্রন্থি এবং পেশী সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। দেহের যে যে অংশ মনকে জানার কাজে সাহায্য করে, সেই অংশগুলি অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং গ্রন্থি ও গ্রন্থিরস এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

(৩) **পশু মনোবিজ্ঞান** (Animal Psychology)—পশুর সহজাত সংস্কার, শিক্ষন প্রভৃতি নিয়ে এই মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। পশু মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা আমাদের মস্তিষ্ক সম্পর্কে অনেক ধারণা করতে পারি।

(৪) **শিশু মনোবিজ্ঞান** (Child Psychology)—মনোবিজ্ঞানের আর একটি শাখা হল শিশু মনোবিজ্ঞান। শিশুর মানসিক ও শারীরিক ক্রমবিকাশ, সমাজের সহিত শিশুর সামঞ্জস্য স্থাপন, শিশুর বুদ্ধি, আবেগ প্রকাশ ভঙ্গী, শিখণ পদ্ধতি, মানসিক স্বাস্থ্য, অসুস্থ শিশু মন প্রভৃতি শিশু মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।

(৫) **শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান** (Educational Psychology) স্বল্প সময়ে বুদ্ধি সহকারে শিক্ষা করলে পাঠ্য বিষয় কিভাবে স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, মনোবিজ্ঞান সেই সব প্রণালী বলে দেয়। শিশুমনকে জেনে নিয়ে, তার মনের উপযোগী করে শিক্ষাদানের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। শিশুর আগ্রহ সৃষ্টির জন্য, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান নানাবিধ উপায়ের নির্দেশ দেয়।

(৬) **সমাজ মনোবিজ্ঞান** (Social Psychology)—মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ; তাই তাকে জানতে হলে সমাজকে জানা প্রয়োজন। সমাজ মন হল দলগত মন। সমাজ মনোবিজ্ঞানে একদিকে আছে ব্যক্তি মন, অপরদিকে আছে দলগত মন। সমাজ মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট। সমাজকে জানতে হলে জানতে হবে কেন মানুষ সমাজে বাস করে, কিরূপে জনমত গঠন করে। জনমত কিরূপে প্রভাবিত হয়, জনগণের নৈতিক মন গঠনের নিয়ম কি প্রভৃতি

প্রশ্নের সমাধান দেয় সমাজ মনোবিজ্ঞান। পরিবেশের সঙ্গে সমাজের এবং দলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় এই বিজ্ঞান।

(৭) শিল্পতত্ত্বগত মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)—শিল্প শুধু যন্ত্র বা উপাদান দ্বারাই প্রস্তুত হয় না। যে শ্রমিক বা কর্মী এই উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাদের মূল্যও কম নয়। এই মনোবিজ্ঞানের বিষয় হল এই সব শ্রমিক মন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তি, বাসনা আকাঙ্ক্ষা লইয়া একত্রে বাস করে। শ্রমিক যন্ত্র নয়, তার মন আছে, সুখ দুঃখ আছে, ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে। অতএব কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক প্রয়োজন প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকরাও সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করাও এই বিজ্ঞানের কাজ। একঘেয়ে কাজে শ্রমিকদের মানসিক তৃপ্তি ব্যাহত হতে পারে। একজন শ্রমিক কতক্ষণ কাজ করলে তার স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকবে এই সব আলোচনা করে এই মনোবিজ্ঞান। মালিকও তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করে, শ্রমিকদের আনন্দদানের জন্য খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যের প্রয়োজন আছে। এই মনোবিজ্ঞান এই সৌহার্দ রক্ষা করার জন্য করনীয় উপদেশ দান করে। শ্রমিক নিয়োগের সময় ব্যক্তির যোগ্যতা নিরূপণ, তার কোন কার্য্যের প্রতি অনুরাগ বা ঝোঁক ইত্যাদি পরিমাপের জন্য এই মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। মদ্যপান, ধূমপান, চা ও কফি পান প্রভৃতির কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় শিল্পগত মনোবিজ্ঞান থেকে।

(৮) পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology)—অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষাগারে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

(৯) অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology)—অসুস্থ বা অস্বাভাবিক মন নিয়ে এই বিজ্ঞান আলোচনা করে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মনের সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন। একজন এক বিষয়ে অস্বাভাবিক হতে পারে, আবার অন্য ব্যাপারে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক

হতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় ব্যবহারের সাধারণ মানের থেকে খুব বেশী দূরে যে চলে যায় তার মন হল অস্বাভাবিক। মানসিক বিকার গ্রস্তদের যেমন আমরা অস্বাভাবিক মনের অন্তর্ভুক্ত করি, সেইরূপ যাদের বাতিক আছে বা মাথায় ছিট আছে তাদের বলি অস্বাভাবিক। আবার প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাও অস্বাভাবিক।

এই মনোবিজ্ঞানের আবার দুটো দিক আছে। একদিকে মানসিক অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করা এবং অপরদিকে হল অসুস্থতার চিকিৎসা করা।

(১০) অপরাধী মনের বিজ্ঞান (Criminal Psychology) মানুষ কেন অপরাধ করে, খুন করে, চুরি করে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেয় এই মনোবিজ্ঞান। এই সব অপরাধের প্রকৃত কারণ এবং অপরাধ দূরীকরণের উপায় বলে দেয় এই মনোবিজ্ঞান। তাছাড়া অপরাধীকে খুঁজে বার করতেও এই মনোবিজ্ঞান সাহায্য করে।

(১১) গানিতিক বিজ্ঞান (Psychometry) মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পরিমাণের পরিমাপ করাই হল এই বিজ্ঞানের কাজ। এইজন্য পরিসংখ্যান শাস্ত্র এই মনোবিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

(১২) তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান (Comparative Psychology) এই বিজ্ঞান মানসিক গতি প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করে। এই বিজ্ঞানে মনুষ্যেতর কোন জীবের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা হয়।

(১৩) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology) এই মনোবিজ্ঞান মনের অসুস্থতার কারণ নিয়ে আলোচনা করে। আবার রোগের চিকিৎসার চেয়ে বড় কাজ হল রোগ নিবারণ। মানসিক রোগ যাতে না হয় তার জন্য আমরা এই মনোবিজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করে থাকি।

(১৪) বৃত্তিমূলক মনোবিজ্ঞান (Professional Psychology) মনোবিজ্ঞান আজ মানুষকে তার পরবর্তী জীবনের বৃত্তি বেছে নিতে সাহায্য করে। শিক্ষকতা বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা সকলেই মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। অনেকে আবার মনের চিকিৎসা করেন। অনেকে আবার বৃত্তি নির্বাচন করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকেন এবং উপদেশও দেন, আবার অনেকে গবেষণা কাজে নিযুক্ত থাকেন।

মনোবিদ্যায় সুপণ্ডিত (Personnel Psychologist) সরকারী কাজে অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষকের আসনে এইসব মনোবিজ্ঞানীদের নিযুক্ত করা হয়।

উপরে উল্লিখিত উপায়ে মনোবিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে। আর এক প্রকারেও মনোবিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। এই মতে মনোবিজ্ঞানের দুইটি শাখা :—(১) **বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান** এবং (২) **ফলিত মনোবিজ্ঞান**। বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধির দিকে মন দেয় এবং ফলিত মনোবিজ্ঞান মানসিক অসুস্থতা নিবারণ করে, অসুস্থতার চিকিৎসা করে এবং শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান করে।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যখন মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক পাঠ্য বিষয় বলে নির্দ্ধারিত হল, তখন বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান নিয়েই মনোবিদগণ ব্যস্ত থাকতেন। বর্তমানে ফলিত মনোবিজ্ঞানের চর্চা বহুল প্রচারিত। ফলিত বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রসার লাভ করেছে। বিশেষ করে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের সাহায্যে এই বিজ্ঞানের গতি খুব দ্রুত।

অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ (experience analysed)

প্রথমে মনোবিজ্ঞানকে যাঁরা বললেন চেতন মনের অভিজ্ঞতা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে হবে। জেম্‌স উণ্ড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ অবয়ববাদী। জেম্‌স বললেন—আমরা বহির্জগতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যেমন সচেতন থাকি সেইরূপ সচেতন থাকি আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে। চেতনার অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমাদের এই দুই দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। উণ্ডের মতে আমাদের যত কিছু অভিজ্ঞতা, বহির্জগতের প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, আবেগ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি জটিল এবং এগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উণ্ডের মতে চেতন অভিজ্ঞতা দুই প্রকার :—সংবেদন যা বহির্জগত থেকে আসে এবং অনুভূতি যা থাকে আমাদের অন্তর্লোকে। শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, রং স্পর্শ প্রভৃতির সংবেদন প্রাথমিক সংবেদন। এগুলি হ'ল সবচেয়ে সরল অভিজ্ঞতা; যতক্ষণ না এগুলি অনুভূত হচ্ছে। প্রাথমিক অনুভূতি হ'ল প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর অনুভূতি। উণ্ড আগে দু'জোড়া প্রাথমিক অনুভূতির কথা বললেন। এগুলি হ'ল উত্তেজিত হওয়া ও শান্ত হওয়া; দৃঢ়বদ্ধ হওয়া ও শিথিল হওয়া। এইসব

উপাদানগুলির সংমিশ্রণ নানাভাবে হয়। যেমন আবেগ হ'ল একটি যৌগিক অভিজ্ঞতা। ইহা অনুভূতি ও সংবেদন এই দুই উপাদানে গঠিত। মনোবিজ্ঞানী টিচেনার উণ্ডের মতের পরিপোষণ করলেন। তিনি বললেন আগে গঠন তারপর তার ক্রিয়া। চোখের গঠন আগে বর্ণনা করে তারপরই ত তার ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উণ্ড বললেন প্রতিটি অভিজ্ঞতাই জটিল; বিশ্লেষণের পর যখন চেতন অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি পাওয়া গেল তখন সেগুলি আবার সংশ্লেষণ করা হ'ল কেমন করে? পথে এক ব্যক্তিকে দেখে তোমার পরিচিত বলে মনে হ'ল। যুক্তির দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে এ হল যৌগিক অভিজ্ঞতা।

অবয়ববাদীদের মতে এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। তাঁরা দেখেন স্মৃতির থেকে অভিজ্ঞতার কতখানি আসে। এটা কি অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি না পরিচিতির কোন অনুভূতি? সংযোজনের সূত্রগুলিও (laws of association) তাঁরা জানবেন।

অভিজ্ঞতার এই উপাদানগুলি জানবার জন্য পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের সঙ্গে তাঁরা অন্তর্দর্শনকেও স্থান দিলেন। অন্তর্দর্শনের বিবরণে কেবল যথার্থ ঘটনাগুলি বিবৃত হবে; অন্তর্দর্শনে অর্থ আরোপ করা চলবে না।

চেতন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হবে। একটি হ'ল উপাদান কি এবং কেমন করে সেগুলি সংশ্লিষ্ট হয়।

ক্রিয়াবাদীরা বললেন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে কি করে, কেন করে এবং কেমন ভাবে করে জানতে হবে। মানুষ যে শুধু ক্রিয়া করে তা নয়; সে ইচ্ছা করে এবং অনুভবও করে। তাঁদের মতে চেতন অভিজ্ঞতাকে জানবার জন্য দেহ-তত্ত্বকে জানতে হবে, তারপর বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থায় পরীক্ষণ করে ও শেষে অন্তর্দর্শনের সাহায্যে অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। যেমন আমরা সকলেই দেখি কিন্তু কেমন করে দেখি এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গঠন সম্বন্ধে জানতে হবে। কিন্তু এই উত্তর হ'ল আংশিক। আমরা রাগ করি কেমন করে জানতে গেলে আংশিক উত্তর পাব অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে জানলে। শুধু দেহতত্ত্ব জানলে মানসিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিভিন্ন প্রকার অবস্থায়ও পরীক্ষা করা যায়। যেমন একজন ব্যক্তিকে

একটি কাজ করতে দেওয়া হল। কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে হয়ত সে কাজটি করতে পারে কিন্তু অন্য অবস্থায় পারে না। এথিংহস সাহেবের স্মৃতির পরীক্ষা এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থহীন সিলেব্‌ল অভি-ক্ষার্থীকে মুখস্থ করতে দেওয়ার পর সময়ের ব্যবধান যত দীর্ঘ হয় ভুলে যাওয়ার হারও তত বেশী হয়। শেখার পর ঘুমিয়ে নিলে মনে থাকে বেশী। এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা কেমন করে হয় ইত্যাদি উত্তর পাওয়া যায়। আর একটি পদ্ধতি হ'ল অন্তর্দর্শন। অভিক্ষার্থীকে একটি উদ্দীপনা দেওয়া হয় এবং তার সংবেদনের একটি বিবরণ চাওয়া হয়। এই প্রচেষ্টাকে বলে method of impression বা ছাপ দেওয়ার পদ্ধতি। চর্ম সংবেদন লাভের জন্য বস্তুর আকৃতি, ওজন, আয়তন, ঠাণ্ডা, গরম, মসৃণ প্রভৃতি বহু ছাপ (impression) দেওয়া হয়। এইভাবে চারটি প্রাথমিক ত্বক সংবেদন পাই, যেমন উষ্ণতা, শৈত্য, যন্ত্রণা ও চাপ। এই বিশ্লেষণ সম্ভব হয় ত্বকের প্রত্যেকটি বিন্দুতে ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি সিলিণ্ডার ঠেকিয়ে।

তিন প্রকারে অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একটি অবয়ব-বাদীদের পদ্ধতি অপর দুটি হ'ল ক্রিয়াবাদীদের পদ্ধতি। অবয়ববাদীদের মতে চেতনার অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ করে অভিজ্ঞতার উপাদান সংগ্রহ করা হয়। চিকাগোর ক্রিয়াবাদীরাও চেতন মনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করতে পক্ষপাতী কিন্তু তাঁদের মতে শুধু গঠন বা উপাদান জানলেই হবে না, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে উপযোজন হয়। পরিবেশ প্রাকৃতিক হতে পারে, আবার সামাজিকও হতে পারে। এই মতবাদের প্রাথমিক তথ্য হল চেতন অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় তথ্য হ'ল চেতনার ক্রিয়া। একে বলতে পারি সেকেণ্ডারী ক্রিয়াবাদ।

Questions

1. Define Psychology and discuss its scope.

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও ও পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

2. How would you define Psychology ? Is it a scienee ? State reasons.

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও, মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে কারণ নির্দেশ কর।

3. How would you like to define Psychology? Can you place it along with other subjects that are based on observation of facts?

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। জড় বস্তুকে ভিত্তি করে যে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানকে কি এক স্তরে ফেলতে পার?

4. Is Psychology a natural science? State reasons in support of your answer.

মনোবিজ্ঞান কি প্রাকৃত বিজ্ঞান? তোমার যুক্তির স্বপক্ষে কারণ দাও।

5. Determine the definition of Psychology as a science of consciousness .

চেতনার বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।

6. Enumerate the views of structural and functional Phychologists.

অবয়ববাদী ও ক্রিয়াবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।

7. What is the subject matter of Psychology.

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি?

8. How would you analyse experience?

অভিজ্ঞতাকে তুমি কিরূপে বিশ্লেষণ করিবে?

9. Write short notes notes on :—

Science of conciousness; functionalism structuralism, industrial Psychology, natural science.

টীকা লিখ :—অবচেতন মনের বিজ্ঞান, ক্রিয়াবাদ, গঠনবাদ, শিল্পে মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ
(Uses of Psychology in different fields of life)

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শতাব্দী পূর্বে মনোবিজ্ঞানের শৈশবে তার কার্য্যকারিতা বিশেষ ছিল না। বিভিন্ন গবেষণার মধ্য দিয়ে তখন মনোবিদগণ কেবল মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কারে ও পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বুদ্ধির বিভিন্ন পরীক্ষার আবিষ্কার ও বিকাশের পর থেকে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকটি দ্রুত প্রসার লাভ করে।

তারপর থেকে মনোবিজ্ঞানকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা সুরু হয়। অধুনা মনোবিদদের অধিকাংশ মনোযোগ ও সময় মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ব্যয়িত হচ্ছে। সম্প্রতি যে সব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে সেগুলি হ'ল শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, সমাজ, আইন ও অপরাধ, সামরিক বিভাগ, গার্হস্থ্যজীবন ব্যবসা প্রভৃতি।

নীচে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল।

(১) **শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা** [Use of Psychology in Education] শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মনোবিজ্ঞান সেই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীকে না জেনে শিক্ষাদান কার্য্য কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। অধুনা শিক্ষকের জন্য তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নামে মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কিন্তু এক নয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি মৌলিক বিষয়; প্রয়োজন মত এতে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

সুসম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য মনোবিজ্ঞান নানাভাবে সাহায্যে করে। প্রথমতঃ শিক্ষককে জানতে হবে শিশু মনকে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর সে জানতে পারবে কোন বয়সে শিশুর বুদ্ধি, আবেগ, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি কি ভাবে পরিবর্তিত বা বিকশিত হয়। শুধু ক্রমবিকাশ নয় শিশুর সম্পূর্ণ মনটিকে জেনে তবে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে।

এই মন জানার কাজে অগ্রসর হলে সে দেখতে পাবে চঞ্চল শিশু মনকে সহজে কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ ধরে রাখা খুবই কঠিন। মনোযোগ সহজেই বিচলিত হয় কিন্তু শিশু মনকে ধরে রাখার উপায় মনোবিজ্ঞান বলে দিয়েছে। শিক্ষার্থীর মনকে ধরে রাখার জন্য পাঠ্য বিষয়ে শিশুর আগ্রহ আনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। শিশুর আবেগ, বুদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে শিক্ষক সহজে সে আবেগকে সুপথে পরিচালিত করতে পারে। বুদ্ধিকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারে।

বংশগতি ও পরিবেশ শিশুমনকে প্রভাবিত করে। বংশগতি সম্বন্ধে শিক্ষক শিশুর পরিবেশের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলে শিশু বংশগতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

শিশুর বুদ্ধি ও ক্ষমতা জেনে নেওয়ার জন্য বুদ্ধি প্রভৃতির পরীক্ষা করে নিতে হবে। যে বিষয়ে শিশুর যোগ্যতা ও ক্ষমতা বেশী সে বিষয়ে তাকে পড়ানর ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিশুর বুদ্ধি বেশী তাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়ে তার সে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হলে শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞান বলে দেয় কিভাবে, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সুচারু শিক্ষা সম্ভব হবে। শুধু শুষ্ক বিষয়গুলি তাকে মুখস্থ করালে হবে না। শিক্ষায় আগ্রহ আনার জন্য তাকে সচেষ্ট হতে হবে। আগ্রহ সৃষ্টি করতে গেলে শিশুকে তার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। মনোযোগ আকর্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশুর পাঠে মনোযোগ আনতে হবে। দুরূহ বিষয়গুলিকে কিভাবে পড়লে শিশু ভাল মনে রাখতে পারবে তাও শিক্ষকের জানা থাকে। স্বল্প সময়ে কিভাবে বিষয়গুলি দীর্ঘকাল মনে

রাখা যায় তার উপায় মনোবিজ্ঞান বলে দিয়েছে। সেই সব উপায়গুলি প্রয়োগ করলে শিশু অবলীলায় তার পাঠ্য বিষয় মনে রাখতে পারবে।

ক্লান্তির সময় শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে নেই, তাতে শক্তির অপচয় হয়। তাই তার ক্লান্তি দূর করার জন্য মনোবিজ্ঞান নানা নির্দেশ দিয়েছে। একসঙ্গে বহুক্ষণ শিশু এক বিষয় পড়লে ক্লান্ত হতে পারে; সেইজন্য বিষয় পরিবর্তিত করে শিক্ষা দেওয়া ভাল। ক্লান্তি অপনোদনের আরও বিভিন্ন উপায় আছে। সেগুলি জেনে নিয়ে সুষ্ঠু পাঠদান সম্ভব হবে।

শিশুর কল্পনাপ্রবণ মনে পাঠ্য বিষয়গুলি স্থায়ী করার জন্য তার কল্পনাকে সুদূরপ্রসারী করতে হবে। পাঠ্য বিষয়টি কল্পনার সাহায্যে সে যাতে মনে ধরে রাখতে পারে তার জন্য শিক্ষককে সাহায্য করতে হবে। শিশুর চিন্তা শক্তি কোন পথে কিভাবে অগ্রসর হয় জেনে নিয়ে শিক্ষক তার চিন্তাধারা সুদৃঢ় করতে পারে।

অতএব মনোবিজ্ঞান শিক্ষাবিদকে সাহায্য করে শিশুমনকে জেনে নিতে ও বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দিতে।

অধুনা নানা পরীক্ষার দ্বারা শিশুর ক্ষমতা, যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি জেনে নিয়ে শিক্ষার্থীর বিষয় নির্বাচন করা হয়। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সমস্ত পরীক্ষা করে শিক্ষাথী তার উপযুক্ত বিষয়টি নির্ব্বাচিত করতে পারে।

গ্রন্থকারেরও মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে শিক্ষন পদ্ধতিগুলির দিকে তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষককে শুধু সুস্থ মন নয় অসুস্থ মনের শিশুরও সম্মুখীন হতে হয়। শিশুর মানসিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে অগ্রসর হতে হবে। এর জন্য মনোবিজ্ঞানী তাকে সাহায্য করে থাকে।

(২) **চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞান** (Clinical Psychology) আধুনিক কালে বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অতীতকালে বিশ্বাস করা হত যে অশরীরী আত্মার অস্তিত্বের জন্য মানসিক বিকার দেখা দেয়। এই অশরীরী আত্মা ঈশ্বর অথবা শয়তানের হতে পারে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর আশ্রয় করে অথবা বাইরে থেকে এই অশরীরীরা

ক্রিয়া করে থাকে। হিপোক্রেটস প্রথম বললেন যে মস্তিষ্কের বৈকল্যহেতু মানসিক বিকার দেখা দেয়।

মস্তিষ্ক বিকৃতির সঙ্গে বহুদিন ধরে 'ডাকিনী'র মায়া জড়িত ছিল। মূর্চ্ছা রোগের চিকিৎসায় এইজন্য তখন ডাকিনীকে বিতাড়িত করবার জন্য মন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হত।

ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কারের পর বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন আসে। মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ নির্ণয়ের জন্য ফ্রয়েড এই নির্জ্ঞান মনের আশ্রয় নিলেন। মানুষের সুখ দুঃখ অতৃপ্ত বাসনা প্রভৃতি নির্জ্ঞান মনে অবদমিত হয় এবং অবদমিত বাসনার বিকৃত প্রকাশ দেখা যায় তার আচরণে। মানুষ অপরাধ করে, অপরাধের গ্লানি ভুলতে চায়; কিন্তু এই গ্লানি পুঞ্জীভূত হয় নির্জ্ঞান মনে। দীর্ঘদিনের অবদমনের পর কোন গভীর আঘাত বা শোকের পর মানুষ তার মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে। ফ্রয়েডের পর এ্যাডলার ইউঙ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বহু গবেষণার পর মানসিক চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানকে উচ্চাসনে তুলে ধরেছেন।

মানসিক অসুস্থতার প্রকাশ হয় তার অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে। মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা আবেগ প্রভৃতির বিকৃতির জন্য মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ প্রতিফলন অভিক্ষা, অবাধ অনুসঙ্গ পদ্ধতি, প্রশ্ন, স্বপ্ন বিশ্লেষণ প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির মনের রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন।

মানসিক বিকার প্রধানতঃ দুই প্রকারের হতে পারে। (১) বাতুলতা (Psychosis), (২) উন্মাদ (Psychoneurosis)। হিষ্টিরিয়া, ভয়, বাতিক প্রভৃতি বাতুলতার অন্তর্ভুক্ত। মনস্তাত্বিক চিকিৎসার দ্বারা এই বিকৃতির নিরাময় করা হয়। সিজোফ্রেনিয়া, (chizophrenia), ম্যানিক ডিপ্রেসিভ (manic depressive) প্রভৃতি উন্মাদ রোগের উদাহরণ। মানসিক বিকার অর্জ্জিত ও জন্মগত হতে পারে।

বিকৃত মস্তিষ্ক রোগের চিকিৎসা করেন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী (Clinical Psychologist), মনোচিকিৎসক (Psychiatrist) ও মনঃসমীক্ষক (Psychoanalist)।

আজকাল অজীর্ণ, পাকস্থলীর ঘা প্রভৃতি বহু রোগের চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া হয়।

বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসায় অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে চিকিৎসক প্রথমে রোগীর অতীত ইতিহাস, তার বংশগতি, পরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তারপর অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়, শারীরিক কোন রোগ আছে কিনা। গ্রন্থি সংরক্ষণের অসাম্যতার জন্য তার মস্তিষ্কের বিকৃতি কি না পরীক্ষা করা হয়। স্নায়বিক বৈকল্য, জন্মগত ব্যাধি প্রভৃতি নানা কারণে ব্যক্তির মানসিক বিকৃতি হতে পারে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষা সুরু হয়। বুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা হয় বুদ্ধির অভাবেই ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে অক্ষম কি না। প্রতিফলন অভিক্ষা, রর্সার পরীক্ষা (Rorschach ink blot test), ড্রয়িং ইত্যাদির পরীক্ষার দ্বারা রোগীর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে জেনে নেওয়া হয়। বৃত্তি পরীক্ষা, যোগ্যতা, বিশেষভাবে ক্ষমতার পরীক্ষা প্রভৃতিও করা হয়। নানা পরীক্ষার সময় সে লজ্জাশীল অথবা ভীরু, সহজেই সহযোগিতা করে কিনা, সহজেই হতাশ হয় কিনা প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয়।

এসব পরীক্ষার পর চিকিৎসক মনোবিজ্ঞানী রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বারবার সাক্ষাতের পর রোগীর বিশ্বাস অর্জ্জন করে তার মনের নানা খবর জেনে নেন।

এরপর চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী মানসিক রোগের চিকিৎসায় অগ্রসর হন। চিকিৎসার সময় প্রথমে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, ভিটামিন, ইনজেকসন প্রভৃতি দেওয়া হয়। রোগীর শারীরিক চিকিৎসা করে তাকে প্রথমে সুস্থ ও নীরোগ করার চেষ্টা করা হয়। মানসিক চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ তার পরিবেশের পরিবর্ত্তনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান শুধু মানসিক রোগ নির্ণয় ও নিরাময় করে তা নয় মানসিক রোগ নিবারণেও যথেষ্ট সাহায্য করে। কিরূপে সুস্থ মন গঠন করা যায় তার নির্দ্দেশ দেয় এই মনোবিজ্ঞান। বিরূপ পরিবেশে, তিক্ত অভিজ্ঞতায়, অতৃপ্ত কামনায় শিশুর মনে যাতে মানসিক বিকার না জন্মায় তার জন্য মনোবিজ্ঞানী নির্দ্দেশ দিয়ে থাকে। এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায়ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

শিল্প মনোবিজ্ঞান
(Industrial Psychylogy)

বিংশ শতাব্দীতে শিল্পের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের দাম অপারিসীম। শিল্প মনোবিজ্ঞান অর্থনৈতিক অপচয় নিবারণ করে এবং সমাজের অপচয় বন্ধ করে। প্রধানতঃ তিনটি সমস্যা শিল্পজগতে দেখা যায়। সেগুলি হ'ল (১) শ্রমিকের সমস্যা, তার চরিত্র, বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক যোগ্যতা, রুচি প্রভৃতি। (২) কাজের মধ্যে নিহিত সমস্যা যার ওপর কাজের উৎকর্ষ নির্ভর করে। ক্লান্তি, বিশ্রাম, শ্রমকাল প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। (৩) বাজারের সমস্যা—চাহিদা এবং চাহিদা অনুযায়ী শিল্পদ্রব্য উৎপাদন-এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রমিক নিয়োগের সময় শ্রমিকের যোগ্যতা নিরূপণে শিল্প মনোবিজ্ঞানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে এবং শ্রমিক শক্তির স্বল্পতম অপচয়ে উৎকৃষ্ট এবং বহুল উৎপাদন কিরূপে সম্ভব তা শিল্প মনোবিজ্ঞানী বলে দিতে পারে।

শিল্প মনোবিজ্ঞানে প্রথমে কাজটি বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোন কাজে কিরূপভাবে শ্রমিক অগ্রসর হবে, কাজের প্রকৃতি প্রভৃতি। তারপর শ্রমিক মনের এবং ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা হয়। এর জন্য শ্রমিকের ক্ষমতা, যোগ্যতা, গুণাগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বিচার করে নেওয়া হয়।

শ্রমিক নিয়োগের পর জানতে হবে শ্রমিক মনকে। শ্রমিক মনকে উৎফুল্ল রাখতে হবে। বিরূপ মনোভাব নিয়ে, নিরুৎসাহে কেবলমাত্র বেতনের জন্য কাজ করলে কাজ ভাল হয় না আবার শ্রমিক মনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্তি নানারূপ হতে পারে। অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত হতে পারে, আবার একঘেয়ে কাজের জন্য ক্লান্তি আসতে পারে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য মনোবিজ্ঞান বিবিধ নির্দেশ দিয়ে থাকে। শ্রমিকের কাজে আগ্রহ উৎসাহ ও অসুবিধা আনার জন্য শ্রমিক মালিকের মধ্যে প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শ্রমের পর বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শ্রমিকের শিক্ষার দিকে মালিককে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। শিল্প মনোবিজ্ঞানীর সহায়তায় মালিক শ্রমিকের জন্য সুপরিবেশ গঠন করতে পারে।

শ্রমকাল নির্ণয়ের গবেষণা করে দেখা গেছে অল্প সময় কাজ করলে উৎপাদন বেশী হয় না। কারণ কাজের শুরুতে উন্নতি বিশেষ হয় না; একে বলে গরম অবস্থা (warming up effect)। কত সময় একজন শ্রমিক কাজ করবে তা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতির উপর। সাধারণভাবে কোন সুনির্দিষ্ট শ্রমকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

শ্রমকাল নির্ণয়ের পর শিল্প মনোবিজ্ঞান বিশ্রামকাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। বিশ্রামকাল যথেষ্ট না হলে শ্রমিক যে প্রকারে হোক বিশ্রাম নেবেই। বিশ্রামকাল কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। গুরু পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বেশী হওয়া দরকার; অল্প পরিশ্রমের পর ঘণ্টায় পাঁচমিনিট বিশ্রামকালই যথেষ্ট।

কারখানায় যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ অধিক্ষণ কারখানায় কাজ করার পর অক্সিজেনের অভাবে শ্রমিকের ক্লান্তি বর্ধিত হবে।

বর্ত্তমান শিল্পে শ্রমিক মালিকের বিরোধ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মালিক শ্রমিকের সহিত প্রীতিকর সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। মালিক যদি শ্রমিককে শোষণ করে অর্থ সঞ্চয় করতে চায় তাহলে শ্রমিক অসন্তোষ কিছুতেই কমবে না। শ্রমিককে উপযুক্ত বেতন, লভ্যাংশের উপযুক্ত অংশ প্রভৃতি দিলে এবং শ্রমিকের সুখ সুবিধার প্রতি মনোযোগী হলে শ্রমিক মালিকের মধ্যে অসন্তোষ থাকবে না।

শিল্পের আর একটি দিক হ'ল বাজার। চাহিদা অনুযায়ী শিল্পদ্রব্য শুধু পরিবেশন করলেই হবে না। আজকের দিনে শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। শুধু উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করলেই হবে না, আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে হবে। কি জাতীয় বিজ্ঞাপন দিলে তা জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণীয় হবে তা বলে দেবে শিল্প মনোবিজ্ঞান।

বৃত্তি মনোবিজ্ঞান (Vocational Psychology) :—আধুনিককালে জীবনধারণের জন্য মানুষকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন

প্রকার ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশের ফলে নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপের প্রয়োজন হয়।

শিল্পের বহু প্রসার এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কর্মী নির্ব্বাচনে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। বৃত্তি নির্ব্বাচনের জন্য বহুপরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষার দুটি উদ্দেশ্য নির্ব্বাচন এবং নির্দ্দেশদান। প্রথমটির দ্বারা যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়টির দ্বারা ব্যক্তি কোন বৃত্তি নির্ব্বাচন করবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। এই নির্দ্দেশ পাবার পর ব্যক্তি একটি বিশেষ বৃত্তি নির্ব্বাচন করে সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের জন্যই বিশেষ শিক্ষা বা বৃত্তি নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয়। যোগ্যতা ও ক্ষমতার দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য অত্যধিক থাকে। এই পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ব্যক্তিগত অভিক্ষা এবং সমষ্টিগত অভিক্ষা আছে। বিভিন্ন বৃত্তির জন্য আবার বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, যেমন—শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, সমাজ প্রভৃতি।

বৃত্তি নির্ব্বাচন উপদেষ্টা বৃত্তি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। এর জন্য ব্যক্তির আগ্রহ, যোগ্যতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। বিদ্যালয়ের বিবরণ, ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সাহায্যে তিনি এসব খবর জানতে পারেন।

সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) :—সমাজ মনোবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। ব্যক্তিকে নিয়ে মানুষের সমাজ। সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তি নির্ভর করে সমাজমনের অবস্থার উপর, সমাজ মন কি করে গঠিত হয়, কি বিশ্বাস, সংস্কার সমাজ মনকে কতখানি প্রভাবিত করে—প্রভৃতি সমাজ মনোবিজ্ঞান বলে দেয়। জনমত কিভাবে গঠিত হয়, কিভাবে প্রভাবিত হয়, জনগণের নৈতিক মন গঠনের নিয়ম কি প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধান দেয় সমাজ মনোবিজ্ঞান। পরিবেশের সঙ্গে সমাজের এবং দলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে জ্ঞান দেয় এই বিজ্ঞান।

সমাজের রীতিনীতি, আচার, প্রকৃতি প্রভৃতির উপাদানগুলির সম্বন্ধে সমাজ মনোবিজ্ঞান জ্ঞান দান করে। সমাজগোষ্ঠীর মনের বিশ্লেষণ করে সমাজ-মনের প্রকৃতি সম্বন্ধেও মনোবিজ্ঞান জ্ঞান দান করে।

সমাজ মনের সঙ্গে সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ জড়িত আছে। কুসংস্কারে সমাজমন আচ্ছন্ন হয়; অপরাধী মানুষ নানা অপরাধ করে সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করে। সমাজ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাধী মনকে জানা যায়। কেন মানুষ অপরাধ করে, এবং কি করলে সে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হবে তাও সমাজ মনোবিজ্ঞান বলে দেয়।

সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য এবং কল্যাণের জন্য মানুষ যুগে যুগে সাধনা করে এসেছে। সমাজে যখন দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তখন জন্মলাভ করেছে সমাজ সংস্কারক। সমাজ সংস্কারক তার আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করেছেন। সমাজ সেই আদর্শকে গ্রহণ করেছে। এইভাবে ধর্ম সংস্কারক জন্মগ্রহণ করে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছেন। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকের মতবাদ বিভিন্ন, তাই সমাজমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সমাজে বাস করে কোন কোন ব্যক্তি সমাজের নেতৃত্ব করতে চায়। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ তার বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমাজ মনকে বুঝবার চেষ্টা করেন। সমাজ মনের ঝোঁক কোন দিকে জেনে নিয়ে তিনি তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন।

সমাজ সংস্কারক যেমন একদিকে সমাজের উন্নতিকল্পে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা করেন, সমাজের পুরাতন নেতৃত্বও সেইরূপ নূতনকে গ্রহণ করার পথে বিরোধিতা করেন। সমাজ মন সহজে পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করতে চায় না। সমাজ সংস্কারককে এই জন্য বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। থর্ন ডাইক বলেছেন সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে সেই সব আদর্শবান লোকের দ্বারা যাঁরা সমাজ মনকে ভালভাবে জানেন।

প্রত্যেক সমাজের একটি কৃষ্টি আছে। সমাজ মনোবিজ্ঞান সেই কৃষ্টির সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, রীতিনীতি প্রভৃতি এই কৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। দেশে, কালে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে এই কৃষ্টি বিভিন্ন হতে পারে। বিভিন্ন দেশের সমাজ মনোবিজ্ঞান পাঠ করে সমাজ মনোবিজ্ঞানী

বিভিন্ন দেশের সমাজের ভালো নীতিগুলি গ্রহণ করে আদর্শ সমাজ গঠনের চেষ্টা করতে পারেন।

অধুনা মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি মনোবিজ্ঞানীগণ অধিক দৃষ্টি দিয়েছেন। আজকের মানুষের জীবন বহু বিচিত্র, তার জীবনের ধারাও জটিল—এইজন্য কি গৃহে, কি বিদ্যামন্দিরে, কি কর্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই আজ মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর শুভ প্রচেষ্টা চলেছে।

Questions

1. What are the uses of Psychology in different fields of life ?

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা কি ?

2. Describe the use of Psychology in the educational field.

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা বর্ণনা কর।

3. Describe the use of Psychology in the field of industry and vocation.

শিল্প ও বৃত্তির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা বর্ণনা কর।

4. What is clinical Psycholoy ? What are its uses ?

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান কি ? ইহার কার্য্যকারিতা কি ?

5. Describe the use of Psychology in the social field ?

সমাজের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মানব জীবনের দৈহিক ভিত্তি

(Physiological basis of mental life)

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তার রূপে রসে গন্ধে মানুষকে আকর্ষণ করছে; মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর মানুষ সেই আবেদনে সাড়া দিচ্ছে। জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই উত্তেজনা ও তার প্রতিক্রিয়া চলছে। সুন্দর কিছু দেখলেই আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকাই, মিষ্টি সুর কানে লাগলে কান পেতে শুনি; আবার শরীরে কোথাও আঘাত লাগলে ব্যথা পাই। মনুষ্য জগতে এই যে নিত্য নিয়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলেছে এর মধ্যে জটিলতার অন্ত নেই। মানুষের জগতের পরিধি বৃহৎ, তার আচরণও তাই বহুবিধ। মানুষ একদিকে যেমন বহু বিচিত্র এই পৃথিবীর রূপ-রস উপলব্ধি করে, অপরদিকে সেইরূপ চিন্তা করে, ভালবাসে, রাগ করে, ঘৃণা করে ভয় পায়। এখন প্রশ্ন হ'ল এই জটিল মানস ক্রিয়াগুলি হয় কেমন করে। মনে কর একটি ছবি দেখছ। ছবিটি আছে বহির্জগতে, মনের মধ্যে তার দৃশ্যানুভূতি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে কে? এসব কাজ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। বহির্জগতের উত্তেজনা আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে এবং ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুর সাহায্যে চলে যায় মস্তিষ্কে; মস্তিষ্কেই হয় আসল সংবেদন।

অতএব দেখা যাচ্ছে আমাদের মানসজীবনের পশ্চাতে আছে দৈহিক ভিত্তি। মন দেহের উপর নির্ভরশীল। আমাদের ইন্দ্রিয়, পেশী, স্নায়ুতন্ত্র এবং প্রধানতঃ মস্তিষ্ক হ'ল মানস জীবনের দৈহিক ভিত্তি।

আমরা সকলেই জানি দেহ যদি নীরোগ ও সুস্থ থাকে তাহলে মনও সতেজ ও উৎফুল্ল থাকে এবং মানসিক কর্ম্মক্ষমতাও অটুট থাকে। কিন্তু অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত দেহে বলিষ্ঠ মানসিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। আবার অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রমে শরীর যখন শ্রান্ত থাকে, তখনও মানসিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। দেহের সঙ্গে মনেরও তখন বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। সুস্থ দেহ, সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ মানসিক ক্রিয়ার সহায়ক।

স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ করে মস্তিষ্ককে মানস-জীবনের কেন্দ্র বা মনের পীঠস্থান বলা হয়ে থাকে। চিন্তন, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতি উচ্চতর ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় মস্তিষ্কে। মানুষকে যে জিনিষ তার সভ্যতার শিখরে ঠেলে দিচ্ছে তা হ'ল তার বুদ্ধি। মস্তিষ্কের গঠন ও প্রকৃতির উপর বুদ্ধির প্রকৃতি নির্ভরশীল। সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পর্কযুক্ত।

বহির্জগতের উত্তেজনা বহন করে ইন্দ্রিয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হলে হয় দর্শন সংবেদন, কর্ণেন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হলে হয় শ্রবণ সংবেদন; সেইরূপ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক উদ্দীপ্ত হলে যথাক্রমে ঘ্রাণ, স্বাদ, ও স্পর্শাদির সংবেদন হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় থেকে মস্তিষ্কে উত্তেজনা বহন করে স্নায়ু। স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে বিভিন্ন সংবেদন হয়ে থাকে। আবার সংবেদন হলে পেশীর সাহায্যে আমরা ক্রিয়া করে থাকি। যেমন রসগোল্লা দেখে দর্শন সংবেদন হল, রসগোল্লাটি খাবার জন্য মনে বাসনা হল, জিহ্বাতে লালা নিঃসৃত হল, হাত সক্রিয় হয়ে রসগোল্লাটি তুলে মুখে ফেলে দিল। মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়া এইরূপে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

আবার আমরা যে শুধুমাত্র সংবেদন লাভ করি তা নয়, আমাদের "হাসি-কান্নার এই খেলাঘরে" আমরা আবেগের বশীভূত হই, ভালবাসি, ঘৃণা করি দুঃখ পাই। মস্তিষ্কে অবস্থিত থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস মানুষের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যে সব গ্রন্থি আছে সেগুলি উত্তেজিত হলে রসক্ষরণ হয় এবং আমরা বিভিন্ন ক্রিয়া করি। যেমন, এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি উত্তেজিত হলে ভয়, দুঃখ প্রভৃতি আবেগ উদ্ভূত হয় এবং আমরা আবেগজনিত দৈহিক ক্রিয়া করি। যেমন, ভয় হলে ছুটে পালাই; দুঃখ হলে কাঁদি। মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যক্তি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগলে আমাদের মাথা ধরে। মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্য স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ করে মস্তিষ্কের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

অতএব মানস ক্রিয়ার স্বরূপ জানতে হলে আমাদের বিশেষভাবে জানতে হবে স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও প্রকৃতি। স্নায়ুতন্ত্রই আমাদের মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার

এই সমস্ত সংযোগাঞ্চল ছাড়া আরও দুটি বড় সংযোগাঞ্চল আছে। একটি পার্শ্ব (Parietal) পশ্চাৎ (Occipital) ও নিম্নভাগে (Temporal lobe) অর্থাৎ বিভিন্ন সংবেদনস্থানের মধ্যে, অপরটি আছে সম্মুখ (frontal) ভাগে। এই অঞ্চলগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। এই অঞ্চলগুলিকে বলে সাধারণ সংযোগাঞ্চল। এর প্রভাব আমাদের জীবনে অপরিসীম। আমাদের চিন্তা কল্পনা, বিচার করবার ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি সংযম বাসনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এইখানে।

এই সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে স্মৃতিভ্রংশ,Aphasia, Apraxia, Agnosia ইত্যাদি রোগ হতে পারে। Aphasia হলে মানুষের কথা বলবার শক্তি থাকে কিন্তু ভাষার বোধ নষ্ট হয়ে যায়। শ্রবণাঞ্চলের নিকটেই আছে বচনাঞ্চল এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় মস্তিষ্কের উভয় গোলার্দ্ধে যদিও সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও কর্মকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু বচনাঞ্চলের ক্ষেত্রে অন্যরূপ। বচনাঞ্চল উভয় গোলার্দ্ধে নেই মাত্র একটি গোলার্দ্ধে; বাম গোলার্দ্ধে বচনাঞ্চল আছে। Agnosia রোগ হলে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord)

এতক্ষণ আমরা মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবার কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সুষুম্নাকাণ্ডের সম্বন্ধে আলেচানা করব।

মস্তিষ্ক ব্যতীত শরীরের অন্য সমস্ত স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এটি লম্বায় আঠার ইঞ্চি ও আধ ইঞ্চি পুরু। মেরুদণ্ড হ'ল অস্থিখণ্ড বা কশেরুকা দিয়ে তৈরী হাড়ের মালা। এর মধ্য দিয়ে যে লম্বা ফিতের মত চলে গেছে তাকে বলে সুষুম্নাকাণ্ড। সুষুম্নাকাণ্ড সাদা ও ধূসর বর্ণের পদার্থ দ্বারা পূর্ণ। ধূসর পদার্থটি স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত এবং সাদা পদার্থটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা গঠিত। সুষুম্নাকাণ্ডের দু পাশ থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে।

সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর বা সাদা পদার্থ তিনটি স্তরে আবৃত। ভেতরের স্তরকে বলে পায়াম্যাটার (Piamater) মধ্যের স্তরে আছে তরল পদার্থ (cerebro--spinal fluid); একে বলে অ্যারাকনয়েড (arachnoid

membrane) একেবারে উপরিভাগের স্তরটি সরু। লিম্ফ (lymph) দ্বারা এই স্তরটি সিক্ত একে বলে ডিউর‍্যাম্যাটার (duramater)।

প্রত্যেক্ সুষুম্না স্নায়ুর **দুইটি মূল**:—সম্মুখের (anterior root) ও পশ্চাতের মূল (Posterior root) পশ্চাতের মূলটি হ'ল সংবেদক মূল। সম্মুখের মূলগুলি কর্ম্মদা। সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রে আছে ধূসর পদার্থ এবং ধূসর পদার্থকে বেষ্টন করে আছে সাদা পদার্থ।

সুষুম্নাকাণ্ড হ'ল মস্তিষ্ক ও শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগস্থল। সংবেদক স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে গেছে কর্ম্মদা স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পেশীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া (Reflex action)

সুষুম্নাকাণ্ড হ'ল প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র। আগুনে হাত লাগলে আমরা হাত সরিয়ে নিই, জোর শব্দ শুনলে চোখের পাতা বন্ধ করি। এই সব কাজকে বলে প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া।

প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া নিমেষের মধ্যে সাধিত হয়। শরীরের কোন অংশে আঘাত লাগলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ জ্ঞানদা শিরা দ্বারা বাহিত হয়ে
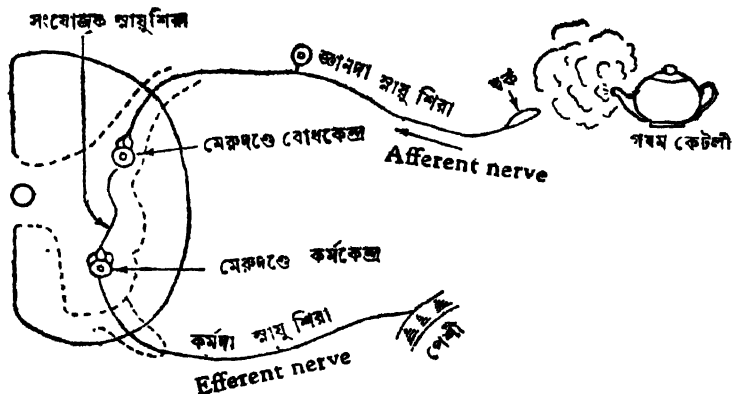
প্রত্যাবর্ত্তক চাপ

মেরুদণ্ডের জরুরী অনুভূতি কেন্দ্রে (lower sensory centre) পৌঁছায়—সেখান থেকে সংযোজক স্নায়ুশিরা সংবাদ নিয়ে যায় মেরুদণ্ডের কর্ম্মকেন্দ্রে

সঙ্গে সঙ্গে সে নির্দেশ পাঠায় পেশীর কাছে। পেশী থেকে সংবাদ বহন ও পুনরায় সংবাদ নিয়ে পেশীতে প্রত্যাবর্তন যে পথে হয় সেই পথটিকে প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার চাপ বলে। এই চাপ তিন প্রকারের হতে পারে: (১) অবচেতন অবস্থায় প্রতিক্রিয়া চাপ (২) চেতন প্রতিক্রিয়া চাপ (৩) বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন চাপ।

(১) **অবচেতন চাপ** (Unconscious arc):—আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন গায়ে ছারপোকা কামড়ালে পাশ ফিরে শুই, কিম্বা হাতে ব্যথা লাগলে ঘুমন্ত অবস্থায় হাত সরিয়ে নিই। এসব অমরা করি অবচেতন অবস্থায়। অবচেতন অবস্থার চাপ খুব ছোট হয়।

(২) চেতন প্রতিক্রিয়া চাপ (Reflex arc and consciousness):—এখানে স্বতঃই একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে গায়ে মশা বসলে আমরা যখন হাত দিয়ে সেটা তাড়িয়ে দিই বা মারবার চেষ্টা করি তখন আমরা কি সচেতন থাকি না? যখন আমরা কোন দুরূহ কাজে লিপ্ত থাকি তখন যে প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া হয় তার বোধ আমাদের থাকে অর্থাৎ, মশা কামড়ানর অনুভূতি, হাত তুলে মারবার চেষ্টা ইত্যাদি সব কিছুই আমাদের জ্ঞাতসারে হয়। এখন প্রশ্ন হল প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া যদি মেরুদণ্ডে হয় তাহলে আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন হই কেমন করে? তার কারণ সুষুম্না কাণ্ডে যেমন সংবাদবাহী স্নায়ু এবং কর্ম্মদা স্নায়ু আছে সেইরূপ আছে সংযোজক স্নায়ু। সংবাদ স্নায়ু থেকে সংবাদ কর্ম্মদা স্নায়ুতে যখন যায় তখন সংযোজক স্নায়ুও এই সংবাদ গ্রহণ করে এবং মস্তিষ্কে সে সংবাদ প্রেরণ করে। কিন্তু মস্তিষ্ক তখন দুরূহ কাজে ব্যাপৃত থাকার জন্যে এসব ছোট খাট বিষয়ে মন দেন না। যেমন আমরা জরুরী সভায় বসলে বাইরের চীৎকারে সহজে মন দিই না।

(৩) **বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিক্রিয়া চাপ** (Arc involving higher activities):—জটিলতর প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ায় যখন বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন সংবাদবাহী স্নায়ু মেরুদণ্ডে যাবার সময় আর একটু এগিয়ে মস্তিষ্কের সংযোগাঞ্চল পর্যন্ত যায় এবং সেখান থেকে নির্দেশ বহন করে। এই চাপ সেইজন্য একটু বড় হয়।

প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সহজাত। পিন ফুটলে আমরা লাফাই,

ঝকঝকে আলোতে চোখ বন্ধ করি, নাকে কিছু প্রবেশ করলে হাঁচি এগুলিকে পেশীগত প্রতিক্রিয়া বলে। কিন্তু গ্রন্থিগত প্রতিক্রিয়াও আছে যেমন খাদ্যবস্তুর গন্ধে লালা নিঃসৃত হয়; চোখে বালি পড়লে চোখ দিয়ে জল ঝরে।

এতক্ষণ আমরা পড়লাম যে সুষুম্নাকাণ্ডই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার প্রকৃত কেন্দ্র। কিন্তু মস্তিষ্ক যে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুষুম্নাকাণ্ডকে মস্তিষ্ক কি ভাবে প্রভাবিত করে তার ওপর নির্ভর করে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার প্রকৃতি। হাঁচি আসছে—হাঁচতেও পারি, আবার সামনে কেউ থাকলে আটকে ফেলতেও পারি। আগুনের কাছে তাপ লাগছে কিন্তু হাত নাও সরাতে পারি যে জিনিষটা গরম করছি সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। নিবিষ্ট মনে উপন্যাস পড়ছি, মশা কামড়াচ্ছে কিন্তু মশা মারবার জন্য হাত নাও উঠতে পারে। ডাক্তারে যখন ইঞ্জেকসন দিচ্ছে তখন ব্যথা সহ্য করি, হাত সরিয়ে নিই না। তাছাড়া এও প্রমাণিত, হয়েছে যে মস্তিষ্ক স্নায়ুসন্ধির বাধা (Synaptic resistance) সৃষ্টি করে, সাময়িকভাবে স্নায়ুতরঙ্গের চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে।

২। **উপান্ত স্নায়ুমণ্ডল** (Peripheral nervous system) :—
উপান্ত স্নায়ুমণ্ডলের দুটিভাগ : (১) **মস্তিষ্কের স্নায়ু** (Cranial nerves) এবং (২) **সুষুম্না স্নায়ু** spanial nerves)।

(১) **মস্তিষ্ক স্নায়ু :**—মস্তিষ্ক থেকে যেসব স্নায়ু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত তাকে বলে মস্তিষ্ক স্নায়ু। ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী এদের আলাদা নামকরণ করা হয়েছে। যেমন গন্ধ স্নায়ু (Olfactory nerve), চক্ষু স্নায়ু (Optic nerve), স্বাদের স্নায়ু (gustatory nerve), শ্রবণ স্নায়ু (auditory nerve) প্রভৃতি।

(২) সুষুম্না স্নায়ু—সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশ থেকে ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে আছে। একে দৈহিক স্নায়ুও বলে।

এই স্নায়ুগুলিকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) সংবেদক স্নায়ু (sensory nerve)। এরা বাইরের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়।

(২) কর্মদা স্নায়ু (motor nerve)—এরা মস্তিষ্ক থেকে সংবাদ বহন করে আনে ও পেশীকে সক্রিয় করে।

(৩) সংযোজক স্নায়ু (association nerve)—এগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের সংবেদনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্রকে যোগ করে। এই স্নায়ুর তন্তুগুলি সরু ও লম্বা হয়। কোন কোনটি এক গজ লম্বা হয়। দর্শন স্নায়ুর তন্তু সব থেকে লম্বা।

৩। **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী** (autonomic nervous system)।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর আলোচনার পূর্বে আমরা কয়েকটি উৎপাদনকারীর (effector) কথা বলব। পেশী ও গ্রন্থিকে উৎপাদনকারী বলে। পেশী ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক দুই প্রকারের এবং গ্রন্থিগুলি সনালী ও নালীহীন এই
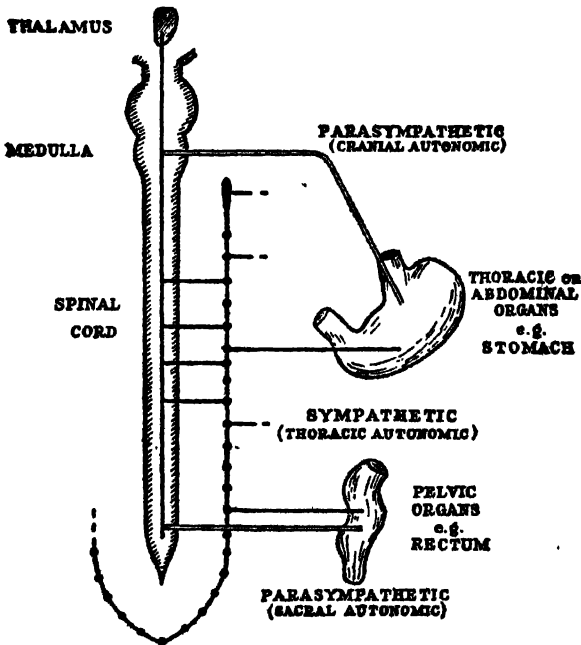
স্বয়ং ক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী

দুই প্রকারের। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী আমাদের দেহের অনৈচ্ছিক পেশীর সহিত যুক্ত। পেশীতে গ্রাহক কোষ (receptor cells) থাকে। এগুলি থেকে সংবেদক তন্তু বেরিয়ে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীতে মিশেছে।

নালীহীন গ্রন্থি হল থাইরয়েড পিটুইটারী, এ্যাড্রিন্যাল প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থি থেকে রসক্ষরণ হয়ে সোজাসুজি রক্তে মিশ্রিত হয় এবং রক্তের থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থিগুলি এক বিশিষ্ট পদার্থ প্রস্তুত করে। একে বলে হরমোন।

সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে সমান্তরালভাবে স্নায়ুপুঞ্জের শ্রেণী চলে গেছে। এই স্নায়ুপুঞ্জ (ganglia) সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়া সুষুম্নাশীর্ষ অথবা থ্যালামাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এগুলি মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এরা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং এদের কাজ সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না।

শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র—পাকযন্ত্র, অন্ত্র, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস প্রভৃতিকে এই স্নায়ুমণ্ডলী যেরূপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেইরূপ ইহা কতগুলি গ্রন্থি—যেমন লালা গ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি, এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি প্রভৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি অনৈচ্ছিক পেশীকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি পেশীকে কেবল কর্মে উদ্দীপ্ত করে এর নিজের কোন সংবেদন গ্রহণের ক্ষমতা নেই।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীকে আমরা দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি :—

(১) **সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলী** (Sympathetic nerves)

(২) **প্যারা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলী** (Parasympathetic nerves)

সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলি বেরিয়েছে সুষুম্নাকাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গা থেকে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুবিভাগ আছে সুষুম্নাকাণ্ডের উপরের দিকে ; এই স্নায়ু বহির্গত হয়েছে সুষুম্নাশীর্ষ ও মধ্যমস্তিষ্ক (Cranial divisions) থেকে। সুষুম্নাকাণ্ডের একেবারে নীচের দিকেও প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগ আছে।

সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগের কাজ পরস্পরের বিপরীত। প্রথমটি দেহাংশকে উত্তেজিত করে। এই স্নায়ুগুলি সক্রিয় হলে হৃৎস্পন্দন বাড়ে, নিঃশ্বাস দ্রুত হয়, কিডনির শর্করা রক্তে প্রবেশ করে, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগের কাজ এর ঠিক উল্টো—ইহা সক্রিয় হ'লে হৃৎস্পন্দন ধীর হয়, রক্তপ্রবাহ মন্থর হয় এবং রক্তের চাপ হ্রাস পায়।

সিমপ্যাথেটিক বিভাগটি উত্তেজিত হলে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি উত্তেজিত হয়

এবং এ্যাড্রিনালিন নামক রস নিঃসৃত হয়। আবেগের সময় এই অ্যাড্রিনালিন অতিরিক্ত মাত্রায় নিঃসৃত হয়। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু সক্রিয় হলে প্যারা-সিমপ্যাথেটিক বিভাগের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কথা বন্ধ রেখে নিঃশব্দে আহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। খাবার সময় উত্তেজিত হতে নেই। এই সময় আবেগ এলে হৃদয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি ধ্বংসাত্মক (Katabolic) এবং দ্বিতীয়টিকে বলতে পারি গঠনমূলক (Anabolic)।

Questions

1. Describe the structure and function of neurone in brief. সংক্ষেপে নিউরনের গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ দাও।

2. Describe in broad outline the different parts of human nervous system together with their function—মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীও তাহাদের প্রত্যেকটির ক্রিয়ার বিবরণ দাও।

3. Name the different parts of the central nervous system—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের ক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

4. What is meant by cerebral localisation মস্তিষ্কের স্থান বিভাগ বলিতে কি বোঝায়? চিত্র সাহায্যে বিবরণ দাও।

5. What is a synapse and what is its functions? স্নায়ুসন্ধি কি এবং ইহার কাজ কি?

6. What do you mean by arc? Classify action according to the nature of an arc.—চাপ বলিতে কি বোঝায়? চাপের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ কর।

7. Describe the autonomic nervous system and its functions—স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন ও কার্য্যের বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের আচরণ
(Human Behaviour)

মানুষের আচরণঃ—মানুষের আচরণের আলোচনায় অগ্রসর হলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে মানুষ কেন আচরণ করে। মানুষের আচরণের মূলে আছে প্রয়োজন চরিতার্থতার তাড়না। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের মতে সহজাত সংস্কার প্রাণীর আচরণের মূল উৎস। ক্ষুধা মানুষের সহজাত সংস্কার। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ খাদ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং লক্ষ্যে পৌছানর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া করে। লক্ষ্য লাভের পর প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হয় এবং কর্মের সমাপ্তি ঘটে।

নিম্নেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে আচরণের মূলে সহজাত সংস্কার থাকলেও মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। মানুষের আচরণ সহজাত প্রবৃত্তি প্রণোদিত হতে পারে আবার শিক্ষাপ্রসূত হতে পারে। মানুষের জীবনে শুধু জৈব প্রয়োজনই সব নয়, তার মানসিক প্রয়োজনও আছে। সভ্য জগত মানুষের মনে দিয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কামনায় মানুষ আচরণ করে থাকে।

আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Behaviour)

নিম্নে আচরণের বৈশিষ্টগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

(১) মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কতগুলি আচরণ জৈব এবং শরীর রক্ষার জন্য জীব এই আচরণ করে।

(২) প্রত্যেক আচরণের জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। বনে বাঘ দেখলে মানুষ পলায়ন করে। বাঘ এখানে উদ্দীপক। মানুষের ক্ষেত্রে বাহ্য ও মানসিক দুই প্রকার উদ্দীপক ক্রিয়া করে।

(৩) মানুষের আচরণ পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। দেশ কালভেদে বয়সের ক্রমবৃদ্ধিতে মানুষের আচরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

(৪) একই উদ্দীপকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন আচরণ করে।

(৫) পরিবেশের মধ্যে জীব ক্রিয়া করে।

আচরণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Behaviour)

মানুষের আচরণ দুই প্রকার :—জন্মগত ও শিক্ষালব্ধ। জন্ম থেকে মানুষ কতগুলি প্রবৃত্তি লাভ করে। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সে যে আচরণ করে তাকে বলে জন্মগত আচরণ। এ আচরণ বিধি মানুষ শিক্ষা করে না। আপনা থেকেই সে কাজ করে। জন্মগত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) **স্বতঃস্ফূর্ত্ত আচরণ** :—ছোট শিশুকে পেট ভরে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে, সে আপন মনে হাত পা ছোঁড়ে। আরও বড় হলে সে লাফায়, ঝাঁপায়, ছোটাছুটি করে। আভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ হ'ল স্বতস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া। এই ক্রিয়ায় শিশুর সচেতন প্রয়াস নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে মানসিক শক্তি সঞ্জাত, এর জন্য কোন উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না। এই আচরণের পরোক্ষ লক্ষ্য হ'ল শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি।

(২) **প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া** :—হাঁচি, কাশি প্রভৃতি হ'ল প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া। জ্ঞানদা স্নায়ু উদ্দীপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়া সাধিত হয়। এই কর্ম্মের জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে। উত্তেজকটি বেদনাদায়ক হলে এড়িয়ে চলি, সুখকর হলে গ্রহণ করি। প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া দুই প্রকার :—সরল প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া ও ক্রমিক প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া। গরম পাত্রে হাত লাগলে হাত সরিয়ে নিই ; চোখে উজ্জ্বল আলো লাগলে চোখ বন্ধ করি। এগুলি হ'ল সরল প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া। কতগুলি প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার সমষ্টি হ'ল ক্রমিক প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া। লঙ্কার ঝাঁঝ লাগলে এক সঙ্গে হাঁচি, কাশি হয় এবং চোখ দিয়ে জল পড়ে। প্রত্যাবর্ত্তক আবার অনমুবর্ত্তিত ও অনুবর্ত্তিত হতে পারে। প্রত্যেক প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। যখন উপযুক্ত উদ্দীপকের দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া হয় তখন তাকে বলে অননুবর্ত্তিত ক্রিয়া। যেমন খাবার দেখলে মুখে লালা ঝরে। কিন্তু অন্য উদ্দীপক দ্বারাও অনেক সময় প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া হয়। একে বলে অনুবর্ত্তিত ক্রিয়া।

প্যাভলভ একটি কুকুরের উপর অনুবর্ত্তনের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। কুকুরটিকে প্রত্যেকবার খেতে দেবার পূর্ব্বে ঘণ্টাধ্বনি করা হত ; কিছুদিন

পরে দেখা গেল খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টাধ্বনি করলেও কুকুরের মুখে থেকে লালা নিঃসৃত হয়।

(৩) **সহজাত কর্ম্ম** :—সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ এই ক্রিয়া করে। ক্ষুধা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির তাড়ণায় মানুষ খাদ্য অন্বেষণ করে।

প্রেষণা (Motivation)

কোন ব্যক্তির বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা প্রভৃতি আছে, অথচ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় জীবনে সে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারে নি। এর কারণ কি ? এই অক্ষমতার কারণ হ'ল তার উদ্দেশ্য নেই। কৃতিত্ব অর্জ্জনের জন্য তার অন্তরে তাগিদ নেই, এর জন্য সে যথেষ্ট পরিশ্রম করে না। অভাববোধ বা প্রয়োজনের তাড়নায় মানুষ লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবার জন্য অন্তরে সক্রিতার ভাব অনুভব করে। মনের এই গতীয় অবস্থাকে (Dynamic state) প্রেষণা বলে। প্রেষণা চক্রের তিনটি ধাপ :—প্রথম ধাপের তিনটি স্তর—প্রয়োজন (need), তাড়না (drive) ও উদ্দেশ্য (motive)।

মানুষের জীবনে অভাববোধ আছে ; অভাববোধের থেকে প্রয়োজনের সৃষ্টি। অভাব থাকার জন্য ব্যক্তি অন্তরে অভাব দূর করার জন্য তাড়না অনুভব করে এবং লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয়। খাদ্যাভাব হলে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়না অনুভব করে এবং খাদ্যান্বেষণ করে।

প্রেষণায় ব্যক্তি একটি অস্বস্তিকর অনুভূতির সম্মুখীন হয়। যতক্ষণ না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ এই অনুভূতি তাকে তাড়না বা চালনা করে।

প্রেষণায় উদ্দীপক থাকতে পারে। কিন্তু উদ্দীপক ও উদ্দেশ্য এক নয়। প্রথমে উদ্দেশ্য তারপর উদ্দীপকের স্থান। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির প্রথম উদ্দেশ্য জল! তারপর জলের গ্লাসটি সামনে দেখলে সে সেটি তুলে নেয়। প্রথমে জলের প্রয়োজন অনুভব করে, পরে উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগী হয়।

প্রেরণা চক্রের দ্বিতীয় ধাপ হল কারণভূত ব্যবহার (Instrumental behaviour)—জটিল প্রয়োজনকে বুঝতে গেলেই কারণভূত ব্যবহারের আলোচনা করা প্রয়োজন। এই ব্যবহার হ'ল একটি সাধারণ ক্রিয়া যেমন

ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কান্না। প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া, সহজাত ক্রিয়া যেমন শিশুর মাতৃস্তন্য পান প্রভৃতিও কারণ ভূত ব্যবহারেরই অঙ্গ। কারণ ভূত ব্যবহার শিক্ষণের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়।

প্রেষণা চক্রের তৃতীয় ধাপ হল লক্ষ এবং প্ররোচক (incentive)। কারণ ভূত ব্যবহার এই লক্ষ্য পথে নির্দ্দিষ্ট হয়। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের লক্ষ্য হ'ল খাদ্য। প্ররোচক অথবা লক্ষ্য একই জিনিষ কেবল উভয়ের পার্থক্য হ'ল এই যে প্ররোচক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি ইঁদুরকে গোলোক ধাঁধা শিখাতে চায়। সে খাবার দিয়ে ইঁদুরকে বেশী করে সচেষ্ট করতে পারে। জৈব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হল জল। জটিল প্রয়োজনে অবশ্য কয়েকটি লক্ষের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হতে পারে। খ্যাতির প্রয়োজন যে কোন একটি লক্ষ্যে পৌঁছালেই মিটতে পারে। যেমন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্, সুলেখক ইত্যাদি যে কোনো একটি হতে পারলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। প্রেষণার আলোচনায় লক্ষ্যও একটি জটিল আলোচ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং তাড়না (Motive, need and drive)

উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং তাড়না প্রায় সমার্থক হলেও সমার্থক নয়। উদ্দেশ্যে লক্ষই প্রধান ; প্রয়োজনের মূলে আছে অভাববোধ এবং তাড়না হ'ল অভাবজনিত মানসিক অনুভূতি। উদ্দেশ্য ব্যাপকতর, প্রয়োজনের গণ্ডী সীমিত।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক নয়। উদ্দেশ্যের সঙ্গে জটিল কতগুলি অনুভূতি, লক্ষ লাভের চেষ্টা ও আগ্রহ মিশে থাকে। উদ্দেশ্য হ'ল ব্যাপক, তাড়নার মধ্যে গভীরতার ভাবটি আছে। তাড়নাতেও লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু তাড়নার লক্ষ্যটি জৈব প্রয়োজনের জন্য বলে মনে হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যের অর্থ মানব মনের বহু বিচিত্র বাসনা। উদ্দেশ্যের মধ্যে নূতনত্ব, বৈচিত্র্য, ব্যক্তিগত পার্থক্য প্রভৃতি আছে। তাড়নার লক্ষ্য সুনির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তিত, বৈচিত্র্যহীন। একই উদ্দেশ্য নানা লক্ষ্যের দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তাড়নার লক্ষ্য একটি। ক্ষুধার্ত্তের লক্ষ্য হ'ল একমাত্র খাদ্য।

উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক এক নয়। উদ্দীপক সংবেদনের সৃষ্টি করে, উদ্দেশ্য সাধনে উদ্দীপকের প্রয়োজনও হয়। কিন্তু সব উদ্দীপক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে জলের গ্লাসটি ছাড়া অন্য সব উদ্দীপকই বিফল। উদ্দীপক আবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধাও সৃষ্টি করতে পারে। পড়াশোনার সময় গণ্ডগোল হলে পড়াশোনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

উদ্দেশ্য ও প্ররোচক (incentive) আবার এক নয় প্ররোচক লক্ষ্য নয়; কিন্তু লক্ষ্যের পথে এর প্রয়োজন হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধিকে প্ররোচক ত্বরান্বিত করে দিতে পারে। যেমন শ্রমিককে বোনাস দিলে শ্রমিক অধিকতর শ্রমব্যয় করবে এবং মালিকের উৎপাদন লক্ষ্যটি সুফল প্রসূ হবে।

মানুষের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রয়োজন (Some Principal human needs) :—মানুষের জীবনের প্রয়োজন অসংখ্য। কয়েকটি প্রধান প্রয়োজন সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

(১) **তৃষ্ণা (thirst) :**—জলের প্রয়োজনে আমরা তৃষ্ণা অনুভব করি। আমাদের শরীরে জলের প্রয়োজন হয় কারণ ঘর্ম, মূত্র প্রভৃতির সহিত আমাদের শরীরের জলীয় অংশ চলে যায়। কিন্তু তৃষ্ণা কি? জলের প্রয়োজনে মানুষ কেন তৃষ্ণার্ত হয়? পূর্ব্বে দেহতত্ত্ববিদগণ বলতেন গলা ও মুখ গহ্বর শুষ্ক হলে আমরা জলের প্রয়োজন অনুভব করি। কিন্তু এর দ্বারা তৃষ্ণার ব্যাখ্যা হ'ল না। জলের অভাবে দেহকোষ শুষ্ক হয়। আমাদের মস্তিষ্কে হাইপো-থ্যালামাসে কতগুলি কোষ আছে, সেগুলির জলের প্রয়োজন খুব বেশী। মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এই কোষগুলি সমস্ত শরীরের জলের প্রয়োজন মেটায় জলপানের দ্বারা।

(২) **ক্ষুধা (hunger) :**—শরীরের পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও তাপসংরক্ষণের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্যাভাব হলে ব্যক্তি ক্ষুধা অনুভব করে। কিন্তু ক্ষুধা কি? কারও কারও মতে ক্ষুধার কারণ হ'ল খাদ্যাভাবে ব্যক্তি দুর্ব্বলতাজনিত অস্বস্তি অনুভব করে এবং ক্ষুধা অনুভব করে। কোন কোন ব্যক্তি আবার উভয় কারণে ক্ষুধা অনুভব করে।

কিন্তু পাকস্থলী নেই এরকম ব্যক্তিরও ক্ষুধা হতে দেখা গেছে। ক্ষুধার সঠিক কারণও আবিষ্কৃত হয় নি। অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে খাদ্যের প্রয়োজনে

ব্যক্তির দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং ব্যক্তি ক্ষুধা অনুভব করে। কিন্তু এই রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুব কম।

(৩) **নিদ্রা** (sleep) :—শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন হয়। নিদ্রা মানুষের জৈব প্রয়োজন। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে নিদ্রা কেন্দ্র আছে। এর দ্বারা নিদ্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

(৪) **যৌন প্রয়োজন** (sexual need) :—জীবের প্রয়োজন হ'ল আদিম প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের সহিত অন্য প্রয়োজনের পার্থক্য আছে।

অন্যান্য জৈব প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি না হলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। খাদ্য ও জলের অভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু যৌন প্রয়োজন পরিতৃপ্ত না হলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও তাড়না (instinct and drive) :—আমরা বলে থাকি মাতা সহজাত প্রবৃত্তির বশে সন্তান লালন পালন করে। পাখী খড়কুটো সংগ্রহ করে বাসা বাঁধে একই প্রবৃত্তির জন্য। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে দুটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান দেখা যায়। একটি হ'ল জৈব তাড়না অপরটি জটিল সহজাত অনর্জ্জিত আচরণ। ক্ষুধা তৃষ্ণা জৈব প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলির জন্য মানুষের আচরণ জটিল হয় না। কিন্তু যৌন প্রয়োজনে জীবের আচরণ জটিল হয়। পাখী যৌন প্রয়োজন চরিতার্থতার জন্য গান করে, ডাকে, ধাওয়া করে তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে কিছুক্ষণ ধরে সোহাগ করে, পালকগুলি ছড়িয়ে দেয় তারপর যৌন প্রয়োজন চরিতার্থ করে।

মাতৃত্বের প্রবৃত্তি একটি সহজাত প্রবৃত্তি। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে প্রোল্যাকটিন নামক রসক্ষরণ হয়, ফলে মাতৃস্তন্য গ্রন্থি উত্তেজিত হয় এবং দুগ্ধ ক্ষরণ হয়। দৈহিক পরিবর্তনের ফলে মাতার মনে মাতৃভাব জাগে।

প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ (classification of need) :—মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য আছে তাই তার প্রয়োজন বহুবিধ। ব্যক্তির প্রয়োজনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) **প্রয়োজন জৈব হতে পারে এবং মানসিক হতে পারে** (organic and mental)।—জীবন রক্ষার জন্য জৈব প্রয়োজন অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে দেহতত্ত্ববিদগণ হোমোস্টেসিস কথাটির উল্লেখ করেছেন। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে সাম্য থাকা দরকার। একে বলে হোমোস্টেসিস (Homœostasis)। শরীরের চাপ, তাপ, রক্তের অম্লত্ব, ক্ষারত্ব প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যে একটি সাম্য থাকবে; সাম্যের অভাব হলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। যেমন শরীরের অত্যধিক তাপ হলে ঘাম হয়। ঘাম উত্তাপ কমাবার জন্য দেহকে সিক্ত রাখে। সেইরূপ খাদ্য, জল, অক্সিজেন জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। এর অভাবের জন্য ব্যক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি অনুভব করে। এই জৈব প্রয়োজনের তাড়নায় সে সক্রিয় হয়। বিভিন্ন জৈবিক কার্য্য যেমন পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস ক্রিয়া প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানসিক প্রয়োজন :—শিশুর মানসিক প্রয়োজনগুলি হ'ল আত্ম-কেন্দ্রিক। নিজের খেলনাগুলি সে সযত্নে রেখে দেয়। বাবা মার ভালবাসা একাই পেতে চায়। বড় হলে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয় এবং শিশু আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। সঞ্চয়ের প্রয়োজনও ব্যক্তির মানসিক প্রয়োজন। এই সব প্রয়োজন সৃষ্ট হয় অহংবোধ থেকে।

আজকের দিনে মানসিক প্রয়োজনের তাগিদ অনেক। পৃথিবীতে অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রভৃতি অনেক কিছু মানুষ কামনা করে। মানসিক তৃপ্তির জন্যও ব্যক্তি প্রয়োজন সৃষ্টি করে, যেমন একটি উপন্যাস পাঠের প্রয়োজন বা সিনেমা দেখার প্রয়োজন।

(২) **সহজাত ও শিক্ষালব্ধ প্রয়োজন** (learned and unlearned need): সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে নূতন নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়। নূতন রুচি, নূতন জ্ঞান, নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি ও নূতন আদর্শ প্রভৃতি ব্যক্তি মনে নূতন প্রয়োজনের সৃষ্টি করে। পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রয়োজনও পরিবর্তিত হয়। এগুলি হল শিক্ষালব্ধ প্রয়োজন।

নিছক দৈহিক প্রয়োজন হল সহজাত প্রয়োজন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জীবের সহজাত প্রয়োজন।

(৩) **সামাজিক ও ব্যক্তিগত** (social and individual) **প্রয়োজন** :—মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। বাবা, মা, ভাই, বোন, বন্ধু, প্রতিবেশী

প্রভৃতির সঙ্গে সে বাস করে। মানুষের মধ্যে একসঙ্গে বাস করার এই তাগিদের জন্য ব্যক্তি অন্যের সংসর্গের জন্য ব্যগ্র হয়। একসঙ্গে বাস করার তাগিদ আসে বিভিন্ন প্রয়োজন থেকে। মানুষ অন্যের উপর নির্ভর করতে ভালবাসে, অন্যের ভালবাসা সে চায়, অন্যে তার সেবা যত্ন করুক তা সে চায়। শিশু শৈশবে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। পরবর্ত্তীজীবনে সে বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করে। বন্ধুর কাছে সুখদুঃখের কথা বলার প্রয়োজন হয়। যৌন প্রয়োজনেও ব্যক্তি মানুষের সংসর্গ কামনা করে।

আত্ম প্রতিষ্ঠার (need of status) প্রয়োজন সামাজিক প্রয়োজন। নেতৃত্ব, যশ, খ্যাতির প্রয়োজনে মানুষ আচরণ করে। ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ পদটি কামনা করে এবং অন্যের চেয়ে বেশী সম্মানের আসনটি অধিকার করতে চায়।

সম্মানবোধের (prestige) প্রয়োজন এর থেকে উদ্ভুত। অর্থ, পোষাক, পরিচ্ছদ, বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি সমাজে সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়।

আত্মপ্রতিষ্ঠার পর আসে আত্মরক্ষার প্রয়োজন (security) সামাজিক প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তি প্রিয়জন প্রভৃতি হারাবার ভয়ে ভীত মানুষ সেগুলি রক্ষার জন্য চেষ্টা করে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন শিক্ষা ও রুচির জন্য ব্যক্তির লক্ষ্য বিভিন্ন হয়। ব্যবসায়ী ও ডাক্তারের প্রয়োজন বিভিন্ন। আবার কোন কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন চরিতার্থ করে। সমাজের খ্যাতির জন্য লালায়িত হয় না। সকল প্রকার জৈব ও সামাজিক প্রয়োজন হল ব্যক্তিগত প্রয়োজন।

সামাজিক প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য মানুষ কতগুলি উপায় অবলম্বন করে যেমন সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা। ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য অপরের সাহায্য নিয়ে থাকে। একে বলে সহযোগিতা (co-operation)।

সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) :—

মানুষ জন্ম থেকে কতগুলি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, এবং সেই প্রবৃত্তির বশে ক্রিয়া করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতৃস্তন্য পান করে। মাতা সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ সন্তান লালন করে।

সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে আমরা **সহজাত প্রবৃত্তির কতগুলি বৈশিষ্ট্য** সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(১) সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি জৈব প্রয়োজন থেকে। জৈব প্রয়োজনের জন্য ব্যক্তির একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় এবং প্রয়োজন চরিতার্থতার প্রবৃত্তি থেকে সে ক্রিয়া করে।

(২) সহজাত প্রবৃত্তি জৈব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হলেও ঐ প্রয়োজন সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন থাকে না। পাখীর বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি সহজাত। কিন্তু বাসা বাঁধার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে সচেতন নয়।

(৩) সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও, সব প্রবৃত্তিগুলি জন্মসময়ে প্রকাশিত হয় না। যৌনপ্রবৃত্তির প্রকাশ হয় অনেক পরে; কিন্তু শিশুর স্তন্য পানের প্রবৃত্তি জন্ম সময়ে প্রকাশিত হয়।

(৪) সহজাত প্রবৃত্তি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। সেইজন্য সহজাত ক্রিয়া কতকটা যান্ত্রিক হয়। সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

(৫) সহজাত প্রবৃত্তি সব জীবেরই থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তি সব মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

(৬) সহজাত প্রবৃত্তি জৈব প্রয়োজন সঞ্জাত। জীবের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে জীব ক্রিয়া করে।

(৭) সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মানুষ কাজ করে; এই প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ-জড়িত থাকে। আবেগ অনুভূতিমূলক কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি ক্রিয়ামূলক।

(৮) সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষালব্ধ নয় কিন্তু অভিজ্ঞতা, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। পাখী সহজাত প্রবৃত্তি বশে খড় কুটো সংগ্রহ করে কিন্তু যা খুসী সংগ্রহ করে না। বাসা তৈরীর উপকরণগুলিই সংগ্রহ করে।

(৯) শিক্ষা সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে। শিক্ষিত মনের অনুশাসনে যৌন প্রবৃত্তি দমিত হয়।

সহজাত প্রবৃত্তির মতবাদে ম্যাকডুগ্যাল:—ম্যাকডুগালের মতে মানুষের সমস্ত কর্ম্মের মূলে আছে সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বললেন সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জন্মগত

প্রবণতা যা তার অধিকারীকে কোন এক শ্রেণীর বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে, এবং ঐরূপ একটি বস্তু প্রত্যক্ষণের পর বিশেষ প্রকৃতির একটি আবেগের উত্তেজনা উপলব্ধি করায় ও একটি বিশেষ উপায়ে ঐরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করে অথবা অন্ততঃ ঐরূপ কর্মের প্রেরণার উপলব্ধি ঘটায়।

ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবণতা দুইপ্রকার :—

(১) সুনির্দিষ্ট ও (২) সাধারণ। এই সুনির্দিষ্ট প্রবণতাকে তিনি সহজাত প্রবৃত্তি বলেছেন। সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি দিক—(১) জ্ঞানমূলক (২) অনুভূতিমূলক ও (৩) ক্রিয়ামূলক। বাঘের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তির জ্ঞানমূলক প্রত্যক্ষণ হ'ল। ভয় হ'ল আবেগ মূলক এবং পলায়ন হ'ল ক্রিয়ামূলক দিক।

ম্যাকডুগাল চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রত্যেকটির সহিত জড়িত এক একটি আবেগের একটি তালিকা দিয়েছেন। আবেগের অধ্যায়ে তালিকাটি প্রদত্ত হল।

এরপর ম্যাকডুগাল কয়েকটি প্রবণতার কথা বলেছেন। সহজাত প্রবৃত্তির মূলে যে আবেগজনিত দিক আছে তাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি প্রবণতার কথা বললেন। পরে তিনি চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে কয়েকটি প্রবণতা জুড়ে দিলেন। তাঁর এই তালিকা অনুযায়ী সহজাত প্রবণতা হল সতেরটি। এই তিনটি সহজাত প্রবণতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত আবেগ দেওয়া হল :—

প্রবণতা	আবেগ
বিশ্রাম	ক্লান্তিবোধ
আরাম	দুঃখ বিরূপতা
কৌতূহল	ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা

ম্যকডুগালের মতবাদের বিভিন্ন সমালোচনা করা হয়েছে। নীচে সেগুলি আলোচিত হল।

(১) তিনি হাঁচি, কাশি, চুলকান, মলত্যাগ প্রভৃতিকেও সহজাত প্রবৃত্তি বলেছেন। কিন্তু এগুলি হল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। সহজাত প্রবৃত্তিকে তিনি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখেছেন। তাঁর এমত গ্রহণ-যোগ্য নয়।

(১) সহজাত প্রবৃত্তির ধারণটি বর্ণনা মূলক, এর মধ্যে কোন

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ভয় হলে মানুষ পলায়ন করে। সহজাত প্রবৃত্তির এটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল না।

(৩) সহজাত প্রবৃত্তিকে মানুষ দমন করতে পারে। প্রবৃত্তি বশে সব সময় কাজ করে না।

(৪) সব কাজের মূলেই তিনি সহজাত প্রবৃত্তি আছে বলেছেন। কিন্তু মানুষ কেবল প্রবৃত্তির বশে কাজ করে না; তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে। ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিকে পৃথক করে দেখেননি। কিন্তু প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি এক নয়।

(৫) মানুষের আচরণ অত্যন্ত জটিল, প্রবৃত্তি বশে মানুষের সব আচরণ অনুষ্ঠিত হয় বললে—আচরণকে সহজ করে ফেলা হয়।

প্রত্যেক প্রবৃত্তির সঙ্গেই একটি আবেগের কথা তিনি বলেছেন কিন্তু সব প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে না।

(৭) ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তির সংজ্ঞা মেনে নিলে মানুষের আচরণকে যান্ত্রিক বলতে হয়। কিন্তু সব আচরণ যান্ত্রিক নয়। মানুষের আচরণ দেশে কালে পরিবর্তিত হয় এবং তার আচরণে বৈচিত্র্যও আছে।

পূর্ব্বে এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি (instinct and intelligence)

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত। সহজাত প্রবৃত্তি শক্তি নয় কর্ম্মের একটি প্রবণতা কিন্তু বুদ্ধি হ'ল শক্তি। সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন নেই—ইহা একঘেয়ে। কিন্তু বুদ্ধি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নূতন নূতন আচরণ করায়। বুদ্ধি অতীতের শিক্ষাকে কাজে লাগায়। কিন্তু সহজাত ক্রিয়া শিক্ষা নিরপেক্ষ ও বৈচিত্র্যহীন। বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তি দুইই পরিবেশের সহিত সঙ্গতি বিধানের অস্ত্র স্বরূপ। যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ (instinct and emotion)

ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে। আবেগই প্রবৃত্তিকে জাগায়। ড্রেভার, রিভার মায়ার্স প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই মতবাদের বিরোধী। তাঁদের মতে সহজাত প্রবৃত্তির

সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকলেও, সব সময় সব প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে না। সহজাত আচরণ যদি বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে সমাপ্তি লাভ করে তাহলে আবেগ জন্মায় না। কিন্তু আচরণ বাধার সম্মুখীন হলে উত্তেজনা আসে এবং আবেগের সঞ্চার হয়। শিকারীর হাতে বন্দুক থাকলে বাঘ দেখলেও সে ভয় পাবে না। বিপদে পলায়নে সক্ষম হলে প্রাণীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is motive ? How does it differ from needs and drives ?

উদ্দেশ্য কাহাকে বলে ? তাড়না ও প্রয়োজনের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কোথায় ?

2. Classify need. What are the principal needs of human being ?

প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ কর মানুষের প্রধান প্রধান প্রয়োজনের বিবরণ দাও।

3. What do you mean by human behaviour. What are its characteristics ?

মানুষের আচরণ বলিতে কি বোঝ ? এই আচরণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর।

4. Explain and Examine Mcdougall's theory of instinct.

ম্যাকডুগ্যালের মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর।

5. What is instinct ? How does it differ from intelligence.

সহজাত প্রবৃত্তি কি ? বুদ্ধির সঙ্গে ইহার পার্থক্য কোথায় ?

পঞ্চম অধ্যায়

অনুভূতি ও আবেগ (Feelings and emotions)

অনুভূতির স্বরূপ (Nature of feeling)

বাসনার পশ্চাতে দুটি জিনিষ কাজ করে: একটি হ'ল উদ্দেশ্য অপরটি হ'ল অনুভূতি। আমরা ক্ষুধার জন্য খাদ্যের অন্বেষণ করি এবং ক্ষুধা অনুভব করি। সাধারণভাবে অনুভূতি অর্থে বোধ বোঝায়। কোন স্থানে আঘাত লাগলে বেদনার অনুভূতি লাভ করি; আমার সামনে কেউ কথা বলছে, তার অস্তিত্ব অনুভব করি। ডাক্তার রোগীর নাড়ী অনুভব করেন।

মনোবিজ্ঞানে অনুভূতি জ্ঞানাত্মক নয় বা বাসনার সঙ্গেও জড়িত নয়। মানসিক যে অবস্থার সঙ্গে আবেগ জড়িত তাকেই মনোবিজ্ঞানে অনুভূতি বলা হয়। ঘন জঙ্গলে বাঘের গর্জ্জনে প্রথমে অনুভূতি লাভ করি পরে ভয় নামক আবেগের বশীভূত হয়ে পলায়ন করি।

অনুভূতি হ'ল মৌলিক, একে বিশ্লেষণ করে বোঝান যায় না। সেইজন্য আমরা অনুভূতির স্বরূপ আলোচনা করে একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হ'ব।

(১) অনুভূতি প্রীতিকর অথবা অপ্রীতিকর হতে পারে। সব অনুভূতিই সুখের অথবা দুঃখের হবে। কোন কোন অনুভূতি আবার সুখদুঃখ উভয়েরই হতে পারে। যেমন উত্তেজনা। সুখজনিত উত্তেজনা হতে পারে, আবার দুঃখ জনিতও হতে পারে।

(২) অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে আত্মকেন্দ্রিক। অনুভূতি একেবারেই নিজস্ব। আমার অনুভূতি শুধু আমিই জানি, অন্যের সাধ্য নেই তাকে অনুভব করা।

(৩) অনুভূতি সক্রিয় নয়—অনুভূতি অন্তরের, বহির্জগতে অনুভূতির জন্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।—তবুও অনুভূতির সঙ্গে একটি কর্ম্মের উদ্যম মিশে থাকে। অপ্রীতিকর অনুভূতি হলে তার হাত এড়িয়ে যাবার জন্য মনে মনে সক্রিয় হই। বিশ্রী গন্ধ আসছে; ইচ্ছে করছে সেখান থেকে

চলে যাবার। কিন্তু অনুভূতি নিষ্ক্রিয়; অনুভূতির সঙ্গে পেশীর ক্রিয়া জড়িত নয়। অনেক সময় আবার আমরা জোর করে কাজ করি কিন্তু অন্তরে কাজের জন্য কোন ইচ্ছার অনুভূতি থাকে না।

(৪) অনুভূতি ও জানা সম্পূর্ণ পৃথক। পরিবেশ বা নিজের সম্বন্ধে চেতনাকে অনুভূতি বলব না। ইন্দ্রিয়জাত সংবেদন ও অনুভূতি নয়।

(৫) প্রীতিকর অনুভূতি অবাঞ্ছিত হতে পারে। মিষ্টি গন্ধে সুখের অনুভূতি লাভ করি কিন্তু এই অনুভূতির জন্য পূর্বে থেকে বাসনা না থাকতে পারে। সেইরূপ অপ্রত্যাশিত তিক্ত স্বাদের অনুভূতি লাভ করি।

আবার অনুভূতির জন্য প্রত্যাশা থাকতে পারে। তৃষ্ণার সময় শীতল পানীয়ের জন্য অন্তরে লালায়িত হতে পারি। এই সকল অনুভূতির পশ্চাতে উদ্দেশ্য (motive) থাকে।

(৬) অনুভূতি ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একই উদ্দীপকে কেউ সুখ অনুভব করে। কেউ দুঃখ অনুভব করে। অতএব অনুভূতি বস্তু নিরপেক্ষ ও আত্মকেন্দ্রিক।

(৭) অনুভূতির মধ্যে উত্তেজনা অথবা নিরুত্তাপ ভাব থাকতে পারে। ছেলে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে সুখের অনুভূতির সঙ্গে মনে মনে উত্তেজনা অনুভব করছি। আবার ছেলের পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে। দুঃখের ভারে মনে অসাড়তা আসতে পারে।

এক কথায় অনুভূতি একটি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যার সঙ্গে সুখ অথবা দুঃখ জড়িত থাকে।

অনুভূতির শ্রেণী বিভাগ (classification of feeling) :—

অনুভূতি দুই প্রকার :—সংবেদনাত্মক ও আবেগমূলক। পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অনুভূতি লাভ করি সেগুলিকে সংবেদনাত্মক অনুভূতি বলতে পারি; এর সঙ্গে দৈহিক প্রকাশ জড়িত নেই। মিষ্টি গন্ধে সুখ লাভ করছি এর সঙ্গে সক্রিয়তা মিশে নেই। আবেগের সঙ্গে দৈহিক প্রকাশ জড়িত থাকে যার জন্য পেশী ক্রিয়া করে থাকে। দুঃখ হলে কাঁদি, ভয় পেলে কাঁপি এবং তারপর পলায়ন করি।

অনুভূতির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী উণ্ড বলেছেন অনুভূতি ত্রি-আয়তনের। (১) সুখকর অথবা দুঃখকর অনুভূতি (Pleasant or unpleasant)। (২) উত্তেজনা ও অবসাদ (Excitement and tense) এবং কাঠিন্য, প্রত্যাশা ও শিথিলতা (tense, expectant and relax)। উণ্ড এই ত্রি-আয়তনের মধ্যে অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ করলেন।

পরম সখ থেকে স্তরে স্তরে চরম দুঃখ পর্য্যন্ত একই স্কেলে সুখকর ও দুঃখকর অনুভূতিকে সাজানো যায়। সেইরূপ চরম উত্তেজনা থেকে শান্ত অবস্থা এবং প্রত্যাশা থেকে শিথিলতাকে সাজানো যায়। কোন কিছুর প্রত্যাশায় বহুক্ষণ থাকার পর আস্তে আস্তে প্রত্যাশা চলে গিয়ে মন শিথিল হয়ে আসে।

সহানুভূতি ও সমবেদনা দুই প্রকার অনুভূতি (sympathy and empathy)।

অন্যের মত অনুভব করা বা অপরের সহিত অনুভব করাকে সহানুভূতি বলে। সকলের মধ্যে একটি উত্তেজনার ভাব দেখলে আমিও উত্তেজনা অনুভব করি। বন্ধু যা অনুভব করছে, আমারও সেইপ্রকার অনুভব করার ইচ্ছা হয়।

সমবেদনার সময় অন্যের অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলি। উপন্যাস পড়ছি; নায়কের সুখ দুঃখ নিজের সঙ্গে এক হয়ে গেছে; তাই নায়কের সুখে পুলক অনুভব করছি; দুঃখে বেদনা অনুভব করছি।

আবেগ (Emotion)

পরীক্ষায় ফেল করার সংবাদটা নিয়ে বাড়ী ফিরল সমিতা। মা প্রশ্ন করতেই কেঁদে ফেলল। মা বুঝলেন শমিতা দুঃখ পেয়েছে। আবার রেডিওতে গান গেয়ে ফিরে এসে এই শমিতাই সেদিন মায়ের গলা জড়িয়ে হেসেছিল সাফল্যের আনন্দে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তুমি দেখলে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি মূর্ত্তি তার লম্বা হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ভীষণ ভয় পেয়ে তুমি চীৎকার করে জেগে উঠলে। এই দুঃখ, হাসি, ভয় প্রভৃতিকে আমরা আবেগ বলে থাকি।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী আবেগের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কুল্পের (Kulpe) মতে অনুভূতি ও দেহ যন্ত্রের পরিবর্ত্তনের সংমিশ্রণে আবেগের সৃষ্টি। ওয়ার্ডের (ward) মতে আবেগ একটি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার, জ্ঞানাত্মক, ভাবাত্মক ও আনন্দ বেদনার অনুভুতিই (Cognition, Conation and Pleasure Pain) আবেগ। সালির (Sully) মতে আবেগ হল কতকগুলি সংবেদন সৃষ্টি কারী বস্তু দ্বারা উদ্দীপ্ত অনুভূতি। উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আবেগ হল একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। তাই আবেগের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করে আমরা নিম্নে আবেগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

আবেগের স্বরূপ (Nature of emotion)

(১) কোন বস্তু বা ঘটনা ভাল লাগা বা ভাল না লাগা থেকে আবেগের সৃষ্টি। উত্তেজকের উপস্থিতিতে আবেগ অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়।

(২) আবেগের সময় সর্ব্বাঙ্গীন দৈহিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, অতিরিক্ত গ্রন্থিরস নিঃসরণ, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি একে দৈহিক অনুরণন (Organic resonance) বলে।

(৩) আবেগের সময় চেতনা একটিমাত্র বস্তুতে নিবদ্ধ থাকায় অমাদের পারিপার্শ্বিক জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়। একে বলা হয় আবেগের পৃথকীকরণ (emotional dissociation).

(৪) আবেগের সময় ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় (inactive) থাকে অর্থাৎ তার দৈহিক কার্য্যকলাপ স্বনিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে না। আবেগই হল তার কার্য্য কলাপের নিয়ন্ত্রা।

(৫) উত্তেজক ছাড়া কোন আবেগ উদ্ভূত হয় না। কিন্তু কোন বিশেষ আবেগের কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। যেমন ধর, ভয়। নির্জ্জন রাত্রে একা থাকতে ভয় হয়; কঠিন অসুখের সময় ভয় হয় বাঁচব, না মারা যাব, তেতলার ছাদের আলিসায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালেও ভয় হয়, যদি পড়ে যাই।

(৬) আবেগের সঙ্গে একটা কর্ম্মতৎপরতার দৈহিক প্রকাশ দেখা যায়।

রাগ হলে মারবার জন্য হাত ওঠাই, ভয় পেলে দৌড়ে পালাই, দুঃখহলে কাঁদি ইত্যাদি। আবেগের সঙ্গে এই যে কর্মতৎপরতা জড়িত আছে মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগাল(Mcdaugall) তাকে বলেছেন সহজাত সংস্কার (instinct)। তাঁর মতে সহজাত সংস্কার থেকেই আবেগের উৎপত্তি।

(৭) আবেগ অনেক ক্ষেত্রে বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। সকালে মায়ের কাছে বকুনী খেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল আর সারাদিনই মনটা খারাপ হয়ে রইল। রাগ হয়েছে বন্ধুর উপর সেই জন্য ঝগড়া হয়ে গেল। কিন্তু ঝগড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাগ প্রশমিত হল না।

(৮) বিভিন্ন ব্যক্তিতে একই আবেগের বিভিন্ন অভিব্যক্তি হতে পারে। শিশুকে মারলে সে রাগে চীৎকার করে কাঁদে। কিন্তু একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক প্রহৃত হলে তিনি রেগে যে মেরেছে তার দিকে কটমট করে তাকাতে পারেন।

(৯) শারিরীক অবস্থা অনেক সময় আবেগকে প্রভাবান্বিত করে। অনেক দিন ধরে অসুখে ভুগলে বা শরীর দুর্ব্বল থাকলে সামান্য কথাতেই অনেকে রেগে যায়, কেউ কাঁদে। শরীর সুস্থ থাকলে সে ওই কথাতে হয়ত রাগ করত না।

(১০) আবেগ অন্ধ। আবেগে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং অনেক সময় এমন কাজ করে বসে যার জন্য পরে অনুতাপ হয়।

মৌলিক আবেগ (Basic emotion)

বয়স্কদের আবেগ জটিল এবং আবেগের প্রকাশও বিচিত্র। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে শিশুর পরিচয় বেশী দিনের নয়; সে এখনও মানুষের সমাজের রীতিনীতি সম্যকরূপে আয়ত্ত করতে পারেনি। তাই তার আবেগের প্রকাশ সরল। শিশুর আবেগকে আমরা মৌলিক আবেগ বলতে পারি।

মৌলিক আবেগের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর বিভিন্ন মত। ওয়াটসনের (Watson) মতে আমাদের মৌলিক আবেগ তিনটি—(১) ভয়, (২) রাগ ও (৩) ভাল লাগা। হঠাৎ চীৎকার বা উচ্চ শব্দ শুনলে শিশু ভয় পায়, অবলম্বন শূন্য হলে শিশু ভয় পায়, আবার অন্ধকারেও শিশু ভয় পায়।

শিশুর হাত থেকে খেলনাটি কেড়ে নিলে শিশু ক্রুদ্ধ হয়, শয্যাটি আরামদায়ক না হলে ক্রুদ্ধ হয়, আবার ক্ষুধার সময় খাবার না পেলেও ক্রুদ্ধ হয়। আদর করলে শিশু হাসে, মার কোলটি শিশু পছন্দ করে তাই মাকেও শিশুর ভাল লাগে। শিশুকে ভীত ক্রুদ্ধ বা আনন্দিত হতে কেউ শেখায়নি। আপনা থেকে তার মনে এই আবেগের সঞ্চার হয়ে থাকে। শ্যারমান (Sherman) মৌলিক আবেগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন আবেগ জন্মগত নয়, জন্মের পর শিশু বয়স্কদের দেখে আবেগের বশবর্তী হয়। ওয়াটসন শিশুর হাত-পা-ছোঁড়া, কান্না প্রভৃতি লক্ষ্য করে আবেগের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। শ্যারমান বলেন শিশুর কান্না দেখে কিছুই বোঝা যায় না। ক্ষুধার সময় শিশু কাঁদে, পেট কামড়ালেও কাঁদে, আবার রাগ হলেও কাঁদে। তার মতে জন্মের পর শিশু তার পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে। স্ট্যাগনার (Stagnar) ও হারলোর (Harlow) মতে মৌলিক আবেগ চারটি—(১) আনন্দ (Pleasure), বেদনা (Pain), প্রফুল্লতা (Elation) ও বিমর্ষতা (Depression)।

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেন যে প্রত্যেক সহজাত সংস্কারের সঙ্গে একটি করে আবেগ জড়িত আছে। তাঁর মতে আবেগ সংস্কার থেকে উদ্ভূত। তিনি চৌদ্দটি প্রধান সংস্কারের কথা বলেছেন এবং ঐ চৌদ্দ সংস্কারের সঙ্গে জড়িত চৌদ্দটি আবেগের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যে সব সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মায় তাই হল সংস্কার। প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে মানুষের একটি করে অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। এগুলিকে তিনি বলেছেন মৌলিক আবেগ। বহু সংস্কার যখন একই সঙ্গে ক্রিয়া করে তখন যে মিশ্র আবেগের সৃষ্টি হয় তাকে তিনি বলেছেন মিশ্র-আবেগ (Conplex emotion)। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল যে সতেরটি আবেগের কথা বলেছেন তা নীচে দেওয়া হল।

সহজাত সংস্কার (Instinct)	**মৌলিক আবেগ** (Bssic emotion)
(১) পলায়ন (Escape)	ভয় (Eear)
(২) যুযুৎসা (Combat)	ক্রোধ (Anger)
(৩) ঘৃণা (Repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
(৪) বাৎসল্য (Parental)	স্নেহ (Tender emotion)

	সহজাত সংস্কার (Instinct)	মৌলিক আবেগ (Basic emotion)
(৫)	অনুনয় (Appeal)	দুঃখ (Distress)
(৬)	যৌন প্রবৃত্তি (Sexual instinct)	কাম (Lust)
(৭)	কৌতূহল (Curiosity)	বিস্ময় (Wonder)
(৮)	বশ্যতা (Sub mission)	হীনমন্যতা (Negative Self feeling)
(৯)	আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self asser tion)	আত্মগৌরব বোধ (Positive Self feeling)
(১০)	খাদ্যান্বেষণ (Food Seeking)	ক্ষুধা (Gust)
(১১)	যৌথপ্রবৃত্তি (Gregarious ness)	একাকিত্ব বোধ (Feeling of lone liness)
(১২)	সঞ্চয় (Acquisition)	স্বাধিকার বোধ (Feeling of Ownership)
(১৩)	নির্মাণ (Construction)	সৃজনী স্পৃহা (Creativeness)
(১৪)	হাস্য (Laughter)	আমোদ (Amusement)
(১৫)	বিশ্রাম (Rest)	ক্লান্তি (Fatigue)
(১৬)	আরাম (Base)	দুঃখ বিমুখতা (Aversion to pain)
(১৭)	কৌতুহল প্রবণতা (Instinct of Exploration)	ভ্রমণস্পৃহা (Desire for travel)

বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানীরা ম্যাকডুগালের মৌলিক আবেগের এই তালিকাটি গ্রহণ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে যে সব আবেগগুলিই জন্মের পরই প্রকাশ পায় না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে।

আবেগের শ্রেণী বিভাগ (Classification of emotion)

আবেগের শ্রেণী বিভাগ নানাভাবে করা যায় :—প্রথমত আবেগ দুই প্রকার—সাধারণ (Common) ও বিশেষ (Special)।

আনন্দ ও দুখঃ সাধারণ আবেগের অন্তভুক্ত, অন্যান্য আবেগ যেমন ভালবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বিশেষ আবেগ।

অন্যভাবে শ্রেণী বিভাগ করলেও আবেগ দুইপ্রকার :—আত্মকেন্দ্রিক

(Egoistic) ও পরকেন্দ্রিক (Altruistic)। ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক প্রেম হল পরকেন্দ্রিক আবেগ।

কয়েকটি প্রধান আবেগ সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

(১) ভয় (Fear):—ভয়কে জরুরী অবস্থার (emergency) আবেগ বলা হয়ে থাকে। যখন আমরা কোন বিপদের সম্মুখীন হই এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তখন আমরা ভয় পাই। কোন বেদনাদায়ক ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় ও আমরা ভয় পাই। যেমন যে ব্যক্তি একবার ষাঁড়ের গুঁতো খেয়েছে, ষাঁড় দেখলেই সে ভয় পাবে।

ঘটনার আকস্মিকতা ও তীব্রতাও আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। আকস্মিকতা ও তীব্রতার সম্মুখে নিজেদের অসহায় ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তাই আমরা ভয় পাই।

মনোবিজ্ঞানী জারসিল্ড ছোট ছেলেদের একটি ভয়ের তালিকা প্রস্তুত করেছেন যথা, দৈহিক বেদনা বা দুর্ঘটনাজনিত ব্যথা, অন্ধকার, একাকীত্ব, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু, ভূত, অপরিচিত গৃহ, বকুনী, শাস্তি, লোকের হাসির কারণ হওয়া ইত্যাদি। পিতামাতার মনে কোন ভয় থাকলে অনেক সময় তা শিশুর মনেও সঞ্চারিত হয়।

বিপদের সম্মুখীন হলে আমরা ভয়ে কাঁপি। ভয় একটি বেদনায়ক আবেগ। কিন্তু এই আবেগ আমাদের বিপদ হতে বাঁচতে সাহায্য করে। প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত সংস্কার হল বিপদ দেখলেই পলায়ন করা এবং এই পলায়ন প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আছে যে আবেগ তার নাম হল ভয়।

ভয়ের সঙ্গে কতকগুলি শারিরীক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। যেমন, হৃৎস্পন্দন বাড়ে, গলা শুকিয়ে যায়, চোখ বিস্ফারিত হয় ঘন ঘন প্রস্রাব হয় ইত্যাদি।

কল্পিত ভয় বা কল্পিত বিপদকে আমরা পছন্দ করি, কারণ ভয়ের থেকে পলায়ন করার মধ্যে বা ভয়কে জয় করার মধ্যে আনন্দ আছে। এই কারণেই ভীষণতার এত আকর্ষণ; রোমাঞ্চ কাহিনী ও তাই বুঝি এত ভাল লাগে।

ভয়ের যখন কোন বাহ্যিক হেতু থাকে না তখন তাকে বলে আতঙ্ক (Phobia)। যেমন বদ্ধস্থানের ভয় (Claustro phobia), মুক্তস্থানের ভয়

(agoraphobia), উচ্চস্থানের ভয় (acrophobia) ভিড়ের ভয় Ochlophobia) ইত্যাদি।

(২) রাগ (Anger) :—কোন ইচ্ছাপূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে আমাদের রাগ হয় বিশেষতঃ এই ইচ্ছাপূরণে যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তু বাধাস্বরূপ হয় এবং যখন আমরা জানি যে ঐ বাধাকে অতিক্রম করবার শক্তি আমাদের আছে। যে শ্রমিক তার যন্ত্রের উপর রাগ করে সে উচ্চদরের শ্রমিক নয় (A bad workman quarrels with his tools)। কিন্তু কখন কখন বারবার ব্যর্থতার সম্মখীন হয়ে নিজের ওপরও আমরা রাগ করতে পারি। ভয়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় রাগ আরও শক্তিশালী আবেগ এবং এর বর্হিপ্রকাশও প্রচণ্ড।

বিভিন্ন ব্যক্তির রাগের প্রকাশও বিভিন্ন। ছোট ছেলের রাগ হলে হাত পা ছোঁড়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে, জিনিষ ছোঁড়াছুঁড়ি করে, মার-ধর করে, ইত্যাদি। অশিক্ষিত লোকে রাগের সময় গালি বর্ষণ করে, ঝগড়া করে। মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি রাগ হলে বাঁকা কথায় জবাব দেয়, ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে কথা বলে, অনেক সময় ঘরছেড়ে চলে যায়।

অতি শৈশবেই শিশুর রাগের প্রকাশ দেখা যায় শিশু যখন আপন মনে খেলে, হাত-পা ছোঁড়ে তখন কেউ তাকে বাধা দিলে সে রাগ করে কাঁদে। গুড এনাফ্ (Good Enough) শিশুর রাগের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন যেমন, জোর করে শিশুকে স্নান করান, জোর করে খাওয়ান ইত্যাদি। অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলার সময় খেলনা নিয়ে মতবিরোধ হলেও সে রাগ করে, ঝগড়া করে। শিশু যত বড় হয় তার রাগের প্রকাশ ভঙ্গীও ততই পরিবর্ত্তিত হয়। সে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। ইচ্ছাপূরনে বাধা পেলেও সহ্য করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে দেখতে পায় পৃথিবীতে কিছু অপূর্ণ বাসনা থাকবেই। তাই তখন আর সে আগের মত রাগ করে না।

ক্ষুধার্ত্ত বা ক্লান্ত অবস্থায় একটু কিছু ত্রুটি দেখলেই আমরা রেগে উঠি। আবার আহারের বা বিশ্রামের পর প্রসন্ন মনের কাছে সে ত্রুটি সামান্যই মনে হয়। এই জন্যই বোধ হয় গৃহিণীরা স্বামীকে খেতে দিয়ে হাওয়া করতে করতে সুমিষ্ট স্বরে চাওয়ার ভূমিকাটি করে রাখেন।

ভয়ের ও রাগের তুলনা করলে দেখা যায় ভয়ের সময় ভীত ব্যক্তি পলায়ন করে, কিন্তু রাগের সময়ে আক্রমন করবার জন্য অগ্রসর হয়। ভয়ের সময় ব্যক্তি নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে কিন্তু রাগের সময় নিজেকে খুব শক্তিশালী মনে হয়। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় ভয়ের সৃষ্টি হয় কিন্তু রাগ হয় পূর্ব্বের রূঢ় ব্যবহার ইত্যাদির জন্য।

রাগের সময় কতকগুলি দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। চোখ মুখ লাল হয়, রক্ত চাপ বৃদ্ধি হয়, ফুসফুসে অতিরিক্ত রক্ত প্রবেশ করে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষিত হয়, গলার স্বর রুক্ষ ও কর্কশ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, ইত্যাদি।

(৩) **প্রেম** (Love) :—প্রেম পরকেন্দ্রিক। ইহা রাগ বা ভয়ের মত আকস্মিক নয়। প্রেমের সঙ্গে কাম জড়িত। যৌন আবেদন ও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে বৃহত্তর দৃষ্টিতে এই প্রেমকেই শুধু প্রেম বলে না। মাতাপিতার প্রতি ভালবাসা, ভাইবোন ও বন্ধুর প্রতি ভালবাসাকেও আমরা প্রেম বলতে পারি।

প্রেম অপরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয় এবং প্রেমিক ব্যক্তি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি না তাকিয়ে প্রেমাস্পদকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চায়। প্রেম তীব্র হলে প্রেমাস্পদের জন্য ব্যক্তিবিশেষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে দেখা গেছে।

জন্মের পর শিশু প্রথম তার মাকে ভালবাসতে শেখে। মায়ের কোলটিতে আছে তার জন্য অপার শান্তি ও বিশ্বের নিরাপত্তা। ফ্রয়েড (Freud) বলেন যে-কোন ভালবাসাই দৈহিক কামনা সঞ্জাত। শিশু প্রথমে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভালবাসে। তারপর তার মায়ের প্রতি ভালবাসা জন্মায়। ধীরে ধীরে তার ভালবাসার পরিধি বৃদ্ধি পায়, বন্ধু আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি অনেককেই সে ভালবাসে। শিশুর কাছে যৌন চেতনা স্পষ্ট নয়, কিন্তু ফ্রয়েডের মতে ভালবাসার মূলে আছে যৌন কামনা। সকল মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বলেন প্রেমের মধ্যে আছে সমাজে বাস করার তাগিদ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করে সে তার নিজের প্রয়োজনে, তার একাকীত্ব দূরীকরণের জন্য সে মানুষকে ভালবাসে।

(৪) **ঘৃণা** (Hatred) :—ঘৃণা আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি, ইহা প্রেমের বিপরীত। ম্যাকডুগাল বলেছেন ঘৃণা হল একটি জটিল আবেগ। এর মধ্যে রাগ, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি আবেগ মিশে আছে। যাকে আমরা ঘৃণা করি, তাকে দেখলে বিরক্তি বোধ করি, তার উপস্থিতিতে রাগ ও হয়।

(৫) **আনন্দ** (Amusement) :—ভয় ও রাগের থেকে এই আবেগ সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষ হাসে কেন এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেন অনেকে। শিশুকে সুড়সুড়ি দিলে হাসে, বয়স্কেরা বিসদৃশ কিছু দেখলে হাসে এবং অদ্ভুত গল্প শুনে মজা পায়।

আবেগে দেহ যন্ত্রের পরিবর্ত্তন (Organic changes in emotion)

আবেগের সময় যে দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় একথা সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। আবেগে দেহযন্ত্রের পরিবর্ত্তন সম্পর্কে এখন আমরা নিম্নে বিশদ্ আলোচনা করব।

(১) **হৃদ্স্পন্দনের পরিবর্ত্তনঃ**—আবেগের সময় হৃদপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হয়। সাধারণ অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তির হৃদপিণ্ড প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৮০ বার স্পন্দিত হয় কিন্তু আবেগের সময় এই স্পন্দন সংখ্যা ১০৪ পর্যন্ত হতে পারে। কার্ডিও ট্যাকোমিটার (Cadio tachometer) যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা মাপা যায়।

(২) **নাড়ীর গতি বেগের পরিবর্ত্তন** ঃ—নাড়ীর গতি হৃদস্পন্দনের উপর নির্ভরশীল। তাই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হলে নাড়ীর গতিও দ্রুত হবে। নাড়ীর গতিবেগ স্ফিগ্মো গ্রাফ (Sphygmograph) যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়

(৩) **রক্ত চাপের পরিবর্ত্তন** ঃ—আবেগের সময় হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ধমনীর ভিতরে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

(৪) **মস্তিষ্ক তরঙ্গের পরিবর্ত্তন** ঃ—আবেগের সময় মস্তিষ্ক তরঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরির্ত্তন ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ (Electro-encephalograph) যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়।

(৬) **দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তপ্রবাহ ও পরিমাণের পরিবর্ত্তন** ঃ—শান্ত অবস্থায় দেহের নানা যন্ত্রে রক্তপ্রবাহ যেরূপ থাকে আবেগের সময় উত্তেজিত

হলে তার পরিবর্ত্তন ঘটে। একটি লোক যখন শান্তভাবে বসে থাকে তখন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রক্ত তার মস্তিষ্কের রক্তবহা নালীতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু যখন সেই লোকটি রেগে যায় তখন মস্তিষ্কে রক্তস্রোত বৃদ্ধি পায়। রক্তস্রোত বৃদ্ধির ফলে দেহে উত্তাপের সঞ্চার হয়। মাথা, মুখ, হাতের-তালু ইত্যাদি গরম বোধ হয়। প্লিথিস্ মোগ্রাফ (Plethys mograph) যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানের রক্তের পরিমাণ মাপা যায়।

(৬) **শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন** :—আবেগে শ্বাস গ্রহণের সময় ও শ্বাস-ত্যাগের সময়ের অনুপাতের পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ সময়ে এই অনুপাতের গড় প্রায় ·৪২ ; কিন্তু আবেগের সময় এই অনুপাত ·৭৫ পর্যন্ত হতে পারে।

(৭) **দেহের কোন কোন অংশের বিদ্যুৎশক্তি পরিবহনের ক্ষমতার পরিবর্ত্তন** :—কপালে দুটি ইলেকট্রোড লাগিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ শক্তির মাপ করা যায়। আবেগের সময় এই বিদ্যুতপ্রবাহ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে। আমাদের দেহের ত্বকের বিদ্যুত পরিবহন ক্ষমতাও আবেগের সময় হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

(৮) **লালা গ্রন্থিরস নিঃসরণের হ্রাস** :—আবেগের সময় লালা নিঃসরণের হ্রাস হওয়ায় আমাদের গলা শুকিয়ে যায়।

যে কোন আবেগেই যে উল্লিখিত সমস্ত পরিবর্ত্তনই উপস্থিত থাকবে এমন নয়। কিন্তু কিছু কিছু পরিবর্ত্তন যে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপরে যে সকল পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হল, স্বয়ং ক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী প্রত্যক্ষভাবে (Directly) তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্নায়ুমণ্ডলীর বিভিন্ন বিভাগ দেহ যন্ত্রের কোন কোন অংশের কার্য্য আবেগের সময় নিয়ন্ত্রণ করে তা নিম্নে দেওয়া হল।

স্বয়ং ক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী (Autonomic Nervous System) :—স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী হৃদপিণ্ডে, ধমনীতে, ফুসফুসে, পাচকযন্ত্রে, অন্ত্রে এমন কি শরীরে গ্রন্থিগুলিতেও ছড়িয়ে আছে। চুলের গোড়ায় পেশী, চোখের কনীনিকাতেও এই স্নায়ু আছে। এই সকল স্নায়ু গঠিত হয়েছে অতিরিক্ত সরু (Slender) স্নায়ুতন্তু দিয়ে ; এগুলি ব্রেনষ্টেম ও সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুকোষ থেকে তৈরী। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর তিনটি ভাগ—

(ক) উচ্চ বিভাগ (Upper division) :—এগুলো ব্রেনষ্টেম থেকে বেরিয়েছে। এই স্নায়ুগুলি হৃদস্পন্দন কমায় কিন্তু পাকযন্ত্রের গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে ফলে পাচকরস নিঃসৃত হয় এবং হজমের সাহায্য করে।

(খ) মধ্য বিভাগ (Middle division) :—মধ্যভাগে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ আছে। বুকের কাছাকাছি মেরুদণ্ড থেকে এই স্নায়ু বেরিয়েছে। এই স্নায়ু উত্তেজিত হলে হৃদ্‌স্পন্দন বাড়ে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়, হজমের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং আবেগের লক্ষনগুলি প্রকাশ পায়।

(গ) নিম্ন বিভাগ (Lower division) :—নিম্নভাগের স্নায়ুমণ্ডলী সুষুম্নাণ্ডের নিম্নভাগ থেকে বেরিয়েছে। এগুলি আমাদের যৌনগ্রন্থি, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতিকে উত্তেজিত করে।

উল্লিখিত স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী আবার অন্তর্মস্তিষ্কে অবস্থিত হাই-পোথ্যালামাস কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে এবং কর্টেক্স কর্তৃক পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আবেগে শরীরের অভ্যন্তরে যে সব যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হয় তার সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। কিন্তু আবেগে মানুষের বাহ্যিক আচরণেরও (Expressive behaviour) ও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। সেগুলি নিয়ে দেওয়া হল।

আবেগে বাহ্যিক আচরণের পরিবর্ত্তন
(Change in expressive behaviour)

নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও মুখের ভাব দেখে মনের কথা বুঝতে পারে। পরীক্ষার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তোমার খুব আনন্দ হয়েছে, এ-আনন্দ তুমি সকলের কাছে প্রকাশ করতে না চাইলেও তোমার বাহ্যিক আচরণ, মুখের ভাব প্রভৃতি প্রকাশ করে দেবে যে তোমার আনন্দ হয়েছে। তোমার এখনকার আচরণ, বাহ্যিকভাব নিশ্চয়ই সাধারণ ভাব, সাধারণ আচরণ থেকে পৃথক। তাই তোমার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এই যে সাধারণ আচরণ থেকে পৃথক আচরণ আবেগের সময় আমরা করি মনোবিজ্ঞানী এর নাম দিয়েছেন আবেগ প্রকাশক আচরণ (Expressive behaviour of emotion), সাধারণতঃ যে সব পরিবর্ত্তন দেখা যায় তা নিয়ে বর্ণিত হল।

(১) **মুখভাবের পরিবর্ত্তন** :—যে কোন আবেগেই মুখভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। মুখ ভার দেখলে বোঝা যায় রাগ হয়েছে। মুখের বিমর্ষভাব বুঝিয়ে দেয় দুঃখ হয়েছে। দুর্গন্ধ পেলে নাক কুঁচকে ফেলি এবং সুগন্ধ পেলে বুকভরে শ্বাস নিই এবং মুখের ভাব হয় শান্ত।

(১) **কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন** :—আবেগের সময় স্বরের পরিবর্ত্তন ও ঘটে। রাগের সময় কণ্ঠস্বর রুক্ষ ও কর্কশ হয়ে ওঠে, খুব ভয় পেলে গলা দিয়ে শব্দ বেরোতেই চায় না ; আদর করার সময় কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে ওঠে।

(৩) **চোখের ভাবের পরিবর্ত্তন** :—চোখের ভাষা কি কথা কয় না? নিশ্চয়ই কয়। আমাদের চোখে দেখা যায় প্রাণশক্তির বিচ্ছুরণ। তাই আনন্দে আমাদের চোখ হেসে ওঠে, দুঃখে চোখের জ্যোতি হয় স্তিমিত।

(৪) **অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া** :—আবেগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়াকে ও নিয়ন্ত্রণ করে। রাগের সময় হাত-পা ছুঁড়ি, ভয়ের সময় দৌড়ে পালাই।

জেমস্ ল্যাঙ্গ তত্ত্ব

(James-Lange theory of emotion)

প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস্ ১৮৮৪ সালে এবং ড্যানিস্ শরীরতত্ত্ববিদ ল্যাঙ্গ ১৯৮৫ সনে পৃথকভাবে আবেগ সম্বন্ধে একটি নূতন তত্ত্বের কথা বলেন। এইটি জেমস্-ল্যাঙ্গ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

তাঁরা বল্লেন যে আবেগের সময় আমরা ভয় পাই বলে কাঁপি না, কাঁপি বলেই ভয় পাই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাঘের গর্জ্জনে কোন্ প্রাণী না ভয়ে পলায়নে তৎপর হবে? এরা বল্লেন এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা পলায়ন করি বলেই ভয় পাই ; যে মুহূর্ত্তে বাঘের গর্জ্জন শুনলাম সেই মুহূর্ত্তে পলায়নে তৎপর হয়ে উঠলাম আর তাই ভয় পেলাম। জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ অনুযায়ী আবেগের সংজ্ঞা হল উত্তেজক সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্র আমাদের মধ্যে দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং এই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি হল আবেগ। জেমস্-ল্যাঙ্গ তত্ত্ব মতে আমরা প্রথমে কাঁদি, তারপর দুঃখ অনুভব করি ; প্রথমে হাসি তারপর আনন্দ পাই। প্রথমে কাউকে আঘাত করি তারপর রাগ হয়।

জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। তাঁরা তাঁদের

মতবাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁদের যুক্তি নীচে দেওয়া হল।

(১) দৈহিক প্রকাশ ছাড়া কোন আবেগই সম্ভব হয় না।

(২) উন্মাদদের দেখিয়ে জেমস বলেছেন যে ওরা অকারণে কাঁদে, হাসে। কোন উত্তেজক তাদের আবেগ সৃষ্টি করে না। উন্মাদ উত্তেজকের অনুপস্থিতিতেই হাসে এবং কাঁদে।

(৩) তাঁরা বললেন যদি কোন প্রকারে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলি সংঘটিত করান যায়, তাহলেই আবেগ উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে যদি কারোর বাহ্যিক প্রকাশ হাসির সময়ের বাহ্যিক প্রকাশের অনুরূপ হয় তাহলে তার আবেগ জন্মাবে।

(৪) জেমসের মতে কোন উত্তেজকের সম্মুখীন হওয়া মাত্র তার প্রতিক্রিয়া (Reflex action) হয়। তিনি বললেন এই প্রতিক্রিয়াই আবেগ।

(৫) জেমস্ যান্ত্রিক সংবেদন ও আবেগকে সমার্থক বলেছেন।

(৬) আবেগের দৈহিক প্রকাশ বন্ধ হলেই আবেগ চলে যায়।

(৭) মাদক দ্রব্য আমাদের মধ্যে আবেগের সঞ্চার করে। মাদক দ্রব্যে দেহ উদ্দীপ্ত হয় অতএব আবেগের কারণ হল দৈহিক।

(৮) দৈহিক অসুস্থতার সময় আমাদের আবেগ উপস্থিত হয়। জ্বরের ঘোরে আমরা কত কথা বলে যাই যা অন্য সময় আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

জেমস-ল্যাঙ্গ তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাঃ—জেমস-ল্যাঙ্গ তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা হয়ে গেছে এবং এ তত্ত্বকে মনোবিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেন নি। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তিগুলি নীচে দেওয়া হল—

(১) জেমসের মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ হয় না আর একথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলে একথা কখনও বলতে পারি না যে দৈহিক প্রকাশই আবেগ।

(২) উন্মাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বাভাবিক মনের মানুষের সঙ্গে তুলনা করা সমীচীন নয়। স্বাভাবিক মানুষ যেখানে উত্তেজক নেই বলছে, উন্মাদব্যক্তির কাছে সেখানে কোন উত্তেজক থাকতেও পারে।

(৩) কৃত্রিম উপায়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেই আবেগ হয় না। আমরা জানি ব্যক্তি আবেগগ্রস্ত হলে সহজে তার মন থেকে সেই আবেগ অন্তর্হিত হয় না। অভিনেতা যখন রঙ্গমঞ্চে শোক প্রকাশ করে কাঁদে তখন তাকে আমরা আবেগ বলব না কারণ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসতে বা আনন্দ করতে দেখা যায়।

(৪) আবেগকে আমরা উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া (Reflex aotion) বলতে পারি না কারণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হয় না। হাতে গরম লাগলে আমরা সকলেই হাত সরিয়ে নেই। কিন্তু একই আবেগে বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন দৈহিক প্রকাশ দেখা দিতে পারে। একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবেগের সৃষ্টি করতে পারে।

(৫) যান্ত্রিক সংবেদন এবং আবেগ এক নয়। আবেগের সময় দৈহিক প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিলে আবেগ অন্তর্হিত হয়। রাগের সময় আয়নায় নিজের মুখ দেখলে তৎক্ষণাৎ রাগ চলে যায়। কিন্তু যান্ত্রিক সংবেদনের ক্ষেত্রে সংবেদনে মনোযোগ দিলেও সংবেদন অন্তর্হিত হয় না, যেমন ক্ষুধার সময় ক্ষুধাতে যতই মনোযোগ দিই না কেন খাদ্য ছাড়া ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

এতক্ষণ আমরা যুক্তির দ্বারা জেমস-ল্যাঙ্গ তত্ত্বের সমালোচনা করছিলাম। কিন্তু এ মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো আক্রমণ এলো শেরিংটনের (Sherrington) কাছ থেকে। তিনি একটি কুকুরের শরীরের আভ্যন্তরীণ কয়েকটি যন্ত্রের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির কোনরূপ দৈহিক উত্তেজনা জন্মান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুকুরটির মধ্যে রাগ, বিরক্তি ভয় ইত্যাদি দেখা গেল।

ক্যানন (Cannon) ও লুই ব্রিটন (Louis Briton) একটি বিড়ালের উপর অনুরূপ পরীক্ষা করেন। তাঁরা বিড়ালের সিম-প্যাথেটিক নার্ভ অস্ত্রোপচার করে কেটে দেন। এর ফলে অ্যাড্রিনালিন রস নিঃসরণ, পাচনক্রিয়া প্রভৃতির ব্যাঘাত হল। তথাপি দেখা গেল বিড়ালটির মধ্যে রাগের লক্ষণ পূর্ব্বের মতই প্রকাশ পাচ্ছে।

ক্যানন মানুষের শরীরে অ্যাড্রিনালিন ইনজেকসন দিয়ে দেখালেন যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, নাড়ীর গতি দ্রুত হচ্ছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্রুততর হচ্ছে, এক কথায় রাগের সময় যে সকল শারীরিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তার সব-

গুলিই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির রাগ হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় তার রাগ হয়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক প্রকাশ সৃষ্টি করলেই আবেগ হয় না।

ক্যাননএবং ফিলিপ বার্ড নানাবিধ পরীক্ষার পর একটি মতবাদ প্রচার করেন। তাঁরা বলেন যে আবেগের অধিষ্ঠান হল থ্যালামাসে॥ তাঁদের এই মতবাদকে থ্যালামাস সম্বন্ধীয় মতবাদ (Thalamic Theory of emotion) বলে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে জেমস ল্যাঙ্গ তত্ত্বের কোন ভিত্তিই নেই। আবেগে দৈহিক প্রকাশ থাকে সন্দেহ নেই কিন্তু দৈহিক প্রকাশের জন্য আবেগ উপস্থিত হয় একথা বলা ভুল।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is feeling ? What are its characteristics ?

অনুভূতি কি ? অনুভূতির বৈশিষ্টগুলির বিবরণ দাও।

2. What are the causes of fear ? Indicate clearly the organic changes that take place in the case of fear.

ভয়ের কারণ ? ভয়ের সময়ের দৈহিক পরিবর্ত্তনগুলির নির্দেশ কর।

3. Compare emotion of fear with that of anger giving concrete examples.

উদাহরনের সাহায্যে ভয় ও রাগের তুলনা কর।

4. Describe the different organic changes of emotions.

আবেগের সময় যে দৈহিক পরিবর্ত্তন হয় তাহার বর্ণনা দাও।

5. Describe and criticise James Lang theory of emotions.

জেমস ল্যাঙ্গ মতবাদের বিবরণ দাও ও সমালোচনা কর।

6. What are basic emotions ? How many basic emotions are there ?

মৌলিক আবেগ কি ? মৌলিক আবেগ সংখ্যায় কতগুলি ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ (Perception)

প্রত্যক্ষণ বহির্জগতের জ্ঞানের প্রবেশদ্বার (Perception is the gateway to knowledge of the outer world)

প্রত্যক্ষণের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হবে সংবেদনের কথা। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, ধ্বনি প্রভৃতি প্রাথমিক অনুভূতি লাভের নামই সংবেদন। এই সংবেদন হল প্রত্যক্ষণের উৎস। চারিদিকে গাছপালা বেষ্টিত একটি গ্রামের মধ্যে হেঁটে চলেছি। কোন অদৃশ্য গাছের ডাল থেকে কানে কুহর তুলল একটি কুহু ধ্বনি ডাক শুনেই বুঝলাম ওটা কোকিল। আবার কোথা থেকে দুটো অবুঝ কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক ভেসে আসছে, কুকুরকে দেখা যাচ্ছে না কোকিলকেও দেখছি না। কিন্তু দুটো ডাকের বিভিন্নতা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি একটা ডাক কোকিলের আর একটা ডাক কুকুরের। সংবেদন যখন অর্থ সমন্বিত হয়ে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় তখনই হয় প্রত্যক্ষণ। কুহু ডাকটা প্রথমে শ্রুতিতে আঘাত করে একটি মাত্র ধ্বনির সংবেদন তুলেছিল। আমাদের অতীতে লব্ধ জ্ঞান থেকে যে মুহূর্ত্তে বোঝা গেল ওটা কোকিল তখনই হল প্রত্যক্ষণ।

প্রত্যক্ষণের সময় অনেকগুলি ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হতে পারে। মনে কর কেউ তোমার সামনে রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে ধরল, প্রথমেই হল দর্শন সংবেদন তুমি বুঝলে ওটা ফুল, গোলাপ নয়, ও ফুলটা রজনীগন্ধা। সঙ্গে সঙ্গে ওটা আস্বাদন না করে নাকের কাছে ধরে ঘ্রান নিলে। ফুলটা যে খেতে হয় না ঘ্রান নিতে হয়, এ বোধ ফুলটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হয়েছিল। তখনই তুমি বুঝলে এটা উপহার। বুঝলে এর মধ্যে প্রিয়জনের স্নেহ মিশে আছে। ফুলটি যত্ন করে গ্রহণ করলে, মন আনন্দে ভরে গেল। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যক্ষণ হল জটিল মানসিক ক্রিয়া। পঞ্চইন্দ্রিয় এবং সংগ্রাহক যন্ত্রকে জ্ঞানের প্রবেশ দ্বার বলে।

প্রত্যক্ষণ কি? (What is perception? অর্থপূর্ণ সংবেদনকে প্রত্যক্ষণ বলা হয় (sensation plus mening)। সংবেদনকে ব্যাখ্যা করতে পারলে প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা হবে। কোকিলের ডাকটি যখন শুনলাম, তখন হ'ল সংবেদন, যখন বুঝলাম ওটি কোকিলের ডাক তখন হ'ল প্রত্যক্ষণ। বস্তুর গুণের ধারণা হয় সংবেদনের মাধ্যমে। বস্তুর বিশেষ গুণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের কাছে ধরা দেয় এবং অর্থযুক্ত হয়ে বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষণকে এককভাবে দেখেছেন। তোমার কাছে কেউ একটি কমলালেবু দিল, তুমি দেখে বুঝলে ওটা খোসা ছাড়িয়ে খেতে হয়, ওর মধ্যে মিষ্টি রস আছে, ওটা পুষ্টিকর, দার্জিলিং, আসামে এগুলো হয়, শীতকালে জন্মায় ইত্যাদি কমলালেবু সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা তোমার আছে। আমরা কি কমলালেবু দেখলে এত কথা চিন্তা করি? কখনই করি না। কমলালেবুটি ছাড়িয়ে মুখে ফেলে দিই মাত্র। সমগ্রতা-বাদীদের মতে প্রত্যক্ষণ কতগুলি বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমষ্টি নয়। প্রত্যক্ষণ হ'ল একক জ্ঞান।

প্রত্যক্ষণকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। (Factors of perception)

(১) পৃথকীকরণ (Discrimination)—পাখীর গানটি যখন কানে এল তখন সেটি অন্যান্য সংবেদন থেকে পৃথক হয়ে গেল। ওটা আলো নয় শব্দ এ বোধ আমাদের হ'ল।

(২) **সদৃশীকরণ** (Assimilation)—অতীতে অনুরূপ কণ্ঠস্বর শুনেছি। সেই স্বরের সঙ্গে আজকের ঐ কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য অনুভব করলাম।

(৩) পুনরুজ্জীবন (Reproduction)—অতীতে শোনা কণ্ঠস্বরটি স্মরণ করলাম। গ্রাম্য প্রকৃতির বুকে ঐ স্বর কতবার আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে; অতীতে শোনা সেই স্বর ও তার সঙ্গে জড়িত জীবনের কত ঘটনা একের পর এক মানসপটে উদিত হল।

(৪) বস্তুপরিচিতি ও স্থান নিরূপণ (Objectification and localisation)—কোকিলের ডাকটি শুনে বুঝলাম ওটি বহিঃপ্রকৃতির কোন বস্তু এবং কাছাকাছি কোনো গাছের ডাল থেকেই ওটি ডাকছে।

(৫) প্রত্যয় (Belief)—কণ্ঠস্বরটি শুনে নিশ্চিত হলাম ওটি কোকিল। পূর্বে শ্রুত কোকিলের কণ্ঠস্বর ও এই কণ্ঠস্বরের মধ্যে পার্থক্য নেই—এ প্রত্যয় হ'ল এবং তখনই হ'ল প্রকৃত প্রত্যক্ষণ।

প্রত্যক্ষণের স্বরূপ (Characteristics of perception)—প্রত্যক্ষণের স্তরগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখলে আমরা প্রত্যক্ষণের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারব।

প্রত্যক্ষণে সংবেদন উপস্থাপিত হয় এবং অতীতে লব্ধ অনুরূপ সংবেদন স্মৃতিপটে পুনরুজ্জীবিত হয়। একে বলে প্রত্যক্ষণের উপস্থাপন ও পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া (Presentative, representative factors)। রজনীগন্ধার গুচ্ছটি তোমার কাছে উপস্থাপন করা হ'ল। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক করে ওটি তোমার কাছে তুলে ধরা হ'ল। ঐ ফুলটির দিকে তুমি মনোযোগ দিলে ; অতীতের রজনীগন্ধার সংবেদন স্মরণ করে তুমি বুঝলে ওটি রজনীগন্ধা ফুল। ফুলটির স্মৃতির পুনরুজ্জীবন হ'ল।

প্রত্যক্ষণে বস্তুকে জানার ও চেনার প্রক্রিয়া আছে (Cognition and Recognition)—ফুলটি যখন তোমার কাছে এল তখন ওটি দেখে বুঝলে ওটি ফুল। ফুল সম্বন্ধে জ্ঞান তোমার আছে, আবার ওটি রজনীগন্ধা ফুল তাও তুমি চিনতে পেরেছ। ফুলের সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলেই তোমার এই প্রত্যক্ষণ হল।

প্রত্যক্ষণের দুটি দিক—একটি বাহ্যজগতের একটি মানসলোকের। প্রত্যাশা, ইচ্ছা, মনোযোগ, আগ্রহ প্রভৃতি ব্যক্তিমনের দিক (subjective)। বাহ্যজগতের বস্তুগুলি হ'ল বস্তু সাপেক্ষ দিক (objective)। ফুলটি বাহ্য-জগতের দিক।

প্রত্যক্ষণে পুরাতনের সঙ্গে নূতন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ হয়। অতীতের জ্ঞান নূতনের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষণ হয়। অভিজ্ঞতারও একটি বড় অংশ আছে। অভিজ্ঞতা না থাকলে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষণ হয় না।

বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ (Perception of spacc)—বহির্জগতে ছড়িয়ে আছে কত বস্তু। সেগুলি কতটা স্থান জুড়ে আছে তা আমরা প্রত্যক্ষণ করি। স্থান দুই প্রকার—শূন্যস্থান ও পূর্ণস্থান। বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ স্থানকে

পূর্ণ-স্থান বলে। শূন্যস্থানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। চোখ ও ত্বকের সাহায্যে আমরা স্থান প্রত্যক্ষণ করি।

বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে চারটি স্তর দেখা যায় :—

(ক) **ব্যাপ্তি** (extensity)—বস্তুটি কতখানি স্থান জুড়ে অবস্থান করছে তা আমরা প্রত্যক্ষণ করি। যেমন তোমার পিঠে একটি আঙুল রাখলে যতটা স্থান জুড়ে তোমার স্পর্শ সংবেদন হয়, পাঁচটা আঙুল রাখলে তার স্থান ব্যাপ্তি আরো বেশী হবে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চেয়ে অন্ধ ব্যক্তির ত্বকের সাহায্যে বিস্তৃতির প্রত্যক্ষণ বেশী হয়। ব্যাপ্তি সংবেদনের অর্থ সহ-অবস্থানকারী কতগুলি বিন্দুর সংবেদন। চোখ বা ত্বকের সাহায্যে বস্তুর প্রত্যেকটি সহ-অবস্থানকারী বিন্দু আমরা প্রত্যক্ষণ করি।

(ক) **স্থানীয় চিহ্ন** (Local sign)—জার্মান মনোবিদ লজ কতগুলি স্থানীয় চিহ্নের কথা বলেছেন। আমাদের চোখের অক্ষিপটে বা ত্বকে কতগুলি চিহ্ন আছে। একে বলে স্থানীয় চিহ্ন। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই চিহ্নগুলি বিশিষ্টতা অর্জ্জন করে। এর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যেকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করি।

(গ) **সঞ্চালন** (Movement)—চোখের সঞ্চালন বা অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা আমাদের বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ হয়।

প্রত্যক্ষণের প্রকার (Types of perception)—ইন্দ্রিয়গত বিভেদ অনুসারে প্রত্যক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার হয়—যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ প্রভৃতি প্রত্যক্ষণ। আমরা প্রথমে স্পর্শগত প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

স্পর্শগত প্রত্যক্ষণ (Tactual Perception)—স্থান, আকার, আয়তন ও ঘনত্বের স্পর্শগত প্রত্যক্ষণ হয়।—(space, figure, magnitude and solidity)।

স্থান :—চোখ ও ত্বক এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা স্থান প্রত্যক্ষণ করে থাকি। প্রথমে এখানে আমরা স্পর্শগত প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। স্পর্শন দুই প্রকার—সক্রিয় স্পর্শন ও নিষ্ক্রিয় স্পর্শন। মনে কর টেবিলের ওপর হাতটি রাখলাম; স্থানের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষণ হ'ল কিন্তু এর দ্বারা বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ হয় না, টেবিলটি কত বড় তা জানা হ'ল না। একে

বলে নিষ্ক্রিয় স্পর্শণ। এর পর হাতটি ধীরে ধীরে সঞ্চালন করতে সুরু করলে সমস্ত টেবিলটির বিস্তৃতি প্রত্যক্ষণ হবে। একে বলা হয় সক্রিয় স্পর্শন। অন্ধ ব্যক্তি স্থান প্রত্যক্ষণ করবে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে। হাত দিয়ে টেবিলটি স্পর্শ করলে টেবিলের সহঅবস্থানকারী প্রত্যেকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্য সে উপলব্ধি করতে পারবে। এর ফলে তার হাতটি কতটা স্থান জুড়ে আছে সে বুঝতে পারবে। এরপর হস্ত সঞ্চালন করলে সে টেবিলের প্রত্যেকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করবে; হস্ত সঞ্চালনের পেশীগত পরিশ্রমের অভিজ্ঞতা থেকে সে টেবিলটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দিক প্রভৃতি বুঝতে পারবে।

ঘনত্ব ঃ—হাতটিকে অন্যদিকে, বামদিকে, উপরে এবং নীচে সঞ্চালন করলেই ঘনত্বের প্রত্যক্ষণ হবে। বস্তুটি যদি বড় হয় তাহলে হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা ঘনত্ব বুঝতে হবে। বস্তুটি ছোট হলে নিষ্ক্রিয় স্পর্শনই যথেষ্ট সেটি হাতের মুঠোয় নিলেই ঘনত্ব বোঝা যাবে।

আকার ও আয়তন ঃ—কোন বস্তুর আকার ও আয়তনও স্পর্শনের সাহায্যে বোঝা যায়। বস্তুটির চারিদিকে হস্ত সঞ্চালন করলেই সহ-অবস্থানকারী বিন্দুগুলির ধারাবাহিকতার উপলব্ধি হবে এবং বোঝা যাবে সেটি গোলাকার। আর যদি ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায় বোঝা যাবে বস্তুটি গোল নয়, এইভাবে হস্ত সঞ্চালন করতে করতে, হাতের গতি রুদ্ধ হয়ে অন্য পথে চলতে থাকলে বোঝা যাবে বস্তুটি চৌকো।

স্পর্শগত সংবেদনের স্থান (Localisation of touch sensation)—আমরা বস্তুর স্পর্শ সংবেদন লাভ করে থাকি ও কোন স্থানে এই স্পর্শ সংবেদন হচ্ছে তাও নির্দেশ করে থাকি। একে বলে সংবেদনের স্থান নির্দেশ। স্থান নির্দেশ ব্যক্তির দেহে হতে পারে আবার দেহের বাইরে অন্য কোন স্থানে হতে পারে। তোমার পিঠে যখন আঙুল রাখা হ'ল তখন হ'ল দেহগত স্পর্শ সংবেদন। তুমি বুঝতে পারলে দেহের কোন স্থানে এই সংবেদন হ'ল।

দেহ বহির্ভূত কোন স্থানে বস্তুটি থাকতে পারে, তখন বস্তুর স্পর্শ সংবেদনের স্থান নির্দেশ করতে গেলে তোমায় বলতে হবে বস্তুটি তোমার থেকে কতদূরে বা কোন দিকে আছে। স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে দূরের বস্তুর স্থান নির্দেশ করা সম্ভব হবে কি করে? বস্তুটি দূরে থাকলে তোমায় সেখানে যেতে হবে।

যাবার সময় তোমার পেশীকে কতটা পরিশ্রম করতে হ'ল বা কতক্ষণ ধরে পেশী চালনা করতে হ'ল তার উপলব্ধি তোমার স্থান নির্দেশ করতে সাহায্য করবে।

হাত সামনে পেছনে ডান দিকে বা বাম দিকে প্রসারিত করে বস্তুটি কোন দিকে আছে বোঝা যাবে।

দর্শনগত প্রত্যক্ষণ (Visual perception)—স্পর্শনের মত স্থান, আকার, আয়তন প্রভৃতির দর্শনগত প্রত্যক্ষণ হয়। দর্শনগত স্পর্শন সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হতে পারে। আকাশের দিকে চোখ তুলে কয়েকটি তারা দেখলাম—নিষ্ক্রিয় দর্শন হ'ল। আবার সব তারাগুলি দেখার জন্য আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চক্ষু সঞ্চালন করলাম—এটি আমার সক্রিয় দর্শন হ'ল।

আকার ও আয়তনের প্রত্যক্ষণ (Perception of shape and magnitude)—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে আয়তনের দর্শনগত প্রত্যক্ষণ হয়। চক্ষু সঞ্চালনের দ্বারা এই প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। চোখটিকে বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালন করলে আয়তন প্রত্যক্ষণ হতে পারে। কিন্তু বস্তু দূরে থাকলে আয়তনের প্রকৃত প্রত্যক্ষণ হয় না। তবে বস্তুটি কত দূরে জানা থাকলে আয়তন অনুমান করা যেতে পারে।

ওজন প্রত্যক্ষণ (perception of weight)—চাপ ও পেশী সংবেদনের সাহায্যে আমাদের ওজন প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে। বস্তুটিকে উত্তোলন করলে আমাদের হাতে চাপ পড়ে আবার উত্তোলনের জন্য পেশীর সংবেদন হয়। উভয় সংবেদন বেশী হলে বুঝতে হবে বস্তুটির ওজন বেশী।

গতি (movement)—স্পর্শন ও দর্শনের সাহায্যে আমরা গতি প্রত্যক্ষণ করে থাকি। নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের দ্বারাও গতি অনুভব করা যায়। চলমান বস্তুতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে বস্তুর স্থানীয় সংকেতের ধারাবাহিকতার জন্য বুঝতে পারব সেটি চলমান। আবার ব্যক্তি নিজে ছুটতে ছুটতেও গতি প্রত্যক্ষণ করতে পারে। বস্তু স্পর্শ করে ছুটতে ছুটতে সে পেশী সংবেদন লাভ করবে এবং বুঝবে সেটি চলমান।

অনুরূপভাবে স্থির দৃষ্টিতে চলমান বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলে ধারাবাহিক-

ভাবে বস্তুর দর্শনগত সংবেদন লাভ করি। ব্যক্তি সচল হলেও চক্ষুর সঞ্চালন জনিত পেশী সংবেদন লাভ করবে এবং বুঝবে বস্তুটি চলমান।

দূরত্ব ও গভীরতা প্রত্যক্ষণ (Perception of depth and distance)—আমাদের চোখের অক্ষিপটে বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি গঠিত হয় সেগুলি দ্বি-আয়তন বিশিষ্ট কিন্তু আমরা ত্রি-আয়তন বিশিষ্ট বস্তু দেখি। এর কারণ কি? গভীরতা বা ত্রি-আয়তন বিশিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষণের কারণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) এক-চক্ষুমূলক ও (২) দ্বি-চক্ষুমূলক। (৩) চোখের পেশীর নড়াচড়াকেও একটি কারণ বলা যেতে পারে।

(১) এক-চক্ষুমূলক কারণ (monocular cue)—এক চক্ষু দিয়ে বস্তু প্রত্যক্ষণ করলে দূরত্বের অনুভূতি হয়। এই প্রত্যক্ষণ হয় অভিজ্ঞতার জন্য। এগুলিকে আমরা গৌণ কারণ বলব :—

(ক) বস্তুর অস্পষ্টতা :—কাছের বস্তুটিকে আমরা স্পষ্ট দেখবো কিন্তু দূরের জিনিষ অস্পষ্ট এবং আবছা মনে হবে।

(খ) আকার :—দূরের জিনিষ ছোট দেখায়, কাছের জিনিষ বড় দেখায়। চিত্রশিল্পী ছবি আঁকবার সময় কাছের জিনিষ বড় করে আঁকেন ও দূরের জিনিষ ছোট করেন।

(গ) আলো ছায়া :—যে জিনিষ যত কাছে থাকে তত উজ্জ্বল দেখায়, দূরের জিনিষ অনুজ্জ্বল। আবার উঁচু জায়গাতে আগে আলো পড়ে তাই নীচু জায়গাকে অন্ধকার মনে হয়। শিল্পী পাহাড় অঙ্কন করার সময় একটু বেশী উজ্জ্বল রং দেন আর নীচু জায়গাতে কালো বা কোন অনুজ্জ্বল রং দেন।

(ঘ) বস্তুর ব্যবধান :—একটা জিনিষকে আর একটা জিনিষ আড়াল করে দিতে পারে। যে জিনিসটি কাছে আছে সেটি দূরের বস্তুকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

(ঙ) প্রাকৃতিক দৃশ্য—প্রাকৃতিক দৃশ্যে গভীরতা প্রত্যক্ষণ করা যায়। দূরের জিনিষকে কাছের জিনিসের চেয়ে আবছা মনে হয়।

(চ) ফাঁকা আর ভর্তি জায়গা :—দূরের স্থান সব সময় ভর্তি মনে হয়। দূর থেকে একটা পাহাড় দেখছ, মাঝে হয়ত কত গাছপালা, পুকুর, নদী, বাড়ী

আছে কিন্তু তোমার মনে হবে পাহাড় আর তোমার মাঝে কোন ব্যবধানই নেই। দুটো সমান্তরাল রেখা যত দূরে যাবে ততই তাদের মধ্যের ব্যবধান কমে আসবে, শেষে মনে হবে রেখা দুটো মিলে গেছে। তোমরা রেললাইনের দিকে তাকিয়ে সহজেই এ পরীক্ষা করতে পারো। মনে হয় রেললাইন দুটো যেন দূরে মিশে গেছে।

(ছ) তোমরা যখন রেলগাড়ী চড়ে যাও তখন কি দেখনা কাছের জিনিষ যেন তোমার উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে? কিন্তু দূরের জিনিষগুলো তুমি যেদিকে যাচ্ছো মনে হবে সেই দিকেই তোমারই সঙ্গে ছুটে চলেছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছ দেখবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চাঁদটাও যেন এগিয়ে চলেছে। দূরের বস্তু হলে এরকম হয়ে থাকে।

আমাদের ঘ্রানেন্দ্রিয়, শ্রবনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় দূরত্ব প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। একটা ফুলের ক্ষীণ গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে ঘ্রাণ নিয়ে বুঝতে পারলাম ফুলের বাগানটা দূরে আছে। দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারি শব্দের উৎস নিকটে নয়। স্পর্শের সাহায্যেও আমাদের দূরত্বের বোধ হয়। যে জিনিষটা কাছে আছে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। দূরের জিনিষ পেতে হ'লে হেঁটে যেতে হবে।

(২) দ্বিচক্ষুমূলক কারণ (Binocular cause):—আমরা দু চোখ দিয়ে বস্তু প্রত্যক্ষণ করি। বস্তুর ছবি দু চোখের পীতবিন্দুতে দুটি প্রতিমূর্ত্তি গঠন করে। এই দুটি প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে তার কারণ আমাদের দুচোখের দূরত্ব প্রায় আড়াই ইঞ্চি। ডান চোখ দিয়ে বস্তুর যে দিকটি ভাল করে দেখব, বাম চোখ দিয়ে সেই বস্তুর অন্য দিকটি ভাল করে দেখব। দুচোখের এই দেখার পার্থক্যকে অক্ষিপটের বৈষম্য (retinal desparity) বলে। দু চোখে একই বস্তুর দুটি প্রতিচ্ছবি গঠিত হয় কিন্তু আমরা দুটি ছবি দেখি না, দেখি ত্রি-আয়তন বিশিষ্ট একটি ছবি।

স্টেরিওস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে একই বস্তুর দুটি ছবি তোলা হয়। ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুর একটি প্রতিচ্ছবি হয় এবং বাম চোখ দিয়ে দেখলে আর একটি প্রতিচ্ছবি হয়। দুটি ছবি স্টেরিওস্কোপ যন্ত্রে পাশাপাশি রাখা হয় এবং যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে আমরা ত্রি-আয়তন বিশিষ্ট ছবি দেখি।

(৩) পেশীর নড়াচড়া জনিত কারণ (Kinesthetic cue) বস্তুদর্শনের সময় আমাদের পীতবিন্দুতে প্রতিচ্ছবি গঠনের জন্য চোখকে নড়াচড়া করতে হয়। চোখের পেশীর এই নড়াচড়ার অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে যায়। দূরের জিনিষ দেখার সময় আমাদের চোখ দুটি প্রায় সমান্তরাল থাকে এবং কাছের জিনিষ দেখার সময় চোখ দুটি পরস্পরের কাছাকাছি সরে আসে একে বলে কেন্দ্রীকরণ (Convergence)।

সিলিয়ারী পেশীর সাহায্যে আমাদের চোখের লেন্স কখনও বড় হয় কখনও ছোট হয়। সিলিয়ারী পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে এরূপ হয় এবং লেন্সটি কখনও মোটা, কখনও পাতলা হয়। একে বলে একোমোডেশন (Accomodation)। এই কারণগুলিকে মুখ্য কারণ বলা হয়।

সমগ্রতাবাদী মতবাদ (Gestalt theory):—সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে আমরা বস্তুকে কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টি হিসাবে দেখি না, একটি একক বস্তু হিসাবেই প্রত্যক্ষণ করি। এমন কি বহু বিচ্ছিন্ন বস্তুকেও আমরা একত্র করে দেখবার চেষ্টা করি। মনের এই সংগঠনের চেষ্টা মস্তিষ্কের দ্বারা সাধিত হয়। পাঁচ প্রকারে এই সংগঠন সাধিত হয়। (১) নৈকট্য (Proximity), (২) সাদৃশ্য (Similarity), (৩) অবিচ্ছিন্নতা (Contiguity), (৪) সম্পূর্ণতা (Completeness) এবং সামঞ্জস্য (Symmetry)

(১) **নৈকট্য** (Proximity):—যে সব জিনিষগুলো কাছাকাছি থাকে তাদের আমরা একসঙ্গে দেখি। আমরা ab, cd, ef-এইভাবে তিন জোড়া
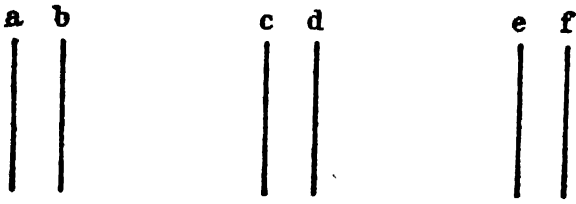
লাইন দেখব, bc, de এইভাবে রেখাগুলিকে একত্র করব না। a এবং bকে নৈকট্যের জন্য একসঙ্গে দেখছি।

(২) **সাদৃশ্য** (Similarity) :—যে জিনিষগুলি একরকম দেখতে

● ○ ● ○   ● ● ● ●

● ○ ● ○   ○ ○ ○ ○

● ○ ● ○   ● ● ● ●

● ○ ● ○   ○ ○ ○ ○
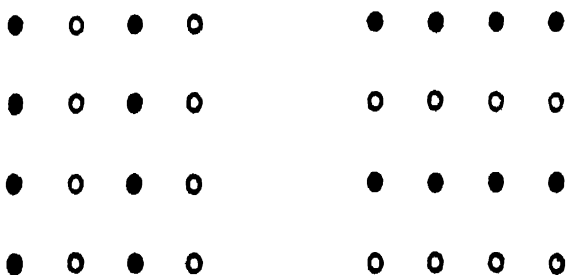
সেগুলিকে একসঙ্গে দেখি। বাঁ দিকের চিত্রে আমরা বিন্দুগুলিকে দৈর্ঘ্য বরাবর দেখব কিন্তু ডান দিকের চিত্রে বিন্দুগুলি অনুভূমিক লাইনে দেখব।

(৩) **সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যপূর্ণতা** (Completeness ও Symmetry) খণ্ড জিনিষ অপেক্ষা সম্পূর্ণ জিনিষে আমরা অধিক মনোসংযোগ করি। যেমন ধর ব্ল্যাকবোর্ডে একটি গোল, আর কতগুলি খণ্ড লাইন আঁকা আছে। আমরা কোনদিকে আগে মন দেব? সম্পূর্ণ অর্থাৎ গোলাকার বৃত্তটিই সর্ব্বপ্রথম
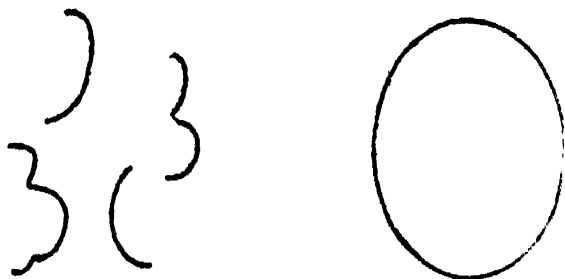
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চিত্রে আমরা দেখছি দুজোড়া লাইন আছে এবং দুপাশে দুটি বিচ্ছিন্ন লাইন আছে। কিন্তু তার পরের চিত্রে তিন জোড়া

লাইন আছে। রেখাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে আমরা প্রত্যক্ষণ করে থাকি। একটি শিশু আকাশের গায়ে খণ্ড খণ্ড মেঘের চেয়ে পূর্ণচন্দ্রের দিকে প্রথমে মনোযোগ দেবে।

অবিচ্ছিন্নতা (Continuity) :—আকাশের তারাগুলি এক লাইনে থাকলে অথবা কোন অবিচ্ছিন্ন বৃত্তের আকারে থাকলে আমরা সেগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে সংঘবদ্ধ করে দেখি। এই চিত্রে পাখীর ঝাঁকের একটা পাখীর দিকে চোখ পড়লে আপনা হতেই অনুরূপ পাখীর ওপর চোখ পড়বে। এইভাবে

চোখ অনুরূপ পাখীগুলিকে একটির পর একটি দেখে চলবে। একেই আমরা বলব অবিচ্ছিন্নতা।

মানুষের সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করা জন্মগত অথবা অর্জ্জিত এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। সমগ্রতাবাদীগণের মতে ইহা জন্মগত। অভিজ্ঞতা আমাদের নূতন জিনিষকে জানতে সাহায্য করে কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন জিনিসও শিশু সমগ্রভাবেই দেখে। সমগ্রতাবাদীদের এ মত সকলে মেনে নিতে পারেন নি। শিশুদের এ ক্ষমতা জন্মগত কিনা বোঝবার উপায় নেই। দেখা গেছে জন্মান্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পাবার পর চৌকো বা ত্রিভুজকে ত্রিভূজ বা চৌকো বলে দেখেছে কিন্তু সে দেখা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। এককভাবে দেখা যদি জন্মগত হত তাহলে এই ব্যক্তিরাও হঠাৎ দৃষ্টি ফিরে পাবার পর সেই ভাবে দেখত।

কিন্তু সমগ্রতাবাদীদের পক্ষে আরোও যুক্তি আছে। পশু নিয়েও এই পরীক্ষা হয়েছে। কতগুলি মুরগীকে শেখান হল সব সময় গাঢ় ধূসর বর্ণের পাত্র থেকে খাবার খেতে। গাঢ় ধূসর বর্ণও হালকা ধূসর বর্ণের দুটো পাত্র থাকত। পরে হালকা ধূসর বর্ণের পাত্রটির পরিবর্তে গাঢ় ধূসর বর্ণের পাত্র রাখা হল। ফলে মাঝামাঝি ধূসর বর্ণের পাত্রটি যেটি আগে গাঢ়ো বলে মনে হত এখন হালকা ধূসর বলে মনে হল। দেখা গেল নূতন গাঢ়ো ধূসর বর্ণের পাত্রটি মুরগী বেছে নিল। এর থেকে বোঝা যায় যে পশু পাখীরাও পাত্রগুলির মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ করতে পারে।

সমগ্রতাবাদীদের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুর উপাদানগুলি পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। তাঁরা বলেন আকার উপাদানের মতই সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। আমরা বস্তু জগতে যা কিছু দেখি সবই একক হিসাবে দেখি, পূর্ণাঙ্গ হিসাবে দেখি। তাঁদের মতে একটি জটিল সম্পূর্ণ জিনিষ কখনই কতগুলি বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি নয়। সেই জন্য বিচ্ছিন্নকে জানলে সম্পূর্ণকে জানা হল না।

কোন বস্তুকে বা নক্সাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখা আবার এক নয়। কারণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একই জিনিষ বিভিন্ন-রূপে দেখি। উপরের উদাহরণ থেকে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

তিনজন জার্মান মনোবিদ গেষ্টল্ট, কোহ্‌লার ও কফ্‌কা এই মতবাদ প্রচার করেন। সমগ্রতাবাদীরা বলেন বস্তুর সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষগোচর হয়। প্রত্যক্ষণ কখনই বিচ্ছিন্ন সংবেদন নয়। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষণই জ্ঞানের একক।

তাঁরা বললেন পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রত্যক্ষণ করি। পটভূমি পরিবর্ত্তিত হলে প্রত্যক্ষ বস্তুর রূপও পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁরা বললেন আমরা একটি পটভূমিতে একটি মূর্ত্তি দেখি (Figure against ground)। পটভূমি ছাড়া প্রত্যক্ষণ হয় না।

প্রত্যক্ষণের সময় আমাদের মনের ফাঁক বা খণ্ডতাকে পূরণ করে নেওয়ার দিকে একটা ঝোঁক আছে। তাই প্রত্যক্ষ বিষয় বা বস্তুর মধ্যে ছেদ বা ফাঁক থাকলে আমরা তা পূরণ করে দেখি। একে তাঁরা বললেন খণ্ডতা পূরণ (Closure).

আপাত গতি (Apparent movement) :—দুটি বৈদ্যুতিক আলো একটির পর একটি জ্বালিয়ে, নিবিয়ে দিয়ে একটি আপাত গতির সৃষ্টি করা হয়। ঐরূপ আলো দেখলে মনে হয়, আলোগুলি যেন সরে সরে যাচ্ছে। আসলে একটি আলো জ্বালার পর অপর আলোটি জ্বলা পর্য্যন্ত যে সময় তার ওপর নির্ভর করে এই আপাত গতি। সময়ের ব্যবধান খুব দীর্ঘ হলে আমরা দেখব দুটি পৃথক আলো একটির পর আর একটি জ্বলে চলেছে। সময়ের ব্যবধান আর একটু কমালে মনে হবে একটি আলোই যেন নড়াচড়া করে একবার সামনে একবার পেছনে আসছে। সময়ের ব্যবধান খুব কম করে দিলে মনে হবে দুটো আলো যেন একসঙ্গে জ্বলছে, নিবে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষণের ব্যক্তিগত কারণ
(Subjective factors in perception)

আমাদের প্রত্যাশা, অভিলাষ এবং মনোযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয়। প্রত্যাশা বা অভিলাষ থাকলে আমরা ভুল প্রত্যক্ষণও করি। যেমন কোন ব্যক্তির প্রতীক্ষায় থাকলে গাড়ীর শব্দে ছুটে যাই। আবার আমাদের আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতাও অনেক সময় ভুল প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী হয়। খড়ের গাদা দেখলে দূর থেকে বাড়ী বলে ভুল করি। দূরের থেকে মেঘের গর্জ্জনকে ট্রেনের শব্দ বলে ভুল করি। পরিচিতি, প্রত্যাশা, আগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা মস্তিষ্কের কোন অংশ উত্তেজিত হওয়ার ফলে এরূপ ভ্রম হয়।

আধুনিক কালে প্রত্যক্ষণের এই মানসিক কারণগুলির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। কতগুলি অর্থহীন উদ্দীপক খুব অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত করার পর অভিক্ষার্থী কি দেখল প্রশ্ন করা হয়। যেমন কতগুলো শব্দ দেখানো হল। Scared কথাটি ধার্মিক ব্যক্তির চোখে sacred বলে মনে হবে।

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (Errors in perception) : আমাদের প্রত্যক্ষণ কখনই সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় না।—উদ্দীপকের বিভিন্নতার জন্য আমাদের প্রত্যক্ষণ ভুল হতে পারে। যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় দুজন ব্যক্তির মধ্যে কে বড়? যদি দুজনের মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য এক ইঞ্চি হয় তুমি সহজেই বলতে পারবে কে বেশী লম্বা। কিন্তু পার্থক্য যদি আধ ইঞ্চি হয় তোমার পক্ষে ঠিক উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না—পার্থক্য বেশী হলে দুটি বস্তুকে তুলনা করে পৃথক

করা সহজ, পার্থক্য কম হলে এই বিভেদীকরণ (Discrimination) ভুল হতে পারে।

আবার একটি বস্তুর ওজন, দৈর্ঘ্য, তাপ-ইত্যাদির পরিমাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেও তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারবেনা—পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে অনুমানের (Estimate) উপর নির্ভর করে তুমি উত্তর দেবে।

প্রত্যক্ষণের ভুল দুই প্রকার—স্থির (Constant) ভুল ও পরিবর্ত্তনশীল (Variable) ভুল। অভ্যাসের দ্বারা স্থির ভুলকে সংশোধন করা যায়। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল ভুল দূর করা সহজসাধ্য নয়।

স্থির ভুল কখনও খুব বেশী হয়; আবার স্থির ভুলও অবস্থা বিশেষে পরিবর্ত্তিত হতে পারে। যখন তুমি কোন কিছুর প্রতীক্ষা করছ তখন এক মিনিটকেও খুব দীর্ঘ মনে হয় আবার কাজে ব্যস্ত থাকলে এক মিনিট সময় তোমার কাছে অল্প সময়।

স্থির ভুল বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল ভুল উদ্দীপকের ক্রম বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাবে। ২ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি লম্বা একটি কাঠির দৈর্ঘ্য অনুমান করবার সময় তোমার ভুল সিকি ইঞ্চিরও কম হবে। কিন্তু ২০ ফুট দীর্ঘ বস্তুর ক্ষেত্রে তোমার কয়েক ইঞ্চি ভুল হতে পারে।

ভুল করে কোন জিনিষকে দেখার নামই হল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে কিছু নেই। কারণ সব প্রত্যক্ষণই এই ভ্রম দ্বারা সর্ব্বদাই প্রায় প্রভাবিত হচ্ছে। বস্তুটি আসলে যা নয় তাই দেখার নামই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। এইভাবে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা দিলে, বলব পরাভব মূর্ত্তি এবং গভীরতা প্রত্যক্ষণও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। ভ্রান্ত প্রতক্ষ্যণ দুই প্রকার,-অধ্যাস (Illusion) ও অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination)।

(১) অধ্যাস (Illusion)

রজ্জুতে সর্পভ্রম কথাটা আমাদের দেশে প্রবাদ হিসেবে বহু প্রচলিত। অন্ধকার পথে যেতে যেতে একটি দড়ি দেখলে আমরা সাপ ভেবে লাফিয়ে উঠি তারপরই নিরাপদ স্থান থেকে ভালো করে দেখে নিজের ভ্রম বুঝতে পারি। অধ্যাস দুই প্রকারের ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন। প্রথমে আমরা ব্যক্তিগত অধ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। অন্ধকার রাত্রিতে

তিন বন্ধু দূরে গ্রামের পথে হেঁটে চলেছে। গাছে গাছে চাঁদের সুষমা ভেঙ্গে পড়েছে। একজন প্রথমে চমকে উঠলে তাইত মাঠের মধ্যে ওখানে দাড়িওয়ালা হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আর একজন ভয় পেয়ে গেলে এ যে রোগামত ঘোমটা মাথায় একটি মেয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। আর একজনের মনে হল কোন সন্ন্যাসী মালা নিয়ে ধ্যান করছে। সাহস করে কাছে গিয়ে দেখলে তিনজনের দেখা ভুল। আসলে ওটি একটি বড় গাছ, অসংখ্য ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানটা চাঁদের আলো পড়েছে সেখানটা উজ্জ্বল, যেখানটায় আলো পড়েনি সেখানটা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই আলো ছায়া এইরূপ ভ্রমের কারণ।

আগেই বলেছি অধ্যাস দুই প্রকার—**ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন**। রাতের আঁধারে একটি ডালপালা সমন্বিত গাছকে তিনজনে তিন ভাবে দেখেছিল। এ হল ব্যক্তিগত অধ্যাস। ব্যক্তিগত অধ্যাসে একই ব্যক্তি আবার বিভিন্ন সময়ে একই জিনিষকে বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারে। যেমন একটা চকচকে জিনিষকে আজ টাকা মনে হতে পারে আবার কাল টিন বলে ভ্রম হতে পারে।

সার্ব্বজনীন অধ্যাসে একই জিনিষ সকলেই একই ভাবে ভুল করে। দড়ি দেখে ব্যক্তি সাপ ভেবে চমকে ওঠে আবার কতগুলি নক্সা আছে যেগুলিকে সকলেই একই ভুল করে দেখে। নিম্নের চিত্রগুলি সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষণের উদাহরণ।

অধ্যাসের কারণ—অধ্যাসের পশ্চাতে মানুষের মনের অবস্থা, অভিলাষ, বাসনা প্রভৃতি ক্রিয়া করে। এই কারণগুলো বস্তুর প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে। নীচে এই কারণগুলো দেওয়া হল।

(১) কানের দুল হারিয়ে গেছে, খুঁজতে বেরিয়েছ, একটি চকোলেটের সোনালী কাগজকেই দুল বলে ভ্রম হতে পারে। একটা দরকারী বই খোঁজার সময় অনুরূপ মলাটের বা আকারের কোন বই ভুল করে টেনে নেওয়ার উদাহরণ বিরল নয়। এখানে ভ্রমের জন্য বস্তু দুইটির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহাই দায়ী।

(২) আবার উপরিউক্ত ঘটনার সময় আমাদের মনের ইচ্ছাও কম ক্রিয়াশীল ছিল না। অলঙ্কারটি হারিয়ে গেছে, সেটি ফিরে পেতে চাই, সেই জন্যই কাগজটিকে দুল বলে ভ্রম হয়েছিল। অন্য সময় এরূপ ভুল হত না।

(৩) আবেগ অধ্যাসের অন্যতম প্রধান কারণ। রাত্রে শোবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড় করান লাঠি দেখে চোর ভ্রমে চীৎকার করে উঠলে। তারপর বাড়ীর সকলে এসে আলো জেলে কাছে গিয়ে আবিষ্কার করল—ওটা চোর নয় একটা লাঠি তখন তুমি লজ্জা পেলে। এক্ষেত্রে ভয় তোমার এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী। গভীর রাত্রে একা দরজা খুলেই তোমার ভয় ভয় করছিল, অন্ধকারে লম্বামত কে দাঁড়িয়ে আছে দেখেই তুমি চোর বলে ভুল করলে।

(৪) প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অধ্যাসকে অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে। ছাপার প্রুফ দেখছি হসিতেছি লেখা আছে কিন্তু পড়ছি হাসিতেছি। ভুলটা চোখ এড়িয়ে গেল। এরকম ভুল হওয়ার কারণ হল আমাদের পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান এবং মনের একত্র করে দেখার প্রবণতা।

(৫) ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় মনে হয় আশপাশের ঘরবাড়ী, গাছপালা উল্টো দিকে সরে যাচ্ছে। এ হল সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষণ। সকলেই জানি আমরা সরে যাছি তবুও প্রত্যক্ষ করি আমাদের চারিপাশের বেষ্টনীকে উল্টো দিকে সরে যেতে। আমাদের মন এখানে ক্রিয়াশীল। পূর্ব্বার্জ্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি চলমান বস্তু আমাদের থেকে সরে যায়। এই অভিজ্ঞতা ভুলের জন্য দায়ী।

কতকগুলি ভ্রান্তপ্রত্যক্ষণ বা জ্যামিতিক অধ্যাস আছে যেগুলি সার্ব্বজনীন। নিয়ে কয়েকটি চিত্র দেওয়া হল।

মূলার লায়ারের ভ্রম

(ক) মূলার লায়ারের ভ্রম। (Muller Lyer Illusion) ডানদিকের ছবির মাঝের রেখাটি বাঁদিকের মাঝের রেখা থেকে বড় মনে হবে। যদিও ছুটি মাঝের রেখাই সমান।

(খ) নীচের ডানদিক ও বাঁদিকের রেখা দুটি সমান, কিন্তু ডানদিকের রেখাটি-কে বড় মনে হবে। এদের নাম হল মূলার লায়ারের ভ্রম।

(গ) এখানে আয়ত ক্ষেত্রটির দুপাশের দুটি রেখা প্রকৃতপক্ষে একটি সরলরেখা কিন্তু মনে হবে দুটি বিভিন্ন রেখা। এর নাম হল পেগেন ড্রফের ছবি।

জোলনারের ছবি

(ঘ) জোলনারের ছবি :—এতে লম্বা রেখাগুলি সব সমান্তরাল কিন্তু বাঁকা ছোট ছোট রেখাগুলির জন্য ওগুলি সমান্তরাল নয় বলে মনে হবে।

(ঙ) হেরিংএর ছবি :—এতেও দুটো সমান্তরাল রেখা আছে অন্য কতগুলো রেখার জন্য বাঁকা মনে হবে।

সার্বজনীন অধ্যাসের অনেকগুলি কারণ আছে। কেহ বলেন এগুলি

(৩) আবেগ অধ্যাসের অন্যতম প্রধান কারণ। রাত্রে শোবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড় করান লাঠি দেখে চোর ভ্রমে চীৎকার করে উঠলে। তারপর বাড়ীর সকলে এসে আলো জ্বেলে কাছে গিয়ে আবিষ্কার করল—ওটা চোর নয় একটা লাঠি তখন তুমি লজ্জা পেলে। এক্ষেত্রে ভয় তোমার এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী। গভীর রাত্রে একা দরজা খুলেই তোমার ভয় ভয় করছিল, অন্ধকারে লম্বামত কে দাঁড়িয়ে আছে দেখেই তুমি চোর বলে ভুল করলে।

(৪) প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অধ্যাসকে অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে। ছাপার প্রুফ দেখছি হসিতেছি লেখা আছে কিন্তু পড়ছি হাসিতেছি। ভুলটা চোখ এড়িয়ে গেল। এরকম ভুল হওয়ার কারণ হল আমাদের পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান এবং মনের একত্র করে দেখার প্রবণতা।

(৫) ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় মনে হয় আশপাশের ঘরবাড়ী, গাছপালা উল্টো দিকে সরে যাচ্ছে। এ হল সার্ব্বজনীন প্রত্যক্ষণ। সকলেই জানি আমরা সরে যাছি তবুও প্রত্যক্ষ করি আমাদের চারিপাশের বেষ্টনীকে উল্টো দিকে সরে যেতে। আমাদের মন এখানে ক্রিয়াশীল। পূর্ব্বার্জ্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি চলমান বস্তু আমাদের থেকে সরে যায়। এই অভিজ্ঞতা ভুলের জন্য দায়ী।

কতকগুলি ভ্রান্তপ্রত্যক্ষণ বা জ্যামিতিক অধ্যাস আছে যেগুলি সার্ব্বজনীন। নিম্নে কয়েকটি চিত্র দেওয়া হল।

মুলার লায়ারের ভ্রম

(ক) মূলার লায়ারের ভ্রম। (Muller Lyer Illusion) ডানদিকের ছবির মাঝের রেখাটি বাঁদিকের মাঝের রেখা থেকে বড় মনে হবে। যদিও দুটি মাঝের রেখাই সমান।

(খ) নীচের ডানদিক ও বাঁদিকের রেখা দুটি সমান, কিন্তু ডানদিকের রেখাটি-কে বড় মনে হবে। এদের নাম হল মূলার লায়ারের ভ্রম।

(গ) এখানে আয়ত ক্ষেত্রটির দুপাশের দুটি রেখা প্রকৃতপক্ষে একটি সরলরেখা কিন্তু মনে হবে দুটি বিভিন্ন রেখা। এর নাম হল পেগেন ড্রফের ছবি।
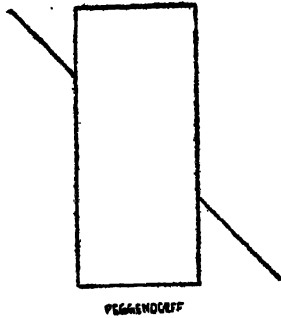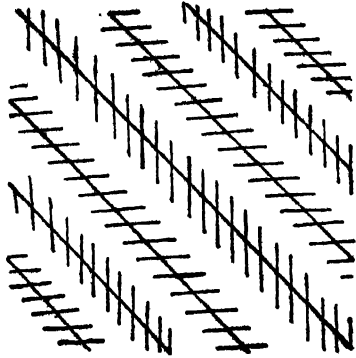
জোলনারের ছবি

(ঘ) জোলনারের ছবি :—এতে লম্বা রেখাগুলি সব সমান্তরাল কিন্তু বাঁকা ছোট ছোট রেখাগুলির জন্য ওগুলি সমান্তরাল নয় বলে মনে হবে।

(ঙ) হেরিংএর ছবি :—এতেও দুটো সমান্তরাল রেখা আছে অন্য কতগুলো রেখার জন্য বাঁকা মনে হবে।
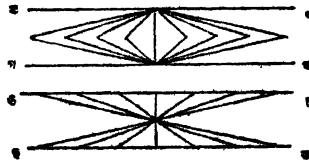
সার্বজনীন অধ্যাসের অনেকগুলি কারণ আছে। কেহ বলেন এগুলি

রেখায় সময় চোখকে নড়াচড়া করতে হয়। চোখ যত বেশী নড়াচড়া করবে রেখাগুলিকে তত বড় বলে মনে হবে। দ্বিতীয় কারণ হল আমরা যখন এই রেখাগুলি দেখি এগুলিকে সমগ্র ভাবে দেখি। সেই জন্য রেখাগুলিকে বিভিন্ন ভাবে না দেখে একেবারে সম্পূর্ণটা দেখি বলেই এরকম ভ্রম হয়।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিকৃত প্রত্যক্ষণ বলে সত্যই কিছু নেই। কারণ প্রত্যক্ষণ মাত্রেই ভ্রান্ত। এদিক দিয়ে গভীরতার অনুভূতি, পরাভব মূর্তি প্রভৃতিকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলা যেতে পারে। মনের চিন্তা, ভাবনা সৌন্দর্য্যবোধ, প্রয়োজন, অভিলাষ প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষণ সর্ব্বদাই প্রভাবিত হয়ে থাকে।

২। অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination)

আগে সংবেদন হয় পরে হয় প্রত্যক্ষণ। উত্তেজক না হলে প্রত্যক্ষণ হয় না। অধ্যাসে উত্তেজক থাকে তাই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ হয়। অলীক প্রত্যক্ষণ সেই দিক দিয়ে দেখলে প্রত্যক্ষণই নয়—এতে কোন উত্তেজকের দরকার হয় না—ইহা মানুষের মনের বিকার ছাড়া কিছুই নয়।

রজ্জুতে সর্পভ্রম সকলেরই হয়। সাপ না থাকলেও রজ্জুকে অবলম্বন করে দর্শকের ভ্রান্তি জন্মে। অলীক প্রত্যক্ষণে এরূপ কোন উদ্দীপনা থাকে না। ম্যাকবেথ সম্মুখে তরবারি প্রত্যক্ষণ করে ভীতিগ্রস্ত হত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা কোন বাস্তব তরবারি নয়, মনের ভীতিই তরবারির রূপ ধারণ করত। অলীক প্রত্যক্ষণ তাই সর্ব্বদাই অলীক বা মিথ্যা।

অনেকের মতে অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক বিকার জাত। অতিরিক্ত রক্তপ্রবাহের ফলে বা কোন কারণে মস্তিষ্কের সংযোগাঞ্চল (Association area) এবং ঐ অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হওয়ার ফলে অলীক প্রত্যক্ষণ হয়।

কিন্তু এমত সকলে গ্রহণ করেন না। কেউ কেউ বলেন আমাদের আবেগ বা আকাঙ্খার জন্য অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। একান্ত কাম্য ব্যক্তিটিকে তাই ভুল করে দেখা অসম্ভব নয়; শত্রুর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই বলে হয়ত শত্রুর মিথ্যা প্রত্যক্ষণ হয়। ভয় অলীক প্রত্যক্ষণের অন্যতম কারণ বলে অনেক

মনোবিদ্‌ মনে করেন। নির্জ্জন রাত্রে হানাবাড়ীতে ভূতের দেখা পাওয়া যায় এই কারণে।

অনেকে বলেন মনকে একান্ত করে কোন কিছুতে নিবিষ্ট করে রাখলেও অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। ম্যাকবেথ যখন তরবারি শূন্তে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখতেন তখন তার সর্ব্বক্ষণের চিন্তা ডানকানের (Duncan) হত্যাকে আশ্রয় করেই প্রবাহিত হত। ভোজসভায় এই কারণে ম্যাকবেথ মৃত ব্যাঙ্কোকে শূন্য চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছিল। আমাদের মন সতত সঞ্চরণশীল। সর্ব্বদাই সে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে গমন করছে। মন যখন এই বিচরণ বন্ধ করে একটি বিষয়ে একান্তভাবে মনোনিবেশ করে তখনই হয় অলীক প্রত্যক্ষণ।

অলীক প্রত্যক্ষণ স্বাভাবিক মনের ক্রিয়া নয় ইহা বিকারজাত মানসিক ক্রিয়া। সাধারণতঃ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিরই অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। সেই জন্য বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে অদৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনে রত দেখা যায়। অলীক প্রত্যক্ষণকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে স্বপ্ন দর্শন ঘটে নিদ্রিতাবস্থায় কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ হয় জাগ্রত অবস্থায়। সকলেই স্বপ্ন দেখে কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ হয় খুব কম লোকের। যে স্বপ্ন দেখে সে ঘুম ভেঙ্গে বুঝতে পারে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু যার অলীক প্রত্যক্ষণ হয় সে বুঝতে পারে না ওটা অলীক প্রত্যক্ষণ।

অবশ্য সুস্থ ব্যক্তিরও যে অলীক প্রত্যক্ষণ হয় না তা নয়। ভূতুড়ে বাড়ীতে ভূতের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকলে ভূত দেখা অসম্ভব ব্যাপার নয়। নেশাখোর ব্যক্তির নেশার সময় অলীক প্রত্যক্ষণ হতে পারে। দিবা স্বপ্নে বিভোর থাকলেও অলীক প্রত্যক্ষণ হতে পারে। ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখতে দেখতে বুড়ীর হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলার গল্প তোমরা সকলেই জান। জ্বরের বিকারে মানুষের অলীক প্রত্যক্ষণ হয়।

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের প্রভেদ

(Distinguish between illusion and Hallucination)

(১) অধ্যাসে উত্তেজকের প্রয়োজন হয় কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণে উত্তেজক থাকে না।

(২) সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরই অধ্যাস হয় কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ হয় সাধারণতঃ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির।

(৩) আবেগ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের কারণ। উভয় ক্ষেত্রেই ভয় ইত্যাদি আবেগ অলীক প্রত্যক্ষণ এবং অধ্যাসের সৃষ্টি করে।

এ্যাপারসেপশন (apperception)-প্রত্যক্ষণের উপকরণ ২টি, একটি হল উত্তেজক, অপরটি অভিজ্ঞতা। উত্তেজক না হলে সংবেদন হয় না আবার সংবেদন না হলে প্রত্যক্ষণও হয় না। আবার অভিজ্ঞতা না হলেও প্রত্যক্ষণ হয় না। যখন সংবেদনকে কেন্দ্র করেই প্রত্যক্ষণ হয় তখন তাকে আমরা প্রত্যক্ষণ বলব (Perception)। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা সংবেদনকে ছাড়িয়ে প্রবল হয়, তখনই হয় এ্যাপারসেপশেন। যেমন কমলালেবু দেখে যখন বলি এটা একটা কমলালেবু, তখন হয় প্রত্যক্ষণ। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতা লাভের পর আমরা বলতে পারি এটা শিলেট থেকে আনা হয়েছে, শীতকালে হয়, এটা শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর ইত্যাদি তখন হয় এ্যাপারসেপশেন। এ্যাপারসেপশেনকে আমরা চিন্তা সমন্বিত প্রত্যক্ষণও বলতে পারি; কারণ এতে শুধু প্রত্যক্ষ করি না মনে মনে চিন্তাও করি। এ্যাপারসেপশনের জন্য চেষ্টা করে চিন্তা করতে হয় কিন্তু প্রত্যক্ষণে চেষ্টার প্রয়োজন নেই।

সংবেদন (Sensation)

বিশ্বপ্রকৃতির সহস্র সংবাদ আমাদের কাছে ধরা দেয় আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। সংবেদনকে অনেকে মনের গবাক্ষ বলেছেন আবার কেউ বলেছেন জ্ঞানের দরজা। বিশ্বভাণ্ডারে কত জ্ঞান আছে, আছে কত নয়নাভিরাম দৃশ্য, শ্রুতি মধুর সঙ্গীত, সুস্বাদু খাদ্য প্রভৃতি। কিন্তু কেমন করে এসব আমরা দেখি, শুনি, ঘ্রাণ করি? আমাদের শরীরে আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এরা আমাদের কাছে বহির্বিশ্বের সংবাদ বহন করে আনে। বাইরের উত্তেজনা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় সংবেদক স্নায়ু, মস্তিষ্ক আবার সঞ্চালক স্নায়ুগুলির সাহায্যে তার নির্দেশ পাঠায়, এবং আমরা সংবেদন লাভ করি।

আমরা সংবেদনকে বলতে পারি প্রাথমিক চেতনা ও অনুভূতি। সংবেদন হল সরলতম মানসিক প্রক্রিয়া। এর চেয়ে সরল ক্রিয়া মানস প্রকৃতিতে

আর নেই। তাহলে সংবেদনের প্রকৃত সংজ্ঞা হল আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিত বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন উত্তেজনার অনুভূতি। পঞ্চইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন আছে সংবেদনের জন্য আর মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করবার জন্য। মস্তিষ্ক না হলে সংবেদন হয় না, ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। সংবেদন সরলতম মানসিক প্রক্রিয়া একে আর বিশ্লেষণ করা যায় না।

বিশুদ্ধ সংবেদন বলে কিছু আছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংবেদন সর্ব্বদা অর্থময়, ইহা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। অতি শৈশবে যখন শিশুর পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তখনই হয় প্রকৃত সংবেদন। মনে করো সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার ঘরে একা বসে আছ, কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে তাকালে, তোমার শ্রবণ সংবেদন হল।

মনে করো ট্রামে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছো, কে একজন তোমার নাম ধরে ডাকল—তুমি চমকে তাকালে। পরমুহূর্তেই চিনতে পারলে কোন পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠস্বর। যতক্ষণ ডাকটা শুনছিলে ততক্ষণ ছিল সংবেদন কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি বুঝতে পারলে ওটা তোমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর সেই মুহূর্ত্তে ওটি আর সংবেদন রইল না হল প্রত্যক্ষণ। সংবেদনের জন্য সব সময় প্রয়োজন বাইরের উত্তেজক, কিন্তু যে কোনো উত্তেজকমাত্রই সংবেদন সৃষ্টি করে না। আমাদের ইন্দ্রিয় যদি বিকল হয়ে পড়ে তাহলে সে আর উত্তেজকে সাড়া দেবে না।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। এতক্ষণ আমরা সংবেদনকে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে জড়িত করেছি। কিন্তু সংবেদন যে সব সময়ই বাইরের জগৎ থেকে হবে তা নয়। অনেক সংবেদন আছে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি বহির্জগৎ দ্বারা উত্তেজিত হয় না, শরীরের অভ্যন্তর থেকে উত্তেজনা আসে।

সব উত্তেজনা সব ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে পারে না। যেমন আমরা চোখ দিয়ে শুনতে পারি না এবং কান দিয়ে দেখি না। বিশেষ ইন্দ্রিয় বিশেষ উত্তেজকে সাড়া দিয়ে থাকে।

সংবেদনের সময় আমরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকি। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দীপ্ত করে এবং আমাদের সংবেদন হয়। এই সংবেদন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য

সংবেদন হল একটা ভাবমূর্ত্তি বা বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা। প্রত্যক্ষণ হল সংবেদন উদ্ভূত জ্ঞান এবং বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। ট্রেনের বাঁশীর সুরটা কানে প্রবেশ করলে হবে শ্রবণ সংবেদন। কিন্তু যখন বোঝা গেল ওটা ট্রেনের বাঁশী তখন হল প্রত্যক্ষণ। বিভিন্ন সংবেদন হয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং আমরা বিচ্ছিন্ন সংবেদন লাভ করি। কিন্তু প্রত্যক্ষণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় লব্ধ সংবেদন থেকে উদ্ভূত একক জ্ঞান। এর জন্য একাধিক ইন্দ্রিয় একসঙ্গে ক্রিয়া করতে পারে। সংবেদন আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেনা। জোরে একটা শব্দ হলেই ইচ্ছা না থাকলেও শ্রবণ সংবেদন হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষণের সময় মন সক্রিয় থাকে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিলে তবেই প্রত্যক্ষণ হয়। সংবেদনের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না কিন্তু প্রত্যক্ষণের উপর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা প্রভাব বিস্তার করে। সংবেদনে বস্তুর অস্তিত্বটাই সব; প্রত্যক্ষণে বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি ত হয়ই তাছাড়া তার বিশেষত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জ্জন করি।

বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য ও তাদের স্বরূপ
(Characteristics of different sensations)

সংবেদনের দুই প্রকারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (১) গুণগত (quality) বৈশিষ্ট্য, (২) পরিমাণগত (quantity) বৈশিষ্ট্য।

(১) গুণ (quality)—বস্তুর গুণ কি? এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি মানুষ অপর জীবের থেকে আলাদা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকবেই। সেইরূপ বস্তুর ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেকটি বস্তুর গুণ বিভিন্ন। ফল ও ফুলের গুণ এক নয়। আবার দুটো আমের গুণও পৃথক হতে পারে—একটা আম টক, আর একটা মিষ্টি; একটা ল্যাংড়া আর একটা হয়ত ফজলি; একটার রং হলদে, আর একটা সবুজ; একটা আম লম্বা, আর একটা বেঁটে। অতএব একই বস্তুর মধ্যেও বিশিষ্টতার পরিমাণ ও বিন্যাস পৃথক হতে পারে।

বস্তুটি দেখার জন্য, না শোনার জন্য, না আস্বাদন করার জন্য, তা বস্তুর বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে। কোথাও গান হলে কান দিয়ে শুনি, ফুলের

বাগানে ফুল দেখলে আঘ্রাণ নিই, পাকা আম দেখলে তার স্বাদ গ্রহণ করি। অতএব বিভিন্ন বস্তুর গুণ আমরা প্রত্যক্ষণ করি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। বস্তুর এই গুণগত বৈশিষ্ট হল জাতীয় প্রভেদ (Generic difference)।

আবার চোখ দিয়ে নীল, লাল রং দেখি, কান দিয়ে গান শুনি, বাজনাও শুনি, জিহ্বা দ্বারা মিষ্টি তেতো প্রভৃতি স্বাদ উপলব্ধি করি ; নাক দিয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকি, গোবরের গন্ধও শুঁকি। এগুলি হল বস্তুর গুণের বিশিষ্ট পার্থক্য (special difference)।

(২) **তীব্রতা** (intensity) আমরা যেমন বস্তুর গুণ প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ তীব্রতাও প্রত্যক্ষণ করি। আগে বলেছি আমরা লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি রং দেখি। এগুলোকে বলে বস্তুর বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু লাল রং অনেক রকমের হয় না কি ? গাঢ় লাল, ফিকে লাল প্রভৃতিও আমরা দেখি। চাঁপার উগ্র গন্ধ আঘ্রাণ করি আবার যুঁই ফুলের মৃদু সুবাস ও ঘ্রাণ করি। সমুদ্রের গর্জনও শুনি আবার ফিসফিস আওয়াজও শুনি। এগুলি হ'ল বস্তুর তীব্রতাবোধ।

এই তীব্রতাবোধের কিন্তু একটা সীমা আছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধরা দেয় না এমন কত বস্তুই ত জীব জগতে বিরাজ করছে। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু আছে যাদের খালি চোখে দেখা যায় না আবার কত বিশাল সমুদ্র আছে যার পরপারে আমাদের দৃষ্টি চলে না। সেইরূপ খুব ক্ষীণ শব্দ আমরা শুনতে পাই না। দৃষ্টির তীব্রতা প্রত্যক্ষণের যেমন একটা সীমানা আছে, শ্রুতিরও সেইরূপ সীমানা আছে। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও উদ্দীপনা গ্রহণের নিম্নতম সীমানাকে বলে সংবেদনের দরজা (Threshhold of sensation) আর উচ্চতম সীমানাকে বলে সংবেদনের উচ্চতা (Height of sensibility)।

আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সীমানার পার্থক্য থাকতে পারে। যে দৃশ্য আমি দেখতে পাই না, তুমি হয়ত তা পাও। আবার আমি হয়ত বড় আকারের জিনিষ তোমার চেয়ে ভালো দেখি।

(৩) **বিস্তৃতি** (Extensity)—বহির্জগতে ছড়িয়ে আছে কত বস্তু। এই বস্তুর আকার আছে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা প্রভৃতি আছে। একটি বস্তু আবার বড় হতে পারে ছোট হতে পারে। এত গেল দর্শন সংবেদনের কথা কিন্তু স্পর্শ সংবেদনেরও বিস্তৃতি আছে। যেমন তোমার পিঠে একটা আঙুল রাখলে যতটুকু

স্থান জুড়ে তোমার স্পর্শ সংবেদন হয়, পাঁচটা আঙুল রাখলে তার স্থান ব্যাপ্তি বেশী হবে। একেই আমরা বলব বিস্তৃতি সংবেদন। বেশীর ভাগ বিস্তৃতির সংবেদন হয় চোখ ও ত্বকের সাহায্যে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চেয়ে অন্ধ ব্যক্তির বিস্তৃতি সংবেদন বেশী হয় ত্বকের সাহায্যে। জার্মান মনোবিদ লজ স্থানীয় চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের চোখের অক্ষিপটে বা ত্বকে এইরূপ চিহ্ন বা বিন্দু আছে। এই বিন্দুগুলির একটি বিশিষ্ট গুণ আছে। এদের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যেকটি বিন্দুর বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উপলব্ধি করি। আমাদের চোখের অক্ষিপটে বা ত্বকে সহ-অবস্থানকারী যতগুলি বিন্দু উত্তেজিত হয় ততটা জুড়ে আমরা বিস্তৃতির অনুভূতি পাই। এই স্থানীয় চিহ্ন একটি আর একটির থেকে পৃথক। গতি-সংবেদন বা নড়াচড়ার সাহায্যে এই বিন্দুগুলির স্থানীয় সম্বন্ধ বুঝতে পারা যায়।

স্থানীয় দ্বার (Spatial threshhold) :—চামড়ার উপর যদি কোন ছুঁচলো জিনিষ বা কম্পাসের দুটো কাঁটা ঠেকান হয় তাহলে ওই দুটি কাঁটাকে একটি মনে হতে পারে, দুটিও মনে হতে পারে। দুটি বিন্দু বলে বুঝতে পারার নিম্নতম দূরত্বকে স্থানীয় দ্বার বলে (aesthesiometric index)। এস্থেসিও-মিটার নামক যন্ত্র দিয়ে এই পরীক্ষা করা যায়। এই যন্ত্রে এক জোড়া কম্পাস থাকে, এর সঙ্গে একটি বৃত্তাকার ধাতব পদার্থ থাকে তাতে স্কেল খোদাই করা থাকে।

(৪) **স্থায়িত্ব** (Duration) :—আমরা বস্তু প্রত্যক্ষণ করি কিন্তু অনন্তকাল ধরে তা করি না। বস্তু প্রত্যক্ষণের একটা স্থায়িত্ব আছে। আমরা অনেকক্ষণ ধরে একটা জিনিষ প্রত্যক্ষণ করি আবার অল্পক্ষণ ধরেও প্রত্যক্ষণ করতে পারি। একেই আমরা বলব স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষণ।

স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষণের দুটো দিক আছে—একটা হল কতক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষণ করছি আর একটা হল পরিবর্তন। পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সদা পরিবর্তনশীল জগতের বৈশিষ্ট্যই হল চলমানতা। একদিকে প্রত্যক্ষ বস্তু ক্ষণস্থায়ী অপর দিকে আমাদের মনঃসংযোগের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। মনে কর একখণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে আছ, এই মেঘ মুহূর্ত্ত পরে সরে যেতে পারে আবার তোমার চোখও ঐ এক খণ্ড মেঘ থেকে আকাশের সর্ব্বত্র বিচরণ করতে পারে। এখন যে জিনিষের উপর আমি মনোনিবেশ করেছি তাই হল

আমার বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান প্রতি মুহূর্ত্তে অতীতের পথে ধাবিত হচ্ছে, আজকের ভবিষ্যত, কাল বর্ত্তমানে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সত্যকার বর্ত্তমানকাল কতটুকু? কোথায় টানব এর সীমারেখা? পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের মনোনিবেশের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যে মুহূর্ত্তে একটা জিনিষ থেকে আর একটা জিনিষে মনোযোগ দিচ্ছি, সেই মুহূর্ত্তে পূর্বোক্ত ঘটনাটি অতীতে পরিণত হচ্চে। এই যে অতি ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান, একে বলে **অনুভূত বর্ত্তমান** (sensory present) বা **তাৎক্ষনিক বর্ত্তমান** (immediate present)। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন এই অনুভূত বর্ত্তমানের পরিধি ৪।৫ সেকেণ্ডের বেশী নয়।

আবার উত্তেজকের প্রকৃতির উপরও এই অনুভূত বর্ত্তমান দীর্ঘ হবে বা প্রস্থ হবে তা নির্ভর করে। উত্তেজকটি কোন্ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে তাও দেখতে হবে। আবার একটি অভিজ্ঞতা হবার পরই আমরা অন্যত্র মনোনিবেশ করি। একটি ঘটনা শেষ হওয়া মাত্র আমরা ঘটনান্তরে মন দিই। কোন ঘটনাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে ছেদ নেই। এর থেকে আমরা কালপ্রবাহের ধারণা করতে পারি।

আবার একই সময় আমাদের মানসিক অবস্থাভেদে দীর্ঘ হতে পারে। ক্লাসের ঘণ্টা যেন শেষ হতে চায় না কিন্তু টিফিনের ঘণ্টাটী বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। সুখের দিনগুলো ক্ষণস্থায়ী মনে হয় আর দুঃখের দিন যেন কাটতে চায় না।

সংবেদনের শ্রেণী-বিভাগ

(Classification of sensation)

সংবেদনকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি।

১। **বিশেষ সংবেদন** (Special sensation):—পাঁচটি ইন্দ্রিয় আমাদের যে সংবেদন দেয় তাকে বলে বিশেষ সংবেদন বাইরের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে। ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিশেষ সংবেদন পাঁচ প্রকার—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদন।

বিশেষ সংবেদন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাবে।

২। যান্ত্রিক সংবেদন। (Organic sensation) :—শরীরের অভ্যন্তরে কত যন্ত্র আমাদের অজ্ঞাতে কাজ করে চলেছে। ফুসফুস স্বতঃই স্ফীত ও সঙ্কুচিত হচ্ছে, হৃৎপিণ্ড তালে তালে স্পন্দিত হচ্ছে, পরিপাক যন্ত্র নিয়মিত ক্রিয়া করে চলেছে। এই সমস্ত ক্রিয়ার ফলে যে সংবেদন হয় তাকে বলে যান্ত্রিক সংবেদন। একে আন্ত্রিক (Visceral sensation) সংবেদনও বলে। শরীর অসুস্থ না হলে বা এই যন্ত্রগুলি বিকল না হলে এই সংবেদন হয় না। সাধারণ ভাবে এই সংবেদন হয় না। খুব ভাল লাগা বা শরীর খারাপ বোধ করা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদন। অনেক সময় খুব আনন্দে বা খুব দুঃখে আমাদের কোন যন্ত্র বেশী কাজ করে ও আমরা সেইরূপ সংবেদন পাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক সুখানুভূতি ও দুঃখানুভূতিকে আন্ত্রিক সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বদ্ধ ঘরের অনুভূতি পাই শ্বাসযন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার জন্য। আবার গরমে বা ক্লান্তিতে গলাটা শুকিয়ে যায় একে আমরা বলি তৃষ্ণা। গা বমি বমি ভাব ক্ষুধা প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া জনিত হতে পারে। অনেকে আমাদের হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি আবেগকে এই সংবেদনের অন্তর্ভূত করেছেন।

পেশী সংবেদন (Muscular sensation) :—পূর্বে আমাদের নড়াচড়া প্রভৃতির অনুভূতিকে ত্বকজাত সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করা হত। কিন্তু বহু গবেষণার পর এখন পেশী সংবেদনকে ত্বকজাত সংবেদন থেকে পৃথক করা হয়েছে। পেশী, তন্তু ও আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগ স্থল যেমন কনুই, হাঁটু প্রভৃতিতে পেশী সংবেদন পাওয়া যায়।

পেশী সঙ্কোচনের ফলে এই সংবেদন হয়ে থাকে। দাঁড়াবার বা বসবার ভঙ্গীর চলাফেরা কিম্বা বাধা ঠেলে ভারী জিনিষ সরানো বা তোলা প্রভৃতি কাজের সময় আমাদের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং সেই খবর স্নায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌছায়। ওজনের উপলব্ধি, বস্তু দৃঢ়বদ্ধ অথবা আলগা, কঠিন কি কোমল, শক্ত না নমনীয় ইত্যাদি অনুভব করে আমরা একটি বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। এগুলি হয় পেশী সংবেদন ও ত্বক জাত সংবেদন উভয় প্রকার সংবেদনের সহায়তায়।

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই পেশী সংবেদনের প্রয়োজন আছে।

লোকোমোটার এ্যাটেক্সিয়া (Locomotor ataxia) নামে এক প্রকার রোগ হয় পেশী সংবেদক স্নায়ুর গোলযোগের জন্য। এই রোগ হলে দাঁড়াবার বা বসবার ভঙ্গী বিকৃত হয় এবং চলফেরা নড়াচড়া সুনিয়ন্ত্রিত হয় না।

স্বাদ ও ঘ্রাণের সংবেদন
(Sensations of taste and smell)

দর্শন ও শ্রবন সংবেদনের মত স্বাদ ও ঘ্রাণের সংবেদন অত জটিল নয়। দর্শন ও শ্রবণ সংবেদনের উত্তেজক দূরে থাকে কিন্তু ঘ্রাণ ও স্বাদ সংবেদনের জন্য উত্তেকজটিকে নিকটে রাখতে হয় অথবা স্পর্শ করতে হয়।

স্বাদ সংবেদন ঘ্রাণ সংবেদনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। ঘ্রানেন্দ্রিয় সাহায্য না করলে আমাদের অধিকাংশ আহার্য্য দ্রব্য স্বাদহীন মনে হত। দুই নাকে তুলো দিয়ে চোখ বন্ধ করে যদি একটুকরো পেঁয়াজ, আলু কিম্বা আপেল মুখে দেওয়া হয় তাহলে কোনটা কি বলা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে। ঘ্রানেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত চা, কফি আর কুইনাইনের স্বাদ এক রকম মনে হত। এই জন্য সর্দির সময় নাক বন্ধ হওয়ার ফলে সব খাদ্যই স্বাদহীন মনে হয়।

স্বাদ সংবেদন
(Gustatory sensations)

জিভের সাহায্যে আমরা স্বাদের সংবেদন পাই। আমাদের জিহ্বাতে লক্ষ্য করলে অসংখ্য ছোট ছোট উঁচু ঢিপি মত বা ফুসকুড়ি দেখা যায়—এগুলোকে প্যাপিলি (Papillae) বলে। এই প্যাপিলি চার প্রকারের :—

(১) ফুঞ্জিফর্ম (Fungiform) এগুলোর লাল রং দেখলে সহজে চেনা যায় এগুলো জিহ্বার ডগায় ছড়িয়ে থাকে।

(২) সারকামভ্যালেট প্যাপিলি (Circumvallate) :—এগুলো দেখতে বদ্বীপের মত, জিহ্বার গোড়ায় ছড়িয়ে থাকে।

(৩) ফ্যালিয়েট প্যাপিলি (Faliate) এগুলি জিহ্বার দুপাশে থাকে।

(৪) পিলফর্ম প্যাপিলি (Pilform)—জিভের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।
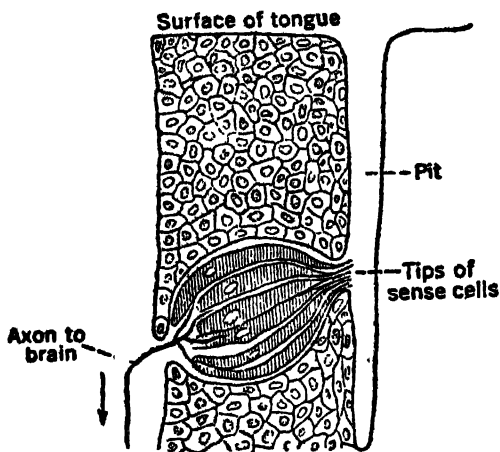
এক একটি প্যাপিলিতে অনেকগুলি করে স্বাদকোরক থাকে (Taste bud)। এই স্বাদকোরকগুলি ডিম্বাকৃতি। এতে তিনটি করে স্বাদকোষের স্তর আছে। বাইরের কোষগুলি (Outer cells) ভেতরের কোষকে আবরণ দিয়ে রক্ষা করে। মধ্যের স্তরটি ভেতরের স্তরকে ধরে রাখে। একেবারে ভিতরের স্তরে স্বাদের প্রকৃত অনুভূতি হয়। এই কোষের শেষভাগ থেকে সরু চুলের মত তন্তু বেরিয়ে থাকে জিভে। প্রত্যেক স্বাদকোষে কতগুলি করে সংগ্রাহক কোষ থাকে। এই কোষগুলি স্নায়ুতন্তুর দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত।

স্বাদের উত্তেজক তরল না হলে স্বাদের অনুভূতি হয় না। এই জন্য আমাদের স্বাদেন্দ্রিয়ের কাছে আছে কতগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি; এই গ্রন্থিরস আমাদের খাদ্যকে তরল করতে সাহায্য করে।

জিহ্বা যে কেবল স্বাদ সংবেদন গ্রহণ করে তা নয়। জিহ্বাতে স্পর্শের সংবেদন ও উত্তাপ শৈত্য ইত্যাদির অনুভূতিও হয়। এক টুকরো বরফ মুখে দিলে শৈত্য সংবেদন হয়, মাখনের মোলায়েম স্পর্শে স্পর্শানুভূতি হয়।

ছোট ছেলেদের স্বাদের স্থান জিহ্বার প্রায় সবটা জুড়ে থাকে। বয়স্ক লোকের জিহ্বার মধ্যস্থলে স্বাদের অনুভূতি হয় না।

স্বাদের অনুভূতি চার প্রকারের—মিষ্টি, টক, তেতো ও লবণ। কোন

প্যাপিলিতে মাত্র এক রকমের স্বাদ সংবেদন হয়, কোনটা দুই বা ততোধিক স্বাদের অনুভূতি দেয়। জিহ্বার ডগায় মিষ্টি স্বাদ বেশী, জিহ্বার গোড়ায় অনুভূত হয় তিক্ত স্বাদ। জিহ্বার দুইপাশে টক ও লবনের স্বাদ সবচেয়ে বেশী।

জিহ্বার গোড়ায় ও ডগায় মাত্র এক রকমের স্বাদ অনুভূত হয় সেইজন্য দেখা যায় একই জিনিষ জিহ্বার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্বাদের অনুভূতি দেয়।

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জিহ্বার গোড়ায় তেতো আর জিহ্বার ডগায় মিষ্টি লাগে।

স্বাদ সংবেদনের পরীক্ষার সময় চোখ বন্ধ রাখতে হয় ও নাকে তুলো দিতে হয়। জিহ্বা যথা সম্ভব বেরিয়ে থাকবে। যতক্ষণ না স্বাদ নির্ণয় করতে পারবে ততক্ষণ অভীক্ষার্থী জিহ্বা সরাবে না। স্বাদ নির্ণয়ের জন্য খাদ্য বস্তুর উত্তাপ ৪০° ফাঃ এর বেশী বা কম না হওয়া ভাল। কারণ অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা খাবারে স্বাদকোষগুলি অসাড় হয়ে যেতে পারে।

বর্ণসংবেদন আলোচনার সময় আমরা দেখব যে একটা রং আর একটা রংকে লুপ্ত করে। স্বাদের ক্ষেত্রেও এরূপ হওয়া সম্ভব। একপ্রকারের স্বাদ আর একপ্রকারের স্বাদকে লুপ্ত করে দিতে পারে এবং তখন খাদ্যবস্তু আমাদের কাছে স্বাদহীন বোধ হবে। লবণ ও মিষ্টদ্রব্য পরিমাণমত মেশালে দুটো স্বাদই লোপ পেতে পারে। ফলের টক চিনি মেশালে লুপ্ত হয়ে যায়। স্বাদের এইরূপ পরস্পরকে বিলুপ্ত করাকে বলে কম্‌পেনসেশন (Compensation)। অনেক সময় আবার একটা স্বাদ আর একটাকে লোপ না করে পর পর দুটো স্বাদ দিতে পারে। একে বলে রাইভালরি (Rivalry)।

স্বাদ বৈসাদৃশ্য (Taste contrast) :—বর্ণের মত স্বাদ সংবেদনেরও বৈসাদৃশ্য বা বৈপরীত্য থাকতে পারে। চোখ ও নাক বন্ধ করে জিহ্বার একদিকে যদি এক ফোঁটা দ্রবীভূত লবণ ফেলে দিয়ে, আর এক পাশে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ (Distilled) জল ফেলে দেওয়া হয় তাহলে বিশুদ্ধ জলটা মিষ্টি হবে।

কয়েকটি ওষুধ খেলে জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কোকেন সাময়িকভাবে জিহ্বাকে স্বাদহীন করে দেয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে এরকম পাতা আছে সেগুলো চিবোলে জিহ্বার মিষ্টি ও তিক্ত স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা সাময়িকভাবে চলে যায়।

স্বাদের সীমানা (Threshold for taste) :—সব মানুষের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা এক নয় আর তীব্রতাও এক নয়। আবার চার রকমের স্বাদ আছে তাদেরও প্রত্যেকটির তীব্রতার সীমানা আছে। স্বাদের সীমানা বার করবার একটা প্রণালীর কথা আলোচনা করা যাক। দশ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে মেশাও। এর প্রত্যেক ঘন সেন্টিমিটার জলে তখন লবণ থাকবে '০১ গ্রাম। এই দ্রবণের ১০ ঘন সেন্টিমিটার নিয়ে জল মিশিয়ে ১০০ ঘন সেন্টিমিটার করা হল। এই দ্রবণের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে তখন লবণের পরিমাণ হবে '০০১ গ্রাম। এইভাবে আমরা '০০২, '০০৩, '০১, '০২ ইত্যাদি অনেকগুলি দ্রবণ প্রস্তুত করিতে পারি। এইবার অভীক্ষার্থীর জিভে ঐ দ্রবণের ফোঁটা ফেলে তার স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতার সীমানা পরিমাপ করতে পারি। দ্রবণ পরিবর্তন করতে করতে এমন একটি দ্রবণ পাওয়া যাবে যে, তার চেয়ে কম দ্রবণের স্বাদ গ্রহণ করতে অভীক্ষার্থী অক্ষম।

ঘ্রাণ সংবেদন (Olfactory sensation)

আমাদের ঘ্রাণ ও স্বাদ সংবেদন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। তাই বোধ হয় বাংলায় প্রবাদ আছে ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্। কিন্তু এই ঘ্রাণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। রং দেখে আমরা সহজেই বলে দিই ওটা লাল, নীল ; গোলাপের রং বা অপরাজিতার রং বলি না। স্বাদের ক্ষেত্রেও তাই, মিষ্টি, তেতো ইত্যাদি বলে সংবেদনের পার্থক্য করি। কিন্তু ঘ্রাণ সংবেদনের সময় আমরা এভাবে শ্রেণীকরণ করতে পারি না। গন্ধটা সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ এইটুকু মাত্র বলতে পারি। কিন্তু অন্য একভাবে আমরা ঘ্রাণ সংবেদনের বিভিন্নতা প্রকাশ করি। গোলাপের গন্ধ, এলাচের গন্ধ, গোবরের গন্ধ ইত্যাদি। আবার মিষ্ট গন্ধ, টক গন্ধ, ইত্যাদি বলে কখনও কখনও স্বাদের সঙ্গে ঘ্রাণকে জড়িয়ে ফেলি।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়

আমাদের নাসারন্ধ্রের একেবারে উপরের দিকে ঘ্রাণ গ্রহণের কেন্দ্র অবস্থিত। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে দুই প্রকার স্নায়ু আছে। একপ্রকার স্নায়ু আছে

যেগুলি ঘ্রাণ গ্রহণ করে না কিন্তু উত্তেজিত হলে নাকে সুড়সুড়ির সংবেদন জাগায় কিম্বা লঙ্কার ঝাল লাগলে জ্বালা করার অনুভূতি ইত্যাদি ঘটায়। অপর দলের স্নায়ু ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

নাকের মধ্যে একেবারে ওপরের দিকে দুটো ছোটো ছোটো জায়গা আছে, এগুলো নাকের ভেতর একপাশে অবস্থিত এবং একপ্রকার থলথলে পদার্থ দিয়ে আবৃত। ইংরাজীতে একে বলে এপিথেলিয়াম (Epithelium)। এই
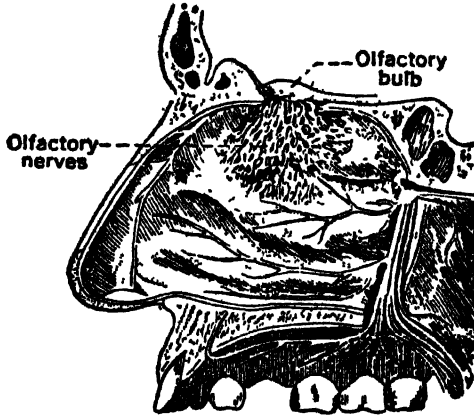
এপিথেলিয়ামের মধ্যে আছে অসংখ্য গন্ধ স্নায়ুকোষ। এইসব স্নায়ুকোষে ছোট ছোট চুল (Cilia) আছে। এপিথেলিয়ামগুলো একেবারে উপরের দিকে অবস্থিত হওয়ার জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় এখানে বাতাসের খুব সামান্য অংশ যেতে পারে। সেইজন্য কোন সুখকর গন্ধ আঘ্রাণ করার সময় আমরা জোরে শ্বাস গ্রহণ করি। দুর্গন্ধ এড়িয়ে চলার জন্য ধীরে ধীরে শ্বাস নিই।

গন্ধদ্রব্য থেকে অতি ক্ষুদ্র গন্ধকণা আমাদের শ্বাস গ্রহণের সময় চুলগুলিকে উদ্দীপ্ত করে। সাধারণতঃ বলা হয় দ্রব্যের তরল অবস্থায় আমাদের গন্ধ সংবেদন হয় না। এই কনাগুলি এপিথেলিয়ামে বায়বীয় অবস্থায় পৌঁছালে ঘ্রাণ সংবেদন হয়। ওয়েবার (Weber) সাহেব দুই নাকে জল ভরে গন্ধ আঘ্রাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন গন্ধই পান নি। কিন্তু অন্য

লবণাক্ত জল নাকে ভরে রাখার পর গন্ধের সংবেদন পেয়েছিলেন। তাছাড়া মানুষের ঘ্রাণ গ্রহণ কেন্দ্র সব সময় তরল শ্লেষ্মাতে ভরা থাকে। সেইজন্য হাণ্টার (W. S. Hunter) সাহেব বলেছেন গন্ধদ্রব্যের কণা তরল ও হতে পারে। তবে সাধারণতঃ বলা হয় ফুলের বায়বীয় কণাই আমাদের গন্ধ স্নায়ুকোষে পৌছায় ও এক ধরণের রাসায়নিক ক্রিয়া করে, ফলে গন্ধ স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয় এবং এই খবর স্নায়ুকোষ বেয়ে মস্তিষ্কের ঘ্রাণাঞ্চলে যায় এবং আমরা গন্ধ পাই।

ঘ্রাণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of olfactory sensation)

ঘ্রাণের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। দেহতত্ত্ববিদ্, জার্ডমেকার (Zwaarde Maker) প্রথম গন্ধ সংবেদনের নয়টি শ্রেণীবিভাগ করেন।

(১) ইথারের গন্ধ (Ethereal smell) :—ফুলের গন্ধ, মোমের গন্ধ প্রভৃতি।

(২) অমৃতের গন্ধ (Aromatic smell) :—কর্পূর, লেবু ও গোলাপের গন্ধ।

(৩) মিষ্টি গন্ধ (Fragrant smell) :—কমলালেবু ও ভ্যানিলার গন্ধ।

(৪) উপাদেয় গন্ধ (Ambrosiac smell) :—তৈলস্ফটিক ও মৃগনাভির গন্ধ।

(৫) পচা গন্ধ (Allyle-cacodyle smell) :—মাছের গন্ধ, হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ প্রভৃতি।

(৬) পোড়া গন্ধ (Burning smell) :—তামাকের ধোঁয়ার গন্ধ, রুটি সেঁকার গন্ধ।

(৭) বোটকা গন্ধ (Hircine smell) :—ঘামের গন্ধ, পনীরের গন্ধ প্রভৃতি।

(৮) উগ্র গন্ধ (Virulent smell) :—সমস্ত মাদক দ্রব্যের গন্ধ।

(৯) গা গোলানো গন্ধ (Nauseating smell) :—সমস্ত পচা ও গলা জিনিষের গন্ধ।

পরবর্তীকালে হেন্নিং গন্ধ সংবেদন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং গন্ধের ছয়টি শ্রেণীবিভাগ করেন।

(১) ফলের গন্ধ—লেবু।

(২) ধুনা বা রজনের গন্ধ।

(৩) পোড়া গন্ধ—আলকাতরা।

(৪) পিউট্রিড—গলিত ও পচা দ্রব্যের গন্ধ।

(৫) মশলার গন্ধ—জায়ফলের গন্ধ।

(৬) ফুলের গন্ধ।

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। অনেক গন্ধ আছে যেগুলো আসলে কোন গন্ধই নয়। অ্যামোনিয়ার কোন গন্ধ নেই, স্পর্শ সংবেদনের জন্য ইহা বিরক্তিকর অনুভূতি দেয়।

ঘ্রাণ-গ্রহণের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কোন কোন ব্যক্তির আদৌ ঘ্রাণ গ্রহণ ক্ষমতা থাকে না, এই রোগকে এ্যানস্‌মিয়া (Anosmia) বলে। এ্যানস্‌মিয়া জন্মগতও হতে পারে, অর্জিতও হতে পারে। আবার অনেক ব্যক্তি আছে যারা কোন কোন জিনিষের গন্ধ পায় না। কেউ কেউ প্রুসিক এ্যাসিডের গন্ধ পায় না আবার কেউ বা বেঞ্জিন অথবা ভ্যানিলার গন্ধ পায় না। গন্ধকোষের বিভিন্নতার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহজেই ক্লান্ত হয়। এক মিনিট যদি একটি ফুলের ঘ্রাণ নিই তাহলে দেখা যাবে গন্ধটা ক্রমশঃ কম জোরালো মনে হচ্ছে শেষে ফুলটার আর গন্ধই পাওয়া যাবে না। অথচ সেই সময় অন্য জাতীয় কোন গন্ধদ্রব্য নাকের সামনে রাখলে তার গন্ধ পাওয়া যাবে। এর থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে অনেকক্ষণ একটা গন্ধ আঘ্রাণ করলে সব গন্ধ স্নায়ুকোষ দুর্ব্বল হয় না, কয়েকটি মাত্র কোষ দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যে গন্ধ আঘ্রাণ করে গন্ধ স্নায়ুকোষ ক্লান্ত হয়েছে, সেই জাতীয় গন্ধ কিন্তু ঐ ক্লান্ত কোষগুলি পুনরায় সজীব না হওয়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

অনুক্রমিক গন্ধ (Successive smell)

গন্ধ জটিল হওয়ার জন্য আমরা আর একটি জিনিষ সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। কিছুক্ষণ কর্পূর তেলের ঘ্রাণ নেবার পর প্রথমে তারপিন তেলের গন্ধ

এবং পরে জায়ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় তারপিন তেলে অন্ততঃপক্ষে দুই প্রকার গন্ধ-কণিকা আছে। একটি (তারপিন তেল) আমাদের গন্ধকোষকে ক্লান্ত করার পর আমরা দ্বিতীয়টির (জায়ফলের) গন্ধ পাই। একে বলে অনুক্রমিক গন্ধ।

ত্বকজাত সংবেদন (Cutaneous sensation or tactual sensation)

ত্বকজাত সংবেদন সর্বাপেক্ষা আদিম সংবেদন। নিম্নেতর প্রাণীরও এই সংবেদন হয়ে থাকে। আমাদের ত্বকে বিশেষ বিশেষ উত্তেজককে সাড়া দেওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ সংগ্রাহক আছে। চাপ, তাপ, শৈত্য, উষ্ণতা, যন্ত্রণা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতির জন্য বিভিন্ন স্নায়ুকোষ কাজ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ত্বক থেকে আমরা চার প্রকারের অনুভূতি পাই, শৈত্য, উষ্ণতা, যন্ত্রণা ও চাপ।

(ক) শৈত্য ও উষ্ণতার অনুভূতিঃ—এইগুলিকে আমরা তাপ সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কোন উষ্ণ বা শীতল দ্রব্য ত্বক স্পর্শ করলে আমরা উষ্ণতা অথবা শৈত্যের অনুভূতি পাই। উষ্ণ দ্রব্য তরল, বায়বীয় ও কঠিন হতে পারে। ক্রজ করপাসলস্ (Krause Corpuscles) আমাদের শৈত্যের অনুভূতি দেয় এবং রুফিনি (Ruffini) দেয় উষ্ণতা সংবেদন —এই স্নায়ুকোষগুলো ত্বকের গভীরে থাকে, সেইজন্য শৈত্যের সংবেদন যত তাড়াতাড়ি হয়, উষ্ণতার সংবেদন তত তাড়াতাড়ি হয় না। উষ্ণ বিন্দু অপেক্ষা শৈত্য বিন্দু সংখ্যায় অনেক বেশী।

(খ) যন্ত্রনা বিন্দুঃ—ত্বকের বিভিন্ন অনুভূতি বিন্দুর মধ্যে যন্ত্রণা বিন্দু সবচেয়ে বেশী। ত্বকের কোন স্থান কেটে গেলে বা কিছু বিঁধে গেলে আমরা ব্যথা পাই। আবার অত্যধিক শীত, অতিরিক্ত গরম বা খুব বেশী তাপের জন্য আমরা যন্ত্রণা অনুভব করি। স্নায়ুতন্তু ত্বকের বহিস্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করবার পর এর বহিরাবরণ নষ্ট হয়ে পড়ে ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং এপিডারমিসের কোষগুলিতে প্রবেশ করে। চোখের অচ্ছোদপটলে যন্ত্রণা বিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী।

(গ) চাপ ও স্পর্শানুভূতিঃ—মেইজনার করপাসল (Meissner Corpuscles) ও প্যাসিনি (Pacini) এবং চুলের গোড়ার স্নায়ুপ্রান্ত আমাদের চাপ ও স্পর্শের অনুভূতি দেয়। আঙুলের ডগায় স্পর্শ বিন্দু বেশী

থাকে। জে. বি. ওয়াটসন বলেছেন প্রতি বর্গ সেঃ মিঃ স্থানে গড়ে প্রায় ২৫টি অনুভূতি বিন্দু থাকে তবে সেগুলো কোথাও ৭টি হতে পারে, কোথাও আবার ৩০০ হতে পারে।

হাতের ওপর কিছুটা জায়গা নিয়ে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে সব জায়গায় সব অনুভূতি পাওয়া যাবে না। এ নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন আমাদের ত্বকের কতগুলি বিন্দু দেয় তাপের অনুভূতি, কতগুলি দেয় শৈত্যের অনুভূতি, আবার কতগুলি দেয় বেদনার অনুভূতি। শৈত্য বিন্দুতে উষ্ণতা বা বেদনারবোধ হয় না। অনেক পরে ভন ফ্রে (Von Frey) পরীক্ষাগারে এ নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি হেয়ার হোল্ডারে ঘোড়ার চুল আটকে ত্বকের প্রতিটি বিন্দুতে স্পর্শ করে দেখিয়েছেন যে সবগুলিতে স্পর্শ সংবেদন হয় না।

তাপ ও শৈত্যের পরীক্ষার জন্য একটা ধাতব সিলিণ্ডার (Cylinder) ব্যবহার করা হয়। ঐ সিলিণ্ডারটি ঠাণ্ডা বা গরম জলে ডুবিয়ে ত্বকের কোন অংশে ঠেকিয়ে যেতে হয়। দেখা যাবে যে বিন্দুতে উষ্ণতার সংবেদন হয় সে বিন্দুতে শৈত্যের অনুভূতি হয় না।

ত্বকের গঠন (Structure of the skin)

যদি আমরা ত্বকের কিছুটা পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো যে এর নীচে আছে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু। এইগুলিকে ত্বকজাত সংবেদনের সংগ্রাহক বলা হয়।

এই ত্বকের উপরের অংশকে বলে এপিডারমিস (Epidermis) আর নীচের অংশটাকে বলে ডারমিস (Dermis)। বিভিন্ন স্নায়ুতন্তুগুলো মিলিত হয়েছে ডারমিসের নীচে। এগুলো সব লোমের গোড়ার সঙ্গে মিলেছে। ত্বকে নানা রকমের স্নায়ুতন্তু দেখা যায়।

(১) ক্রজ করপাসলস্ :—কপালে ও চোখের পাতার ভিতরের দিকে ক্রজ করপাসলস্ এর সংখ্যা বেশী। এগুলো দেখতে গোল বলের মত। এগুলি শৈত্যের অনুভূতি দেয়।

(২) মেইজনার ও প্যাসিনি করপাসলস্ :—এগুলো স্পর্শের অনুভূতি দেয়। লোমবিহীন স্থানে মেইজনার একমাত্র সংগ্রাহক। আঙুলের ডগায়

সেইজন্যায় কর্পাসলস্ খুব বেশী, তাই এখানে স্পর্শানুভূতি ও খুব বেশী। প্যাসিনিয়ান কর্পাসলস স্প্রিংএর মত জড়ানো থাকে।
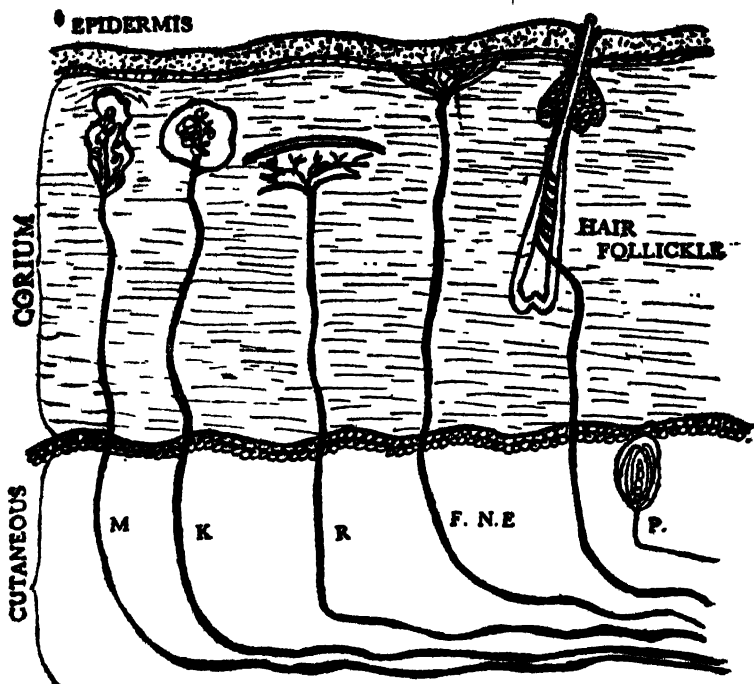
ত্বকের গঠন

(৩) স্নায়ু তন্তুর মুক্ত প্রান্ত :—(Free end of nerve fibre) এগুলো যন্ত্রণার অনুভূতি দেয়। চোখের কর্নিয়াতে এই স্নায়ুপ্রান্ত খুব বেশী।

(৪) রুফিনি কর্পাসলস্ :—গালে রুফিনির সংখ্যা অধিক। এগুলো উষ্ণতার অনুভূতি দেয় সেইজন্য আমরা গালে বেশী গরম বোধ করি। এগুলো দেখতে পদ্ম পাতার মত।

দেখা গেছে আমাদের ত্বকে প্রায় ২৪ লক্ষ যন্ত্রণা বিন্দু, আধ লক্ষ স্পর্শ ও শৈত্য বিন্দু আর কিছু কম উষ্ণ বিন্দু আছে।

উষ্ণ বিন্দু থেকে আমরা উষ্ণতার অনুভূতি পাই। কিন্তু দেখা গেছে যে যদি একটি শৈত্য বিন্দুতে ৪৫° সেঃ থেকে ৫০° সেঃ পর্য্যন্ত উষ্ণ সিলিণ্ডার

ঠেকান হয় তাহলেও আমরা শৈত্যের অনুভূতি পাই। একে বলে প্যারাডক্সিক্যাল শৈত্যবিন্দু (Paradoxical cold sensation), প্যারাডক্সিক্যাল উষ্ণ বিন্দু কিন্তু পাওয়া যায় না।

আমরা বলেছি স্নায়ুর মুক্ত প্রান্ত আমাদের বেদনার অনুভূতি দেয়। কিন্তু উত্তেজক যদি তীব্র হয় তাহলেও আমরা যন্ত্রণার অনুভূতি পাই। হঠাৎ খুব গরম জিনিষ ত্বকে রাখলে আমরা যন্ত্রণা অনুভব করি।

কোন ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করা হলে সে সেই অঙ্গে ব্যথা পায়। উপরে যে বেদনার কথা বলা হল তা এর অন্তর্ভুক্ত। একে বলে বেদনার বিস্তার (Propagation of pain)। আবার এক স্থানে যন্ত্রণা হলে অন্য স্থানেও ব্যথা পাই; যেমন চোখ খারাপ হলে মাথা ধরে।

সুড়সুড়ি বা ঝিন্ ঝিন্ করার অনুভূতিকেও এই ত্বক জাত সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শ্রবণ সংবেদন (Hearing)

বিচিত্র এই জগতে বহু বিচিত্র রূপ উপভোগ করে মানুষ তার চোখের সাহায্যে। কিন্তু এই মহাবিশ্বে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করছে কত সুর, কত সঙ্গীত, কত শব্দ। কোটি কোটি মানুষের মনের ভাব রূপায়িত হচ্ছে ভাষায়। মানব হৃদয়ের বহুবিধ অনুভূতিকে রূপ দান করার জন্য আছে ভাষা, আর সেই ভাষাকে ব্যক্ত করার জন্য আছে জিহ্বা এবং সেই শব্দকে, ভাষাকে উপলব্ধি করার জন্য আছে তার কর্ণেন্দ্রিয়। সেই কান সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব।

কর্ণ (Ear)

গঠনের দিক দিয়ে কানকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি :—
(১) বহিঃকর্ন (External ear) (২) মধ্যকর্ন (Middle Ear) ও (৩) অন্তকর্ন (Inner Ear)।

(১) বহিকর্ণ ঃ—কানের বাহিরের অংশটাকে বলে বহিঃকর্ণ। এখানে আছে পিন্না বা কঙ্কা (Pinna বা Concha) ; এই অংশটি ধরেই আমরা কান মলা দিই। এর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, একে বলে কর্ণকুহর।

কর্ণকুহর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে একটি পাতলা পর্দা ; একে বলে কর্ণপটহ (Ear drum) ।
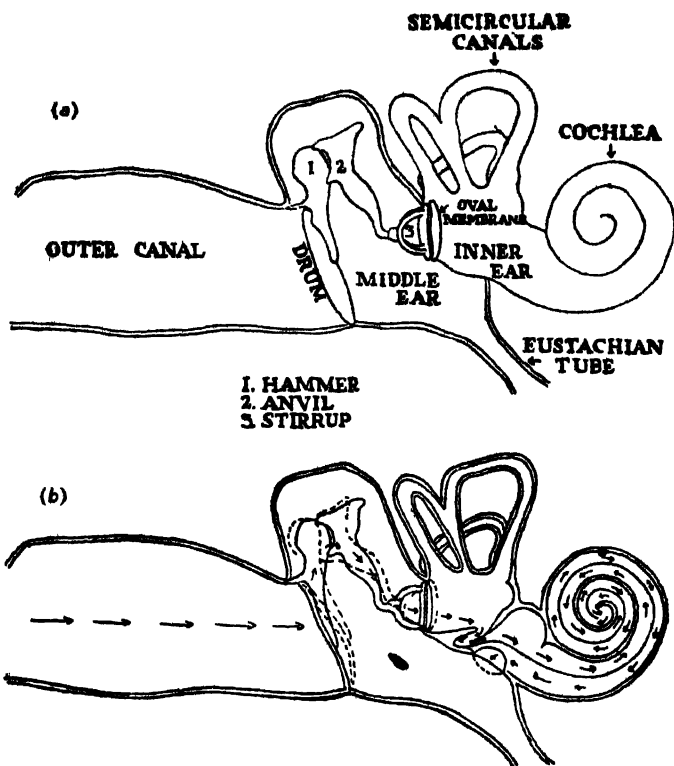
কর্ণ

(২) মধ্যকর্ণ :—কর্ণপটহের পরেই আরম্ভ হয়েছে মধ্যকর্ণ। কর্ণপটহের গায়ে লেপ্টে আছে তিনটে হাড়ের মালা। এগুলোকে একসঙ্গে বলে অসিকল্‌স (Ossicles) বা ক্ষুদ্র অস্থি। এই হাড়গুলির মধ্যে একটির নাম হাতুড়ি (Hammar), একটির নাম নেহাই (Anvil) আর একটির নাম পাদান (Stirrup)। এগুলি যথাক্রমে হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাবীর মত দেখতে তাই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই হাড়গুলির পেছনে আছে একটি পাতলা হাড়ের দেওয়াল। এই দেওয়ালটাই নলের মত নেমে গিয়ে গলার সঙ্গে

মিশেছে। এই নলটিকে বলে (Eustachian tube)। এই দেওয়ালে ছুটো ছিদ্র আছে। একটা ছিদ্র গোলাকৃতি তাই একে বলে (Round window) বা গোলাকৃতি বিবর, অপরটি ডিমের মত আকৃতি বিশিষ্ট বলে একে বলে ডিম্বাকৃতি বিবর (Oval window)

(৩) অন্তকর্ণ ঃ—ইহা একটি ফাঁপা হাড়ের নল ছাড়া কিছুই নয়। এর প্রথমের দিকে আছে তিনটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ফাঁপা নল, এই নল জলে ভর্ত্তি থাকে। অন্তকর্ণের মাঝখানটা একটু মোটা, একে বলা হয় অলিন্দ (Vestibule)। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নলগুলো এখানে এসে মিশেছে। অন্তকর্ণ জলের মত পদার্থে পরিপূর্ণ। এই হাড়ের নলটা পেছনের দিকে শাঁখের মত পেঁচানো, একে বলে (Cochlea) ককলিয়া, এটা একটা ঘোরানো সিঁড়ির মত। ককলিয়ার প্রথম দিকটা একটা পাতলা পর্দা দিয়ে দুভাগে বিভক্ত। এই পর্দাকে বলে ব্যাসিলার মেম্‌ব্রেন (Basilor membrane)। ককলিয়ার শেষের দিকে এই পর্দাটা নেই। ব্যাসিলার মেমব্রেনে আছে অসংখ্য স্নায়ু-শিরা (Nerve)—এগুলোকে বলে কর্টির ইন্দ্রিয় (Organs of Corti); এর ওপর হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোঁয়া আছে। ব্যাসিলার মেমব্রেনের একদিকটা বাঁধা আছে দ্রুতলয়ে, আর এক দিকটা বাঁধা আছে বিলম্বিত লয়ে; পিয়ানোয় যেমন স্বর বাঁধা থাকে অনেকটা সেইরকম। এই ব্যাসিলার মেমব্রেনে যে স্নায়ুতন্তুগুলো লেপ্টে আছে সেগুলো মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। ককলিয়ার গোড়ার দিকের প্যাঁচগুলো ছোট আর বেশ টান টান। ব্যাসিলার মেমব্রেন কিন্তু যতবার প্যাঁচ খেয়েছে ততই দীর্ঘও প্রসারিত হয়েছে। কর্ণকুণ্ডলীর (Cochlea) শেষের দিকে প্যাঁচ যত ভেতরে ঢুকেছে স্নায়ুগুলো তত ঢিলে হয়ে গেছে। কর্ণকুণ্ডলী যতই প্যাঁচ খেয়েছে তত সরু হয়েছে কিন্তু ব্যাসিলার মেমব্রেন যতই ভেতরের দিকে গেছে ততই প্রসারিত হয়েছে।

কানের পর্দায় আঘাত লাগলে বা মধ্যকর্ণের হাড়ের গঠন বিকৃত হলে, অসুস্থতার জন্য বা ডিম্বাকৃতি বিবর আঘাতপ্রাপ্ত হলে মানুষ বধির হয়ে যায়। ককলিয়াতে আঘাত লাগলে বা শ্রবণ স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বধিরতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু অন্তকর্ণের ক্ষতিজনিত বধিরতা সারে না। মধ্যকর্ণের কোন অংশে আঘাত লাগলে যে বধিরতা দেখা দেয় তা সারান যায়; এর জন্য

একটী যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। এই যন্ত্রে শব্দতরঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পর্দায় কম্পন তুলতে সাহায্য করে।

ইউসটেশিয়ান টিউব (Eustachian tube) :—এটা গলা ও নাককে যুক্ত করেছে। এই নল দিয়ে বায়ু চলাচল হয়ে থাকে। এই নল কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে, কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কারণ তখন পর্দার বাইরের বায়ুচাপ ও ভেতরের বায়ুচাপ অসমান হয়।

আমরা কি করে শুনি (How we hear)

আমরা জানি কোন জিনিষ কম্পিত হলে তবে শব্দের সৃষ্টি হয়। বাতাসে এই কম্পনই শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। শব্দতরঙ্গ আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করলে কর্ণপটহ কম্পিত হয় এবং সেই কম্পন হাতুড়ি, নেহাই ও রেকাবীতে ধাক্কা দেয়, রেকাবী তখন ডিম্বাকৃতি বিবরের পর্দায় আঘাত করে। এই পর্দা বা ঝিল্লী তখন অন্তকর্ণে আঘাত করে ; অন্তকর্ণের তরল পদার্থ তখন কম্পিত হয় এবং সেখানে যে সব রোঁয়া আছে সেগুলো কম্পিত হয় এবং স্নায়ুতন্তু উত্তেজিত হয় এবং মস্তিষ্কের শ্রবনাঞ্চলে সংবাদ প্রেরণ করে।

শ্রবণ সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of hearing)

তরঙ্গের মাধ্যম চাই। সাধারণতঃ শব্দতরঙ্গের মাধ্যম হচ্ছে বাতাস। কিন্তু শব্দতরঙ্গ তরল পদার্থের মধ্য দিয়েও বিস্তারিত হতে পারে। এমন কি অন্যান্য পদার্থ যেমন অস্থি বা ধাতব পদার্থও শব্দতরঙ্গ বহন করতে পারে। শব্দতরঙ্গ আলোক তরঙ্গের থেকে অনেক বড় হয়, আর এর গতি আলোক তরঙ্গের থেকে অনেক ধীর।

শব্দতরঙ্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পারে আবার বিশৃঙ্খল হতে পারে। বিশৃঙ্খল শব্দতরঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় গোলমাল আর সুশৃঙ্খল শব্দ থেকে উদ্ভূত হয় স্বর (Tone)। আবার শ্রুত শব্দের প্রকৃতিও ভিন্ন হতে পারে।

তীক্ষ্ণতা (Pitch) :—শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন সংখ্যার উপর (Frequency)। সা-রে গা-মা…র 'সা', 'রে' এর থেকে ভিন্ন, রে, গা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি। কম্পন সংখ্যা যত বেশী হবে, তত তীক্ষ্ণ হবে। শ্রুতির মধ্যে ধরা দেয় এরকম সব চেয়ে শ্রুতিবোধ্য যাদের স্বরের কম্পন সংখ্যা

হল সেকেণ্ডে ২০ আর সব চেয়ে শ্রুতিবোধ্য চড়া' সুরের কম্পন সংখ্যা হল ২০,০০০।

শৈশবে মানুষ চড়া সুর খুব ভাল শুনতে পায়। ২৫ বছর বয়সের পর চড়া সুর শুনবার ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে আসে। অনেক জীবজন্তুর চড়া সুরের সংবেদন খুব তীব্র। আবার এক Pitch থেকে আর একটি Pitch এর পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা সব মানুষের সমান নয়। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ এ বিষয়ে কুকুরের কাছে হার মানে। সেকেণ্ডে ৫০০ থেকে ৫০০০ কম্পনের মধ্যে তীক্ষ্ণতার পার্থক্য করা সহজ।

উচ্চতা বা তীব্রতা (Loudness or Intensity) :—শব্দতরঙ্গের বিস্তৃতির (amplitude) উপর নির্ভর করে শব্দের তীব্রতা। একই কম্পন সম্পন্ন দুটি শব্দ তরঙ্গের বিস্তৃতির পার্থক্য থাকলে যে শব্দের সৃষ্টি হবে তার তীক্ষ্ণতা Pitch) এক হবে, কিন্তু তীব্রতা বিভিন্ন হবে। আলোতে যেমন বর্ণমাত্র (Hue) ও উজ্জ্বলতার (Brightness) পার্থক্য আছে শব্দের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণতা (Pitch) আর তীব্রতা (Loudness) ও তদ্রূপ।

সুর (Timbre) :—বিভিন্ন যন্ত্রের প্রকৃতি ভেদে সুরও বিভিন্ন হয়। এর জন্যে আমরা বেহালার সুরের সঙ্গে সেতারের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

আয়তন (Volume) :—আয়তনের দিক থেকে একটা শব্দ আর একটার থেকে পৃথক হতে পারে। সমুদ্রের গর্জ্জনের আয়তন বেশী। তীক্ষ্ণতা (Pitch) যত কমবে আয়তন তত বাড়বে আর তীক্ষ্ণতা যত বাড়বে আয়তন তত কমবে।

তীক্ষ্ণতা উপলব্ধির সীমানা (threshold) বার করবার জন্য পরীক্ষাগারে একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। দৈত্যাকার বিরাট একটি টিউনিং ফর্ক (Tuning fork) এর কাঁটাতে কতগুলি ওজন লাগানো থাকে। এই ওজন-গুলো সরিয়ে সরিয়ে টিউনিং ফর্কটি বাজিয়ে দেখা গেছে যতই ফর্কগুলো কাঁটার দুধারে সরানো হয়েছে ততই শব্দ আস্তে হচ্ছে। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে দেখা গেছে এমন একটা সময় আসে যখন সুর (Tone) আর শোনা যায় না। একে বলে শ্রুতির সীমানা (Limit of hearing or threshhold of pitch)।

ছোট টিউনিং ফর্ক একই ভাবে ব্যবহার করে দেখা গেছে একটা সময় আসে যখন কম্পন বৃদ্ধির পর আর শব্দ শোনা যায় না একে বলে শ্রুতিপারের শব্দ (Supersonic sound)। দেখা গেছে ১৬ থেকে ২২০০০ কম্পনের মধ্যে স্বর শুনতে পাওয়া যায়।

একটা সাইরেণের ছিদ্র সংখ্যাগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা এই স্বরগুলো (Tonal series) সব পেতে পারি। তবে কম্পন সংখ্যা যখন মাঝামাঝি হয় তখনই আমরা স্বরের তীক্ষ্ণতার প্রভেদ নির্ণয় করতে পারি।

শব্দের উৎপত্তিস্থল নির্ণয় (Localisation of sound) :—শব্দের উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করিবার সময় আমাদের অজ্ঞাতে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকি। শব্দ যদি ডান দিক থেকে আসে তাহলে আমরা ধরে নিই আমাদের ডান দিকের কানে অন্ততঃ কিছু সময় আগে শব্দটী শোনা যাবে। কিন্তু শব্দ যখন ওপর থেকে নীচে আসে, সামনে থেকে অথবা পশ্চাৎ থেকে আসে তখন শব্দের উৎস নির্ণয় করা এত সহজ হবে না। এই সময় চোখ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। আবার শব্দের উৎস যদি আমাদের চোখের সামনে না থাকে তাহলে আমরা এগিয়ে, পিছিয়ে কিম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে শব্দের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করি। কিন্তু শব্দের উৎপত্তি যদি এমন স্থানে হয় যেখান থেকে দুই কানেরই দূরত্ব প্রায় সমান, তাহলে শব্দের উৎস নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হয়।

অর্দ্ধবৃত্তাকার নালী (Semi circular canals) :— অর্দ্ধবৃত্তাকারে তিনটি নল আছে, একটি অনুভূমিক (Horizontal) এবং অপর দুইটি লম্বভাবে (Vertical) অবস্থান করে। এই নলগুলি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। মাথা নাড়লে এই জলীয় পদার্থও নড়বে। প্রত্যেকটি নলে গুচ্ছ গুচ্ছ রোঁয়া আছে (hair cells), এগুলো ঐ জলের ওপর শোয়ান অবস্থায় থাকে। সুতরাং মাথার নড়াচড়ার সময় ঐ রোঁয়াগুলো জলের ভেতর নুয়ে পড়ে। এই রোঁয়া-গুলোর সংগে সংবেদন স্নায়ুতন্তুর যোগ আছে—এই স্নায়ুতন্তু আবার লঘু-মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। আমরা জানি লঘু মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাদের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কেবলমাত্র মাথার নড়াচড়ার সময়ই অর্দ্ধবৃত্তাকার নালীগুলি কাজ করে। আমরা সোজাভাবে দাঁড়াতে পারি অলিন্দের (Vestibule) জন্য। এখানে অলিন্দেও কতগুলো রোঁয়া থাকে ; এই রোঁয়াগুলো একসঙ্গে বোনা

থাকে ; এই বুননের মধ্যে গাঁথা থাকে ছোট ছোট পাথরের কণা, এগুলোকে বলে ওটোলিথস (Otoliths)। এই ওটোলিথসগুলো রোঁয়াগুলোকে টেনে রাখে বা চাপ দেয়। মাথার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে এই চাপের প্রকৃতি। সেইজন্য মাথা যখন স্থির থাকে তখনও অলিন্দের স্নায়ুকোষ উদ্দীপ্ত হয় এবং লঘু মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগসাধন করে। তাড়াতাড়ি ঘুরলে অর্দ্ধবৃত্তাকার জলনালী ও অলিন্দ উভয়েই আক্রান্ত হয় ফলে আমরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি এবং বমি ভাব প্রভৃতি দেখা দেয়।

দর্শন (Sight)

চক্ষুঃ—আমরা পৃথিবীর বহু বিচিত্র রূপের উপলব্ধি করি চোখের সাহায্যে। এই চোখ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম একটি ইন্দ্রিয়। চোখের সাহায্যে আমরা দর্শন করে থাকি। প্রথম আমরা চোখের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মানুষের চোখ অনেকটা ছবি তোলার ক্যামেরার মত। চোখের আকার প্রায় গোল। একটা কোটরের মধ্যে এই চক্ষু গোলক অবস্থিত। তিন জোড়া পেশী চোখকে কোটরের মধ্যে ঘুরতে সাহায্য করে।

চোখের তিনটি স্তর :—বাইরের স্তরটিকে বলে শ্বেতমণ্ডল (Schlerotic)
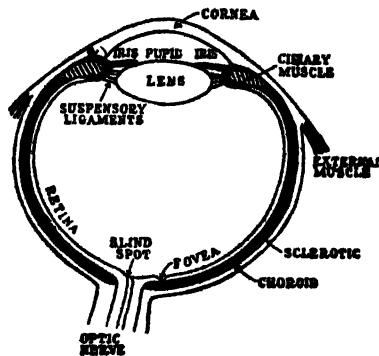
চক্ষু

এই স্তরটি সাদা এবং অস্বচ্ছ, কেবল চোখের সামনের দিকে শ্বেতমণ্ডলের যে

অংশটি দেখা যায় তাহা স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ অংশটির নাম অচ্ছোদপটল Cornea)। শ্বেতমণ্ডলের পরের স্তরটি কালো রং-এর তাই এর নাম কৃষ্ণমণ্ডল (Choroid), এখানে আছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত কনিকা। এর পরের স্তরটির নাম অক্ষিপট (Retina)। অক্ষিপট চোখের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীল। চোখের সামনে অচ্ছোদপটলের পরে আছে কনীনিকা (Iris), এর জন্যই আমাদের চোখ নীল, কালো অথবা বাদামী রং-এর হয়। এই কনীনিকা কৃষ্ণমণ্ডলেরই বর্দ্ধিত অংশ। এই পর্দা বা কনীনিকার পিছনে আছে একটি লেন্স। কনীনিকা থেকে লেন্সে আলো যাবার জন্য একটি ছিদ্র আছে—ইহাই আমাদের চক্ষু তারকা (Pupil)। কনীনিকার মাঝখানে ছোট একটা কালো বিন্দুর মত এই ছিদ্রটাকে দেখায়। এই ছিদ্রটা ঠিক ক্যামেরার অ্যাপারচারের (aperture) মত। কতগুলো পেশী এই লেন্সটাকে চোখের সঙ্গে আটকে রাখে। এই পেশী সঙ্কুচিত হলে লেন্সটি উত্তল হয় আর পেশী প্রসারিত হলে লেন্সটি সমতল বা চ্যাপ্টা হয় এই পেশীগুলোকে বলে (Ciliary process) সিলায়ারী প্রসেস।

বাইরের বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি চোখের অচ্ছোদপটল ভেদ করে লেন্সে যায় এবং লেন্স থেকে প্রতিসৃত হয়ে অক্ষিপটে পড়ে। এই লেন্সটি খুব নমনীয় এবং প্রয়োজন মত গোল বা চ্যাপ্টা করা যায়। দূরের জিনিস দেখার জন্য লেন্সকে কিছু করতে হয় না কিন্তু কাছের জিনিস ২০-৩০ ফুটের কম দূরত্বে যে সব জিনিষ আছে সেগুলি দেখার সময় লেন্স যদি একই রকমের চ্যাপটা আকারের থাকে তাহলে প্রতিমূর্ত্তি হবে আবছা (Blurred)। সেইজন্য লেন্সের বক্রতা (Curvature) বাড়াতে হবে। সিলিয়ারী পেশীর সাহায্যে লেন্সের বক্রতা কমানো বা বাড়ানো যায়।

অক্ষিপট অসংখ্য জটিল স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুসূত্র দ্বারা গঠিত। আলোক তরঙ্গ এই স্নায়ু প্রান্তগুলিকে উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনা দর্শন স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের দর্শনাঞ্চলে যায়। চোখের এই স্নায়ু প্রান্তগুলো দুই প্রকার। কতগুলো একটু লম্বা ধরণের এগুলো একটিমাত্র স্নায়ুতন্তুর সঙ্গে জোড়া থাকে। আর এক প্রকার স্নায়ুপ্রান্ত আছে এগুলো বেঁটে ধরণের আর প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে তন্তু থাকে। লম্বা স্নায়ুকোষগুলোকে বলে দণ্ডকোষ (Rods) আর বেঁটেগুলিকে বলে শঙ্কুকোষ (Cons) দণ্ডকোষগুলি রাত্রে কাজ করে

বলে একে আঁধার কোষ এবং শঙ্কুকোষ দিনের বেলায় কাজ করে বলে একে আলোক কোষও বলা যেতে পারে।

লেন্স আর অক্ষিপটের মাঝের জায়গাটা জলীয় পদার্থে পূর্ণ, একে বলে ভিট্রিয়াস হিউমার (Vitreous Humour) এবং অচ্ছোদপটল ও কনীনিকার মাঝের জায়গাটা এক প্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ, একে বলে এ্যাকোয়াস হিউমার (Acqueous Humour)।

চোখ যখন জোরালো আলোতে অভ্যস্ত হয় তখন তাকে বলে ফোটোপিক (Photopic) অবস্থা আর অন্ধকারে চোখের অভ্যস্ত হওয়াকে বলে স্কোটোপিক (Scotopic) অবস্থা। এই ফোটোপিক থেকে স্কোটোপিক অবস্থায় আসতে চোখের সাধারণত সময় দরকার হয় ২০ মিনিট (প্রথম ১০ মিনিটে চোখের উপযোগী করন (Adaptation) বহুলাংশে সম্পূর্ণ হয়)। ফোটোপিক অবস্থা থেকে স্কোটোপিক অবস্থায় আসার জন্য চোখকে উপযুক্ত করাকে বলে উপযোগীকরণ (Adaptation)। স্কোটোপিক অবস্থা থেকে ফোটোপিক অবস্থায় আসতে চোখের এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় না।

দণ্ডকোষ বা আঁধারকোষের (Rods) রং-এর অনুভূতি দেবার ক্ষমতা নেই। তাই স্কোটোপিক চোখের কাছে পৃথিবীর রং ধূসর। আঁধারকোষ ও আলোককোষ চোখের সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। অক্ষিপটের কেন্দ্রস্থলে আছে পীত বিন্দু (Yellow spot) একে ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস (Fovea centralis) বলে। এই পীতবিন্দু অক্ষিপটের কিঞ্চিৎ অবনমিত (Depression) স্থানে অবস্থিত। অক্ষিপটের কেন্দ্রে বা পীত বিন্দুতে আলোক কোষের সংখ্যা খুব বেশী। এখানে আঁধার কোষ নেই বললেও চলে। অন্ধকারে পীত বিন্দুতে তাই কোন দর্শন সংবেদন হয় না। ফোভিয়া বা কেন্দ্র থেকে অক্ষিপটের প্রান্তে যতই যাওয়া যায় ততই আলোক কোষের সংখ্যা কম হয় এবং আঁধার কোষের সংখ্যা বাড়ে। তাই অন্ধকার আকাশে কিছু দেখতে হলে সোজাভাবে না তাকিয়ে একটু বাঁদিকে বা ডানদিকে তাকালে ভাল করে দেখা যায়।

দর্শন স্নায়ু গুরু মস্তিষ্ক থেকে এসে অক্ষিপটে মিলিত হয়েছে। এই মিলন স্থানটিকে বলে অন্ধবিন্দু (Blind spot)। অন্ধবিন্দুতে আলোক কোষ বা

আঁধারকোষ কোনটিই নেই; তাই এখানে আলো পড়লে আমাদের দর্শন সংবেদন হয় না।

চোখকে অন্ধকারে উপযোগী করার ক্ষমতা সব ব্যক্তির সমান নয়। ভিটামিন 'এ'-র অভাব হলে মানুষ রাতকানা হয়।

বর্ণ ও বর্ণ সংবেদন (Colour and colour sensation)

শব্দের মতই আলোকশক্তি তরঙ্গের আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে যেমন বাতাস, আলোক তরঙ্গের মাধ্যম সেইরূপ ঈথার (Ether)। আলোকরশ্মি ঈথারের মাধ্যমে আমাদের চোখের লেন্সে প্রতিসৃত হয়ে অক্ষিপটে প্রতিচ্ছবি গঠন করে। দর্শন স্নায়ুর সাহায্যে এই উদ্দীপনা (Stimulus) প্রেরিত হলে আমাদের দর্শন সংবেদন হয়।

বিভিন্ন আলোক তরঙ্গে আমাদের অক্ষিপটের আলোক কোষগুলি বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। আলোক তরঙ্গের পরিমাপ করা হয় ১ মিলি মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে একক ধরে এবং এই একককে বলা হয় এম, মিউ (M. μ.)। ৭৬০ M. μ. থেকে ৩৯০ M. μ. দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধরা দেয় অর্থাৎ ৭৬০ M. μ. এর চেয়ে বেশী এবং ৩৯০ M. μ. এর কম দৈর্ঘ্য সম্পন্ন আলো আমরা দেখতে পাই না। ৭৬০ M. μ. এর চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গ সমন্বিত আলোকে লাল উজানী আলো এবং ৩৯০ M. μ. দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের চেয়ে ক্ষুদ্রতর আলোক তরঙ্গকে বলে বেগুনি পারের আলো (Ultra-violet)। লাল-উজানী আলো তাপ দেয় কিন্তু আলোর অনুভূতি দিতে পারে না। আর বেগুনি পারের আলো রাসায়নিক ক্ষমতা-সম্পন্ন, বেশী চোখে লাগলে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সূর্য্যের সাদা আলো একটা তেকোনা কাচের (Prism) মধ্য দিয়ে গেলে সাতটা রং দেখা যায়। একে বলে বর্ণালী (Spectrum)। লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, নীল, তুতে ও বেগুনি এই সাতটা দৃশ্যমান রং দিয়ে বর্ণালী গঠিত। ৭৬০ M. μ. থেকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কমতে থাকে ততই বিভিন্ন রং-এর সংবেদন আমরা লাভ করি। ধূমল রং (Purple) ও গাঢ় লাল রং (Carmine) লাল ও বেগুনির মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত সেইজন্য এগুলোকে বর্ণালীর মধ্যে পৃথকভাবে ধরা হয় না কারণ এ রংগুলো একটিমাত্র তরঙ্গ

দৈর্ঘ্যের নয়। আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কমে ততই লালের পরিমাণ কমতে
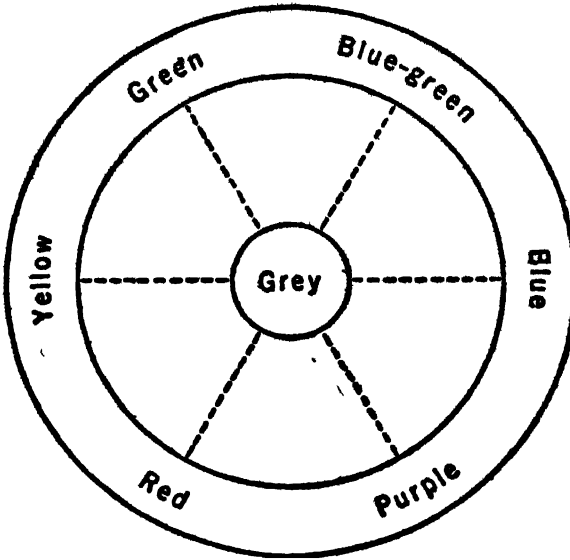
বর্ণবৃত্ত

থাকে। যেমন লালের পর কমলা তারপর হলুদ। এগুলিতে লালের অংশ ক্রমশ কম। সবুজ ও নীল রং-এ লাল একেবারেই নেই। কিন্তু তারপর আসে বেগুনি। এই বেগুনির পর ধূসর ও গাঢ় লাল রং দিয়ে আমরা বর্ণবৃত্তের কল্পনা করি। অর্থাৎ বেগুনি ও লাল রঙের মাঝখানে থাকবে গাঢ় লাল রং।

সূর্যের আলোর রঙ সাদা কিন্তু এই সাদা আলো যখন একটা নীল জিনিষের উপর পড়ে তখন আমরা জিনিষটি নীল দেখি। এর কারণ এই জিনিষটা কেবল নীল রংটাই প্রতিফলিত করে অন্য রং গুলো শুষে (Absorb) নেয়। কালো কোন রংই নয়। যখন কোন বস্তুতে আলো পড়লে সব রং গুলো শুষে নেয় অর্থাৎ একটা রংও প্রতিফলিত করে না তখনই আমরা কালো দেখি।

সাধারণতঃ আমরা যত রং দেখি তা একটিমাত্র বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নয়। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন রং-এর সংবেদন জাগায়।

প্রাথমিক বা মূল বর্ণ (Primary colours)

বর্ণালীর সাতটা রঙকে সকলে প্রাথমিক বর্ণ বলে না। দেহতত্ত্ববিদদিগের মতে প্রাথমিক বর্ণ চারিটি, লাল, সবুজ, নীল ও হলুদ। এই চারিটি রংকে বিভিন্ন ভাবে মিশ্রিত করলে অন্য রংগুলি পাওয়া যাবে। যেমন লাল ও হলুদ রং মেশালে কমলা পাওয়া যায়। আবার পদার্থবিদগণ মাত্র তিনটি প্রাথমিক বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে লাল ও সবুজ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মেশালে হলুদ রং পাওয়া যায়। মনোবিদগণ বলেন বর্ণসংবেদন খুবই সরল প্রক্রিয়া। তাঁরা বলেন কমলাকে আমরা কমলা রং বলেই দেখি, লাল ও হলুদের সংমিশ্রণরূপে দেখি না।

রং এর শ্রেণীবিভাগ (Classification of colour)

মানুষের চোখ প্রায় ৩৪০,০০০ বিভিন্ন রং দেখতে পায় বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এতগুলি রং-এর নামকরণের জন্য ভাষা আমাদের নেই। মনোবিজ্ঞানে নিম্নলিখিত উপায়ে রং-এর বিভিন্নতা নির্ণয় করা হয়।

(১) এক্রোমেটিক রং (Achromatic series) :—সবচেয়ে সহজে রং-এর যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে তাতে রং-এর দুইভাগ—(১) এক্রোমেটিক ও (২) ক্রোমেটিক (Chromatic)। এক্রোমেটিক রংকে একটি সরল রেখায় প্রকাশ করা যায়—এই রেখার এক প্রান্তে থাকে সাদা অপর প্রান্তে কালো এবং মাঝখানটা ধূসর। সাদা থেকে কালো পর্য্যন্ত এই আলোটা ধাপে ধাপে কালোর দিকে নেমে গেছে। অর্থাৎ সাদায় ক্রমশঃ একটু একটু কালো মিশেছে এবং সাদার ভাগ কমে গেছে। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এর মধ্যে প্রায় ৫৭০ ধাপ দেখতে পায়।

(২) ক্রমেটিক রং (chromatic series) :—ক্রমেটিক রং-এর উজ্জ্বলতা (Brightness) বর্ণমাত্র (hue)-এবং পরিপৃক্তি সম্বন্ধে (Saturation) আলোচনা করা হবে।

(ক) রং-এর ঔজ্জ্বল্য :—এক্রোমেটিক রং-এর ও উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। একে বলে টিন্ট (Tint) অথবা উজ্জ্বলতা (Brightness)। এক্রোমেটিক রং যতই সাদার দিকে যাবে তত উজ্জ্বল হবে এবং যত কালোর দিকে যাবে তত অনুজ্জ্বল হবে।

ক্রমেটিক রং-এর উজ্জলতার হ্রাস বৃদ্ধি পেতে পারে। আমরা হালকা নীল, গোলাপী প্রভৃতি রং দেখি, এগুলিতে সাদার পরিমাণ বেশী বলে বেশী উজ্জল। আবার খয়েরি রংটা হল অনুজ্জল রং। লালের সঙ্গে কালো মিশলে খয়েরি রং হয়।

বৃত্তের সাহায্যে রংএর উজ্জলতা বোঝান যায় না। সেইজন্য বর্ণশঙ্কুর (Colour pyramid) কল্পনা করা হয়ে থাকে। এর সাহায্যে রং-এর উজ্জলতা প্রভৃতি সব বোঝান যায়। নিয়ে এই বর্ণশঙ্কুর বর্ণনা দেওয়া হল।

বর্ণবৃত্তের পরিধিতে সাতটা রং সাজিয়ে বৃত্তটাকে একটা তল কল্পনা করা হয়। ঐ বৃত্তের কেন্দ্রস্থল বরাবর একটা রেখা টেনে দুদিকে দুটো শঙ্কু আঁকা হয়। এই শঙ্কুর উপরের দিকে সাদা এবং নীচের দিকে কালো রংকল্পনা করা হয়। একে বলে বর্ণশিখর।

এই বর্ণশিখরের সাহায্যে রং এর উজ্জলতা সহজেই বোঝা যায়। বর্ণবৃত্ত থেকে যতই উপরের দিকে যাওয়া যাবে ততই রংএর উজ্জলতা বাড়বে। বর্ণালীর লাল রং এর কথাই ধরা যাক্। এর লাল রংএ একটু একটু করে যদি সাদা মেশান হয় তাহলে দেখা যাবে আস্তে আস্তে রংএর ঔজ্জল্য বাড়বে শেষে ঐ লাল সাদা হয়ে যাবে। এই ভাবে কোন রং যদি কালোর দিকে যায় অর্থাৎ যদি তাতে কালো মেশান হয় তাহলে সেই রং-এর ঔজ্জল্য কমে যাবে। রংটা ক্রমশঃ কালচে হতে হতে শেষে কালো হয়ে যাবে। এই সাদা আর কালো রং মিশ্রণের অনুপাতকে এইভাবে বর্ণশিখরের সাহায্যে বোঝান যায়।

(খ) বর্ণমাত্র (Hue):—ক্রমেটিক রং এর নামকরণ করা হয় তার বর্ণমাত্র উল্লেখ করে। কেবলমাত্র ক্রোমেটিক রং এরই বর্ণমাত্র হয়। যেমন আমরা বলি এ রংটা ধূমল (Purple), এটা কমলা, ওটা সবুজ বেগুনি ইত্যাদি। বর্ণবৃত্তে এই রংগুলি দেখান হয়েছে। পরিপৃক্ত রং এর প্রায় ১০০টি সাধারণ চোখে ধরা পড়ে। কেহ কেহ ১৬০টি রং দেখতে পায়।

(গ) ক্রোমেটিক রং এর তৃতীয় বিভিন্নতা হল এর পরিপৃক্তি। রঙ যত বিশুদ্ধ হবে, যত গাঢ় হবে ততই পরিপৃক্ত হবে। এই বিশুদ্ধ রং এর সহিত যত সাদা বা যত কালো অথবা এই দুইয়ের সহমিশ্রণে ধূসর যত মেশান হবে তত রং

এর পরিতৃপ্তি কমে যাবে। কিন্তু আগেই বলেছি বিশুদ্ধ রং আমরা দেখিনা

বর্ণ শিখর
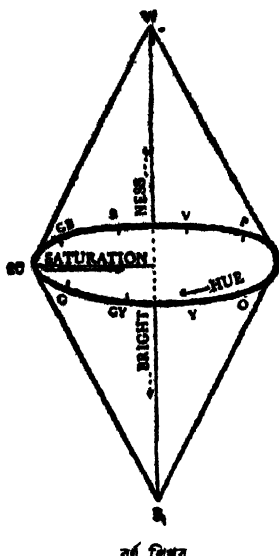
আমাদের চোখে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মিশ্রণেই মিশ্রিত রং এর সংবেদন হয়। যে কোন রং এর সঙ্গে সাদা মেশালে তার পরিতৃপ্তি কমে যাবে। লাল রং পরিতৃপ্ত, কিন্তু গোলাপী লাল এর চেয়ে কম পরিতৃপ্ত।

এখন উপরে বর্ণিত শঙ্কুর সাহায্যে রং এর পরিতৃপ্তি বোঝা যায়। যে বর্ণবৃত্তটিকে তল কল্পনা করা হয় তার কেন্দ্রে রংগুলি ধূসর হয়ে যাবে। কিন্তু বৃত্তের সব রং এর ঔজ্জ্বল্য একই থাকবে। একই বর্ণবৃত্তের সব রং এর ঔজ্জ্বল্য সমান হবে। আর এই বৃত্তের কেন্দ্রে সাদা ও কালো রং এর মিশ্রণের জন্য ধূসর দেখায়। এই বর্ণবৃত্তের উপরে আর একটি বর্ণবৃত্ত কল্পনা করলে দেখা যাবে এই বর্ণবৃত্তের সব রংই আগের চেয়ে উজ্জ্বলতর। এর উপরের ক্ষুদ্রতর বর্ণবৃত্তের রং আরোও উজ্জ্বলতর হয়। এই ভাবে বৃত্ত যতই ছোট হবে ততই পরিতৃপ্তি কমে যাবে এবং রং ততই উজ্জ্বল হবে। এইভাবে উজ্জ্বলতা বাড়তে বাড়তে বর্ণশিখরের শীর্ষবিন্দুতে রং হবে সাদা। অপরদিকে নীচের দিকে এই রং ক্রমশঃ কালো হতে হতে শীর্ষবিন্দুতে একেবারে কালো হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে বর্ণবৃত্তের যে তলটি কল্পনা করে হয়েছে তার পরিধিতে সব রং হবে পরিপৃক্ত ; এর উপরের বা নীচের বৃত্তের পরিপৃক্তি ক্রমশঃ কম। আবার পরিধি থেকে যতই কেন্দ্রের দিকে যাবে ততই পরিপৃক্তি কমবে।

রং সংবেদনের উৎস (Stimuli for colours)

রং সংবেদনের মূলে আছে তিনটি বিষয় (১) তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (২) তরঙ্গের শক্তি এবং (৩) বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংমিশ্রণ।

(১) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য :—আলোক তরঙ্গের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য রং এর বিভিন্নতা নির্ণয় করে। আগেই বলেছি ৭৬০ M. μ. থেকে ৩৯০ M. μ. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত রং আমাদের চোখে পড়ে। নীচে বিভিন্ন রংএর বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটি তালিকা দেওয়া হল।

রং	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	অনুপূরক রং	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
লাল	৬৫৬ M. μ.	নীল সবুজ	৪৯২ M. μ.
কমলা	৬০৭ „	নীল	৪৮৯ „
হলদে	৫৮৫ „	নীল	৪৮৫ „
হলদে	৫৭৩ „	নীল	৪৮২ „
হলদে	৫৬৭ „	তুঁতে	৪৬৪ „
হলদে	৫৮৪ „	তুঁতে	৪৬১ „
হলদে সবুজ	৫৬৩ „	বেগুনি	৪৩৩ „
			এবং এর পর

অবিমিশ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রকৃতিতে খুব কমই চোখে পড়ে। আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সর্ব্বদা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা এই মিশ্রিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রধান তার থেকে বর্ণ মাত্র বোঝা যায়। সাধারণ দিবালোকে হলদে রং সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। হলদে রং সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল। এর চেয়ে দীর্ঘতর বা হ্রস্বতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ কম। একই শক্তি সম্পন্ন অথচ বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন দুটি রংএর মধ্যে যেটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি সেটিই হবে বেশী উজ্জ্বল। হলদে রং বর্ণালীর মধ্যভাগে বলে এর ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশী। বেগুনি সবচেয়ে বেশী অনুজ্জ্বল।

(২) আলোক তরঙ্গের শক্তি (Energy) :—আলোক তরঙ্গ শক্তির উপর রংএর ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। এই শক্তির পরিবর্তন রংএর পরিপৃক্তিকেও প্রভাবিত করে। শক্তি যত বেশী হবে রং তত সাদার দিকে যাবে। তরঙ্গ শক্তি যত কম হবে ততই রং কালোর দিকে যাবে। তরঙ্গ শক্তি মাঝামাঝি হলে রং পরিপৃক্ত হবে।

(৩) রংএর মিশ্রণ (Colour mixing) :—বর্ণমাত্র (Hue) নির্ভর করে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। প্রত্যেক রংএর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। এখানে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে সব সময় যে একটি নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই চাই নির্দ্দিষ্ট রং প্রস্তুতের জন্য তা নয়,—বিভিন্ন দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গড় যদি অপর একটি রংএর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান হয় তাহলে ঐ দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিশ্রিত করলেও তৃতীয় রংটি দেখা যাবে।

পরীক্ষাগারেও এই রীতি অনুসারে নানারকম পরীক্ষা করা যেতে পারে। বর্ণ-মিশ্রক যন্ত্রে বিভিন্ন রংএর ডিস্ক চাপিয়ে দেওয়া হয়। যদি আমরা দুটি রং মেশাবার ইচ্ছে করি তাহলে দুটি রংএর ডিস্ক তাদের ব্যাসার্দ্ধ ধরে কাটতে হবে। ডিস্কগুলির কেন্দ্রে গোল করে কাটা থাকবে। এবার ঐ ডিস্ক দুটিকে ছিদ্র দিয়ে বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে চাপিয়ে শক্ত করে এঁটে দিতে হবে। এবার বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে বা হাতে ঐ ডিস্কগুলিকে ঘোরাতে হবে। চাকতি দুটো যদি হলুদ আর লাল হয় তাহলে লাল হলুদের বিভিন্ন পরিমাণে সংমিশ্রণ করলে বিভিন্ন রংএর সংবেদন হবে ; লাল হলুদের সংমিশ্রণে যত রং হয় সবগুলিই আমরা দেখবো। লাল ও হলুদের পরিমাণ সমান হলে কমলা রং দেখা যাবে।

বর্ণালীর সাতটা রং এইভাবে নানা রং মিশিয়ে পাওয়া যেতে পারে। সাদা রং ও নানা ভাবে পাওয়া যায়। বর্ণালীর সাতটা রং ডিস্কে চাপিয়ে বর্ণমিশ্রক যন্ত্রের সাহায্যে ঘোরালে ধূসর অথবা সাদা রং পাওয়া যাবে।

আবার সাতটা রং নয় কেবলমাত্র ৪টে রং লাল-হলদে-নীল-সবুজ মেশালে ও সাদা রং দেখা যায়। আবার তিনটে প্রাথমিক রংকেও (লাল, সবুজ ও নীল নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে যদি ঘোরান যায় তাহলে ও সাদা রং দেখা যাবে। শুধু তাই নয় বিশেষ একজোড়া রং মিশিয়ে বর্ণ মিশ্রকে ঘোরালে ও সাদা-রং সৃষ্টি হবে। নীল আর হলুদ নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মেশালেও ধূসর বা সাদা হয়ে যায়।

এইভাবে লাল সবুজ ও ধূসর রং-এর সংবেদন দেবে। একজোড়া রং মিশিয়ে অন্য রং পাওয়া গেলে ঐ দুটি রংকে পরস্পরের অনুপূরক বলা হয়।

প্রত্যেক রং-এর একটা করে অনুপূরক রং পাওয়া যেতে পারে। সাদা-কালো যদিও রং নয় তবু তাদেরও অনুপূরক বলা যেতে পারে কারণ সাদা কালো মেশালে ধূসর রং-এর সংবেদন হয়।

অনুপূরক রং (Complementary Colours)

দুটি রং এক সঙ্গে মেশালে যদি সাদা বা ধূসর রং-এর সংবেদন দেয় তাহলে তাকে বলে অনুপূরক রং। বর্ণালীর প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ বা মিশ্রিত রং-এর অনুপূরক রং আছে। এই অনুপূরক রং বর্ণালীতে বা ধূমল বা গাঢ় লাল রং-এও থাকতে পারে। বর্ণচক্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে লাল ও নীল সবুজ রং পরস্পরের অনুপূরক। হলদের অনুপূরক তুঁতে, নীল এর অনুপূরক কমলা হলদে এবং সবুজ এর অনুপূরক গাঢ় লাল। সবুজ ও লালকে পরস্পরের অনুপূরক বলা হয় কিন্তু একথা ঠিক নয়। লালের অনুপূরক নীল সবুজ ও সবুজের অনুপূরক গাঢ় লাল ও ধূমল বর্ণের (Carmine-Purple)। তাই লাল সবুজ রং-এর চাকতি বর্ণচক্রে ঘোরালে ধূসর রং-এর পরিবর্তে হালকা সবুজ মেশান হলদে রং দেখা যায়।

তাহলে বর্ণ-মিশ্রণের তিনটি সূত্র পাওয়া যাচ্ছে :—

(১) দুটো অনুপূরক রং মেশালে ধূসর বা সাদা হবে।

(২) দুজোড়া অনুপূরক রং লাল সবুজ, নীল, হলুদ একসঙ্গে বর্ণমিশ্রকে চাপালেও সাদা বা ধূসর রং দেখা যাবে।

(৪) যে রংগুলো অনুপূরক নয় সেগুলো বর্ণ মিশ্রকে চাপালে পরস্পরকে বিলুপ্ত করে না একটি নূতন রং-এর সংবেদন হয়। যেমন লাল-নীল পরিমান মত মেশালে বেগুনি হয়, লাল হলদে মেশালে কমলা হয়।

বর্ণ বৈষম্য (Colour Contrast)

অনেকক্ষণ চোখে সবুজ চশমা লাগিয়ে খুলে রাখলে দৃশ্য জগৎটাই রক্তবর্ণের হয়ে গেছে দেখতে পাবে। পরীক্ষাগারে একটি কার্ডবোর্ডে এক টুকরো লাল বা সবুজ কিম্বা নীল বা হলদে রং-এর কাগজ সেঁটে

দিয়ে তোমরা সহজেই এই পরীক্ষা করতে পার। ১৫ বা ২০সে লাল কাগজের দিকে তাকানর পর সাদা দেওয়ালে চোখ ফেললে দেখবে দেওয়ালে ঠিক সেই আকারের একটী ছবি ভাসছে, এ ছবিটী কিন্তু লাল নয় সবুজ। দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ একটী রং এর দিকে তাকিয়ে থাকার পর চোখ সরিয়ে সাদা পর্দা বা দেওয়ালে রাখলে যে রংটি এতক্ষণ দেখছিলাম তার অনুপূরক রংটি দেখতে পাব। একে বলে বর্ণ বৈষম্য (Colour Contrast)।

বর্ণ বৈষম্য দুই প্রকার—

(১) **অনুবর্ত্তী বর্ণবৈষম্য (Successive Contrast) :—**

উপরে যে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা হল তাকে আমরা অনুবর্ত্তী বর্ণ বৈষম্য (Successive Contrust) বলতে পারি। একে নঞর্থক বা অসদর্থক পরাভব মূর্ত্তি বলা হয় (Negative After image)।

পর্দার রং-এর উপর ও এই পরাভব মূর্ত্তির প্রকৃতি নির্ভর করে। কিছুক্ষণ লাল কাগজের দিকে তাকানোর পর লাল পর্দায় চোখ রাখলে ধূসর বর্ণ দেখতে পাব। আবার লাল কাগজ দেখার পর সবুজ পর্দার দিকে তাকালে গাঢ় সবুজ রং-এর সংবেদন লাভ করব। এইভাবে আমরা সাদা ও কালো রং-এর পরীক্ষা করতে পারি। কিছুক্ষণ সাদা রং-এর দিকে তাকিয়ে ধূসর রং-এর পর্দায় চোখ নিবিষ্ট করলে ধূসর রং গাঢ় রং-এর মনে হবে। এই ভাবে কালোর থেকে চোখ সরিয়ে ধূসর রং-এর পর্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ধূসর রং ধব-ধবে সাদা বলে মনে হবে।

এখানে অপর একটি কথা মনে রাখতে হবে। পরাভব মূর্ত্তির জন্য মনোযোগের খুবই প্রয়োজন। সেইজন্য পরীক্ষাগারে কার্ডবোর্ডে যে রঙিন কাগজ নিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার মাঝে একটী ছোট কালো-বিন্দু দেওয়া হয়। ঐ বিন্দুর দিকে তাকালে চোখ ঐ কাগজের থেকে বেশী দূরে যেতে পারবে না বেশী নড়াচড়া করতে পারবে না।

পরাভব মূর্ত্তি দুই প্রকার—অসদর্থক ও সদর্থক (Positive After Image)। কিছুক্ষণ একটা রং-এর দিকে তাকিয়ে থাকার পর মূহুর্ত্তের জন্য চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুললে দেখা যাবে সদর্থক পরাভব মূর্ত্তি। একটা জলন্ত মোমবাতির দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করার পর সাদা দেওয়ালে দৃষ্টি ফেললে মোমবাতিটাকে দেওয়ালে জলতে দেখা যায়।

বর্ণ বৈষম্য অনুবর্তী হতে পারে সমকালীনও (Simultaneous) হতে পারে।

(২) **সমকালীন বর্ণ বৈষম্য** (Simultaneous Contrast):—মনে করো সবুজ কাগজের দিকে তাকিয়ে আছো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সবুজ কাগজের চারিধারে কিনারা ছাপিয়ে লাল আভা দেখা যাচ্ছে। একে বলে সমকালীন বর্ণ বৈষম্য। এই রকমের ভাবমূর্তি সাধারণতঃ পশ্চাৎপটের (Back ground) উপর নির্ভর করে। সবুজ কাগজে যদি সাদা কাগজ না সেঁটে কালো কাগজ সেঁটে দেওয়া হত তাহলে সমকালীন বর্ণ বৈষম্য হত না।

সাদা, কালো বা ধূসর রং-এর সমকালীন বর্ণ বৈষম্য দেখা যেতে পারে। এগুলিকে তখন রঙিন কাগজের উপর আটকে দিতে হয়। ধূসর রং যদি সবুজের পশ্চাৎপটে রাখা হয় তাহলে ধূসরের চারিপাশে লাল রং ছাপিয়ে উঠবে। দুটো রং যদি খুব উজ্জ্বল হয় তাহলে সমকালীন বর্ণ বৈষম্য খুব স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হয়।

পুরকিঞ্জি তত্ত্ব (Purkinjie Phenomena)

চোখ যখন অন্ধকারে অভ্যস্ত হয় তখন বর্ণালীর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রং সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। ম্লান আলোকে অবশ্য ধূসর রং-এরই সংবেদন হয়। কিন্তু এই ধূসর রং গাঢ় বা হালকা ধূসর বলে মনে হবে। নীল লালের চেয়ে হালকা ধূসর বর্ণের সংবেদন দেবে। গোধুলি আলোকে বর্ণালীর সাতটা রং উপস্থিত করলে তা বর্ণহীন মনে হবে কিন্তু প্রত্যেকটি বর্ণ সমান উজ্জ্বল মনে হয় না। কোন রং বেশী উজ্জ্বল মনে হয়, কোন রং মনে হয় কম উজ্জ্বল। বর্ণালীর লাল রং-এর দিকটা সব চেয়ে কালচে মনে হয়, নীল দিকটা উজ্জ্বলতর মনে হয়। দিবালোকে হলুদ রং সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল কিন্তু রাত্রের আধো অন্ধকারে সবুজ নীল উজ্জ্বলতর অন্য রং-এর চেয়ে।

আমরা জানি অন্ধকারে চোখের রড বা দণ্ডকোষ কাজ করে। এই দণ্ডকোষে এক প্রকার পদার্থ থাকে একে বলে চাক্ষুষ ধূম্রল (Visual Purple)। সবুজ আলোকে এই পদার্থ প্রভাবিত হয় অর্থাৎ এই পদার্থ সবুজকে শুভ্র করতে (Bleach) সাহায্য করে। এইজন্য ম্লান আলোকে সবুজ রং সব চেয়ে বেশী

উজ্জ্বল। লাল আলোর প্রভাব এই পদার্থের উপর একেবারেই নেই এইজন্য লাল রংটী অনুজ্জ্বল। এই জন্য ম্লান আলোকে সবুজ পাতা হালকা ধূসর মনে হবে হলদে ফুলের চেয়ে। নীল ফুলটা লালের চেয়ে হালকা ধূসর মনে হবে। ম্লান আলোকে উজ্জ্বলতার তারতম্য আবিষ্কার করেন অষ্ট্রিয়াবাসী বৈজ্ঞানিক পুরকিঞ্জি। এইজন্য ইহাকে পুরকিঞ্জি তত্ত্ব বলা হয়।

অক্ষিপটের মণ্ডল (Retinal Zones)

বর্ণসংবেদনে এতক্ষণ আমরা রং নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু বর্ণসংবেদনের আরও একটী দিক আছে। আমাদের অক্ষিপটের কোন্ স্থানে বর্ণরশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করবে বর্ণের প্রকৃতি। আমরা যখন সোজাসুজি ভাবে কোন বস্তুর দিকে তাকাই, তখন আলোকরশ্মি পীতবিন্দুতে গিয়ে পড়ে। যে বস্তুটি দেখছি সেটি ছাড়া পরিবেশের অন্যান্য বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি পীতবিন্দুর চারিপাশে পড়ে। অক্ষিপটের দর্শন সংবেদন দিতে পারে যতগুলি বস্তু ততগুলিকে আমরা বলব দর্শনের সীমা (Field of vision)।

চোখের পীতবিন্দুতে আমরা নানাবিধ রং ও রংএর ঔজ্জ্বল্যের সংবেদন পাই কিন্তু পরিধির দিকে শুধু সাদা বা ধূসর রংএর এবং ঔজ্জ্বল্যের অনুভূতি হয়। মধ্য মণ্ডলে কেবল নীল ও হলুদ বর্ণের সংবেদন হয়।

অক্ষিপটে আমরা তিনটি মণ্ডলের পরিকল্পনা করি।

(১) **প্রান্তমণ্ডল** (Outer Zone):—এখানে কোন রংএর সংবেদন হয় না কেবল রংএর উজ্জ্বলতার বোধ হয়।

(২) **মধ্য মণ্ডল** (Middle Zone):—এখানে কেবল নীল হলুদ রংএর সংবেদন হয়; লাল সবুজের অনুভূতি হয় না।

(৩) **কেন্দ্রীয় মণ্ডল** (Inner Zone):—এখানে সব রং এবং আলোর অনুভূতি হয়।

বর্ণান্ধতা (Colour blindness):—চোখের শঙ্কুকোষের (Cone) বিকলতার জন্য বর্ণান্ধতা দেখা দেয়। বর্ণান্ধ দুই প্রকারের হতে পারে সম্পূর্ণ ও আংশিক। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ কেবল সাদা, কালো ও ধূসর ছাড়া কোন রংই

দেখতে পায় না। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু লাল সবুজ
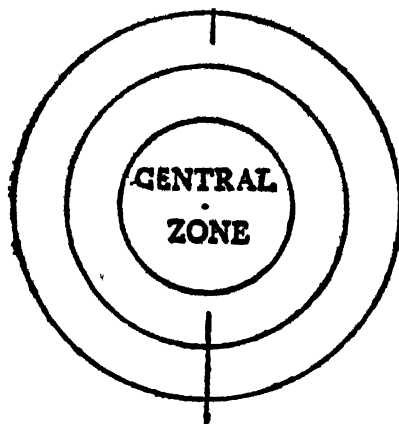
অক্ষিপটের মণ্ডল

কানার সংখ্যা অনেক—প্রতি ২৫ জনের মধ্যে একজন লাল সবুজ কানা দেখা যায়। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে লাল সবুজ বর্ণান্ধ খুব কম। প্রতি হাজারে মাত্র একজন। আবার কোন ব্যক্তি এক চোখে বর্ণান্ধ হয়, অবশ্য এরকম বর্ণান্ধের সংখ্যা খুব কম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডালটন লাল সবুজ কানা ছিলেন। এই জন্য বর্ণান্ধতাকে ডালটনিসম বলা হয়।

বর্ণান্ধতা কোন রোগ নয়, সেই জন্য একে সারানো যায় না। সাধারণ চোখে বর্ণালীর সাতটা রংএর সংবেদন হয় কিন্তু লাল সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তি কেবল হলদে ও নীল রং দেখে। বর্ণান্ধ ব্যক্তি রং দেখে না সত্য কিন্তু রংএর উজ্জ্বলতা দেখে। তাদের চোখে গাঢ় লাল এর থেকে হালকা সবুজের তফাৎ সহজেই ধরা পড়ে।

অর্জিত বর্ণান্ধতা (Acquired colour blindness) :—বর্ণান্ধতা নিজের দোষেও হতে পারে। অতিরিক্ত তামাক বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করলে পীতবিন্দু নষ্ট হয়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য ধূমপান ইত্যাদি মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করলে এ রোগ সেরে যায়।

বর্ণ দুর্বলতা (Colour weakness) :—কোন কোন ব্যক্তি লাল ও সবুজ রং সম্বন্ধে সমান অনুভূতিশীল নয়। এঁদের বলা হয় বর্ণ দুর্বল। লাল, সবুজ রং মিশিয়ে হলদে করবার জন্য কেহ কেহ বেশী লাল দেয়, আবার কেহ সবুজ বেশী দেয়। এদের চোখের কাছে রং না থাকলে সহজে চিনতে পারে না।

বর্ণবোধের ক্রমবিকাশ ল্যাডফ্রাঙ্কলিন তত্ত্ব
(Ladid Franklin Theory)

রং সম্বন্ধে এত শেখার পর আর কয়েকটা কথা না জানলে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না। এতক্ষণে আমরা মানুষের বর্ণানুভূতি নিয়ে আলোচনা করেছি। মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তু রং দেখতে পায় না, তারা সকলেই বর্ণান্ধ! বানরের অবশ্য বর্ণসংবেদন হয়। বহু জন্তুর অক্ষিপটে প্রধানত দণ্ডকোষ (Rods) থাকে, তাই তাদের বর্ণানুভূতি হয় না। কিন্তু রাত্রে আধো অন্ধকারে তারা বেশ ভালো দেখতে পায়। পাখীর বর্ণ সংবেদন খুব তীব্র। মৌমাছির বর্ণালীর লালের দিকের অনুভূতি তীব্র নয় কিন্তু বেগুনির দিকের অনুভূতি এত তীব্র যে তারা বেগুনি পারের আলোও দেখতে পায়।

এই সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমেরিকার মনস্তত্ত্ববিদ ল্যাড ফ্রাঙ্কলিন বললেন যে বর্ণসংবেদনের ক্রমবিকাশ আছে। পাখী ও কীট রং দেখতে পায় কারণ পাখী, কীট ও স্তন্যপায়ী জন্তু ক্রমবিকাশের একই পর্যায়ে পড়ে না। ল্যাড ফ্রাঙ্কলিনের মতে জীবের ক্রমবিকাশের সর্ব্বপ্রথম স্তরে কেবল সাদা ও ধূসরের সংবেদন হত। পরে বর্ণালীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিকে নীল রং ও বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিকে হলদে রং-এর অনুভূতি হত। লাল সবুজ রং-এর সংবেদন অনেক পরের ব্যাপার।

তিনি আরও বলেন যে মানুষের অক্ষিপটের তিনটি মণ্ডলও এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে। প্রান্তমণ্ডল সবচেয়ে আদিম, অক্ষিপটের কেন্দ্রমণ্ডল সবচেয়ে পরে বিকাশলাভ করেছে। সেই জন্য ক্রমবিকাশের ধারাকে বর্ণান্ধতার কারণ বলা যেতে পারে। এই মতবাদ সত্য হলে বলতে হবে, মানুষের যত উন্নতি হবে অনুভূতিও তত বাড়বে। হয়ত বহুযুগ পরে মানুষের চোখে বেগুনি পারের আলো বা লাল উজানী আলোও ধরা পড়বে।

এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় নীল, হলুদ-বর্ণান্ধ অপেক্ষা লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ এত বেশী কেন? লাল সবুজের অনুভূতি বর্ণের ক্রমবিকাশের পরবর্তী ঘটনা বলে কি? তবে তাঁর তত্ত্ব সমালোচনার বহির্ভূত নয়। ল্যাডফ্রাঙ্কলিনের মতে মানুষও একদিন বর্ণান্ধ ছিল কিন্তু মানুষের পূর্বপুরুষ বানর, একথা যদি সত্য হয় তাহলে বানরের বর্ণসংবেদন এর সত্যতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত কোন জন্তুর মধ্যে কোন লাল সবুজ বর্ণান্ধ দেখা যায় না, তারা সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ। তবে মোটামুটিভাবে এই তত্ত্বকে সত্য বলে মনে হয়।

উদ্দীপক দেহযন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ (Stimulus, organism and expression)—আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতি সংগ্রাহক যন্ত্রকে যে শক্তি উত্তেজিত করে তাকে বলে উদ্দীপক (Stimulns)। উদ্দীপক জীবের সংগ্রাহক যন্ত্রগুলিকে বা দেহযন্ত্রকে (Organism) উত্তেজিত করে। দেহ যন্ত্র সেই উত্তেজনা গ্রহণ করে এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ (Expression) করে। মনে কর একটি ফুল হাতে নিলে, ফুলের গন্ধ আমাদের দেহ যন্ত্র নাসিকার সাহায্যে মস্তিষ্কের ঘ্রাণাঞ্চলকে উদ্দীপ্ত করল এবং তুমি ঘ্রাণ গ্রহণ করলে। উত্তেজনা দেহযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে ঘ্রাণ সংবেদন রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে উদ্দীপকের উপর সংবেদনের প্রকৃতির সবটা নির্ভর করে না। আমরা জানি একই উদ্দীপকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্রিয়া করে। আবার একই ব্যক্তি একই উত্তেজকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ক্রিয়া করে।

দেহযন্ত্রের গঠন, অবস্থা প্রভৃতির উপরও উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ নির্ভর করে। অতীতের অভিজ্ঞতা জীবের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়। একেই বলে দেহযন্ত্রের গঠন। ফুলটি দেখলাম, এর পূর্বে অনুরূপ ফুল দেখেছি, সেটি যে সুঘ্রাণ পরিবেশন করে তাও জানি। অতীতের অভিজ্ঞতা আছে বলেই ফুলটি দেখামাত্রই ঘ্রাণ গ্রহণ করলাম।

দেহযন্ত্রের সাময়িক অবস্থার উপরেও প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। পেটভরে খাওয়ার পর খাদ্য ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবে না। ব্যক্তি যে কাজটি করছে—তদনুরূপ উদ্দীপকেই সে সাড়া দেয়; অন্য উদ্দীপকে মন দেয় না। স্কুলে যাবার

সময় দেরী হয়ে গেছে ; স্কুলের দিকে মন আছে ; অন্য কোন উদ্দীপকে ছাত্র মনোযোগ দেবে না।

দেখা যাচ্ছে উদ্দীপক প্রযুক্ত হলে দেহযন্ত্র সেই উদ্দীপক গ্রহণ করে। পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতি সংগ্রাহক যন্ত্র উদ্দীপক গ্রহণ করে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে দেয় এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন উদ্দীপকে ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া করে।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is perception ? What are the characteristics of perception ?

প্রত্যক্ষণ কাহাকে বলে ? প্রত্যক্ষণের স্বরূপ বর্ণনা কর।

2. Describe the gestalt view of psychology.

মনোবিজ্ঞানে সমগ্রতা মতবাদের বর্ণনা দাও।

3. How do we perceive solidarity of vision. What are the reasons behind it ?

প্রত্যক্ষন কি ভাবে হয় কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বুঝাইয়া দাও।

4. How do we perceive space ?

আমরা কি ভাবে স্থান প্রত্যক্ষণ করি।

5. Describe the structure and function of an eye.

চোখের গঠন ও ক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

6. Describe the structure and function of ear.

কর্ণের গঠন ও ক্রিয়া বর্ণনা কর।

7. What is sensation ? What are the characteristics of sensation ?

সংবেদন কাহাকে বলে ? সংবেদনের স্বরূপ কি ?

8. What are the errors of perception ? What is illusion ? Give some examples of illusion.

ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ কাকে বলে ? অধ্যাস কি ? ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষণ

(Learning)

শিক্ষণ (Learning)

মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় এবং এর জন্য তাকে নূতন আচরণ আয়ত্ত করতে হয়। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ নূতন পরিবেশে নূতন আচরণ করতে পারে। শিক্ষণে কিন্তু শুধু নূতন আচরণ কিছু করলেই হবে না, সেই নূতনকে মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে তাকে ব্যবহার করতে হবে। এক কথায় পরিবেশের উপযোগী নূতন কৌশল আয়ত্ত করাকেই বলে শিক্ষণ।

শিক্ষণের **বৈশিষ্ট্যগুলি** নীচে আলোচনা করা হল—

(১) শিক্ষণের প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল নূতন আচরণ করার কৌশল অর্জ্জন। ছোট শিশু একবার গরম জিনিষে হাত দিলে হাত পুড়ে গেল, এরপর থেকে সে আর কখনও অনুরূপ ক্রিয়া করবে না। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তার এই নূতন আচরণ।

(২) শিক্ষনে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

(৩) শিক্ষণে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নূতন সমস্যার সমাধান করা অথবা পুরাতন অভিজ্ঞতার উন্নতি সাধন করা হয়।

(৪) শিক্ষণের ফলাফল প্রীতিকর হওয়া চাই।

(৫) উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে দ্রুত ও স্থায়ী শিক্ষালাভ হ'ল শিক্ষণ।

(৬) শিক্ষণে পুরাতন অনুপযোগী আচরণকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

(৭) শিক্ষণে একটি সমস্যামূলক বিষয় থাকা দরকার। সেই সমস্যা সমাধানের তাগিদেই জীবকে নূতন আচরনের আশ্রয় নিতে হয়।

(৮) পুরাতন আচরণকে বাতিল করতে হলে বারবার অভ্যাসের প্রয়োজন হয়।

(৯) শিক্ষণ হ'ল সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমাদের আচরণে পরিবর্তন করে আমরা নূতন আচরণ আয়ত্ত করতে পারি।

(১০) প্রবলীকরণ (Reinforcement) শিক্ষণের একটি প্রধান অঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোকের মুখ দেখছি; তার মধ্যে একজনকে দেখে ভালো লাগলো তাকে মনে রাখলাম।

(১১) শিক্ষণের মূলে আছে প্রেষণা। প্রেষণা জীবকে পরিবেশে উপযোগী কাজটি করার জন্য তৎপর কোরে তোলে।

শিক্ষণের প্রকার (kinds of learning) :—শিক্ষণ একটি খুব ব বিষয়। তিনভাবে এর শ্রেণীবিভাগ করা যায়—(১) প্রচেষ্টা ও ভু সংশোধন করে শেখা (২) অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা ও (৩) অনুবর্তিত ক্রিয়া সাহায্যে শেখা।

(১) **প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন করে শেখা** (Trial and Erro learning)। থর্নডাইক (Thorndike) ও হল (Hall) এই নীতি প্রবর্তক। থর্নডাইকের মতে আমরা কোনো কাজ করার সময়, চেষ্টা করি ভুল করি, আবার চেষ্টা করি। এইভাবে বারবার চেষ্টা করা ও ভুল সংশোধ করার পর আমরা কোন কিছু শিক্ষা করি। তাঁর মতে আমরা শিক্ষা কা যান্ত্রিক উপায়ে। থর্নডাইক তাঁর মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব পরীক্ষা করেছেন। একটি বিড়ালকে নিয়ে তিনি যে সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষাটি করেছিলেন, সেটির বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

একটি বড় খাঁচার মধ্যে তিনি একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে বন্ধ করে রাখলেন। খাঁচাটির বাইরে এক টুকরো মাছ এমনভাবে রাখা হল যেন বিড়ালটি সেটি দেখতে পায়। দরজা এমনভাবে বন্ধ ছিল যে সামান্য চাপ দিলেই ছিটকিনিট খুলে যাবে। প্রথমে খাঁচার ভেতর থেকেই থাবার সাহায্যে সে মাছটি নেবার চেষ্টা করল, ব্যর্থ হওয়ার পর দরজাটি আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল, থাবা দিয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগল। এইভাবে চেষ্টা করার সময় হঠাৎ ছিটকিনিতে চাপ পড়ায় দরজাটি খুলে গেল এবং বিড়ালটি বেরিয়ে এসে মাছটি খেয়ে ফেলল। পরের দিন ঘটনায় পুনরাবৃত্তি করা হ'ল। দেখা গেল এবারও বিড়ালটি অনুরূপ ব্যবহার করল। এইরূপ পর পর কয়েকদিন ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর দেখা গেল বিড়ালের ভুলের পরিমাণ কমে আসছে অবশেষে এমন

একদিন এল যেদিন প্রথমবারের চেষ্টাতেই সে খাঁচার দরজা খুলতে সমর্থ হল ঐ দিনই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা বিড়ালের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল।

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিকমত যোগস্থাপন করাই হল শিক্ষণ। ধর কোন ছাত্রকে বীজগণিতের একটি অঙ্ক দেওয়া হল, পর পর অনেকগুলো সূত্র প্রয়োগ করে, নানাভাবে অঙ্কটি করবার চেষ্টা সে করল অবশেষে একটি সূত্র প্রয়োগ করার পর তার অঙ্কটি হয়ে গেল। এখানে চেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা সে অঙ্কটি করতে শিখল। থর্নডাইক বলেছেন শিক্ষণ হ'ল কতগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল মাত্র; এর মধ্যে মননশীলতা বা বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বারবার চেষ্টা করে, ভুল প্রচেষ্টাগুলিকে পরিহার করে উদ্দীপকের উপযোগী প্রতিক্রিয়াই হ'ল শিক্ষণ।

থর্ণডাইকের সূত্র ও তার সমালোচনা (Thorndike's laws of learning and their criticism)

থর্ণডাইক শিক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণার পর শিক্ষণের কতকগুলি সূত্র উপস্থাপিত করলেন। তিনি প্রধান তিনটি ও অপ্রধান ৫টি সূত্রের কথা বললেন।

থর্ণডাইকের তিনটি প্রধান সূত্র হ'ল :—(১) অনুশীলনের সূত্র (law of Exercise) (২) প্রস্তুতির সূত্র (law of Readiness) ও (৩) ফলাফলের সূত্র (law of effect)

(১) **অনুশীলনের সূত্র** (law of Exercise)

কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বারবার সংযোগ স্থাপন করা হয় তাহলে সংযোগ দৃঢ় হবে। আর যদি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বেশ কিছুদিন সংযোগ না স্থাপিত হয় তাহলে পূর্ব্বে স্থাপিত সংযোগ ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসবে। একেই থর্ণডাইক বলেছেন অনুশীলন।

শিক্ষণে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে অভ্যস্ত ক্রিয়া অনুশীলনের সাহায্যেই হয়ে থাকে। যেমন সাইকেল চালান, মোটর গাড়ী চালান প্রভৃতি, অনুশীলনের পর শেখা যায়।

১০

(২) প্রস্তুতির সূত্র (law of Readiness)

শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সময় শিক্ষার্থীর মানসিক অথবা দৈহিক প্রস্তুতি সংযোগকে সুদৃঢ় করে। যেমন কোন পত্ত মুখস্থ করার সময় মন প্রস্তুত না থাকলে মুখস্থ করতে দেরী হবে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বারবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। (৩) ফলাফলের সূত্র (Law of effect)ঃ—উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পর ফলাফলটি তৃপ্তিদায়ক হওয়া চাই। ফলাফল তৃপ্তিদায়ক না হলে সংযোগ শিথিল হতে হতে কালক্রমে একেবারেই থাকবে না। বিড়ালের পরীক্ষার সময় বিড়াল যদি মাছটি না খেতে পেত, তাহলে খাঁচার বাইরে যাবার জন্ত এতবার চেষ্টা করত না। এখানে খাঁচা খোলার পর বারেবারেই মাছ পাওয়া যাচ্ছে দেখে বিড়াল খাঁচা খোলার উপায়টি শিখল ও মনে রাখল।

থর্ণডাইকের অপ্রধানসূত্রগুলি হল :—

(১) একই উদ্দীপকে বহু প্রতিক্রিয়া হতে পারে (Law of multiple response to the same external situation) ব্যক্তি অভিজ্ঞতা লাভ ও বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই উদ্দীপকে ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া করে। শৈশবে অন্ধকারে ভূতের ভয় হবে ; বয়সকালে অন্ধকারে চোরের ভয় বা সাপের ভয় হতে পারে। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে উদ্দীপকের অর্থ পরিবর্তিত হয় বলে প্রতিক্রিয়াও ভিন্নরূপ হয়।

(২) মনোভাব, প্রস্তুতি ও মেজাজ (Attitude, set or disposition) কোনো উদ্দীপকে ব্যক্তি কিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে তা নির্ভর করে ব্যক্তির তখনকার মনোভাব, প্রস্তুতি ও মেজাজের ওপর। পরীক্ষার পর পড়ার বই ছাত্রের ভাল লাগবে না। ক্ষুন্নিবৃত্তির পর বাঘ শিকার দেখলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। এখানে প্রয়োজন নেই বলে ব্যক্তি উদ্দীপককে গ্রহণ করার জন্ত প্রস্তুত হয়নি। পরীক্ষায় ফেল করার সংবাদ পাওয়ার পর মেজাজ খারাপ থাকায় সিনেমা ভাল লাগবেনা।

(৩) একটি উদ্দীপকের সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়ার যোগস্থাপন হলে অনুসঙ্গবদ্ধ অপর উদ্দীপকেও একই প্রতিক্রিয়া হবে। (Law

of associative shifting) বন্ধুর সঙ্গে লেকের ধারে বেড়াতে যেতাম; পরে লেক দেখলে বন্ধুকে মনে পড়বে।

(৪) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity) :— সমগ্র উদ্দীপক বা ঘটনাটি উপস্থাপিত না হলেও ঘটনার অংশ বিশেষেও প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ঝড় বৃষ্টির সময় গাড়ী উল্টে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল? বৃষ্টি পড়লেই দুর্ঘটনার কথা মনে হবে।

(৫) সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Similarity) :—একটি উদ্দীপকে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনুরূপ উদ্দীপকেও সেই একই প্রতিক্রিয়া হবে।

সমালোচনা (Criticism)

থর্ণডাইক শিক্ষণের যে সূত্রগুলি উপস্থিত করলেন সেগুলি সমালোচনা বহির্ভূত নয়। থর্ণডাইক বললেন শিক্ষণ হল যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সাধন ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষণের জন্য বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। বারবার চেষ্টা করে ভুল সংশোধন করে ব্যক্তি উদ্দীপকের উপযুক্ত ক্রিয়াটি শিখে নেয়।

থর্ণডাইকের এ মতবাদ মেনে নেওয়া যায়না। শিক্ষণ কখনই যান্ত্রিক নয়; উদ্দীপকটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে বিচার বুদ্ধি সহকারেই মানুষ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করে থাকে। অন্ধের মত চেষ্টা করে আর ভুল সংশোধন করে নয়। অঙ্ক কষার সময় একভাবে না হলে, অন্যভাবে অঙ্কটি কষি কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে সূত্রটি দিয়েও অঙ্কটি কষতে পারি না কি? আসলে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই আমরা শিক্ষা করি তবে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঠিক প্রতিক্রিয়াটি আবিষ্কার করতে না পারলে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সাহায্যে অগ্রসর হই।

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে সময়ের ও শক্তির অযথা অপচয় ঘটে। সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলে তাড়াতাড়ি ঠিক প্রতিক্রিয়াটি করা সম্ভব হয়।

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে ভুলের পরিমাণ ক্রমশঃ কম হয় সত্য কিন্তু আপনা আপনি হয় না। মানসিক চেষ্টার দ্বারা ভুলটি মনে রাখি ও সংশোধন করি।

কেবলমাত্র চেষ্টা করলে আর ভুল করলেই শেখা হয় না। শেখার জন্য আগ্রহ, মনোযোগ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে।

শিক্ষায় অনুশীলনের সাহায্য দরকার হয় সত্য কিন্তু শুধু অভ্যাস ব অনুশীলনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিষয়টি অর্থপূর্ণ না হলে, মনোযোগের দ্বারা না শিখলে শেখা যায় না। আবার কোন আবেগময় অভিজ্ঞতা যেমন শোক দুঃখ বা আনন্দের ঘটনা অনুশীলন ছাড়াও মনে থাকে।

থর্ণডাইক বলেছেন ফলাফল তৃপ্তিদায়ক হলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ দৃঢ় হয় এবং অতৃপ্তিকর হলে সংযোগ বিলুপ্ত হয় কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় বেদনাদায়ক সংযোগটিই সুদৃঢ় হয় এবং অনেকদিন মনে থাকে।

(২) অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা (Learning by Insight):—

সমগ্রতাবাদীদের মতে শিক্ষণ হ'ল সমগ্র পরিস্থিতিটির পর্যালোচন করে, তার পূর্ণ স্বরূপটি প্রথমে বুঝে নিতে হবে, তারপর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা সদৃশ বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষণ করে থাকি। শিক্ষণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, শিক্ষণ হ'ল সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি উপলব্ধি করে প্রতিক্রিয়া করা।

অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষের সময় ব্যক্তি সমস্ত পরিস্থিতিটির সংগঠন লক্ষ্য করে ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হয়।

অন্তর্দৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথমে পরিস্থিতিটি সমগ্রভাবে পর্যালোচন করতে হবে তারপর বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। শেষে বিষয়টির অন্তর্নিহিত ভাবটি আহরণ করে নিতে হবে। এই অন্তর্নিহিত ভাব বা তত্ত্বটি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত সমাধানটি আবিষ্কৃত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ সমগ্রতাবাদী কোহলার শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত শিম্পাজী সুলতানের পরীক্ষাটি নীচে বর্ণিত হ'ল।

সুলতানকে একটি বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হ'ল। খাঁচার ভেতরে দুটি বাঁশের টুকরো রাখা হ'ল। খাঁচার বাইরে একটু দূরে এমনভাবে কয়েকটি কলা রাখা হ'ল যেন সে হাতটি বাড়িয়ে, অথবা একটি বাঁশ দিয়ে কলা টেনে আনতে না পারে। সুলতান প্রথমে হাত দিয়ে কলা নেবার চেষ্টা করল,

তারপর একটি বাঁশ নিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে দেখল তারপর সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে খাঁচার পেছন দিকে চলে গেল। সেখানে দুটি বাঁশ নিয়ে সে খেলা করতে লাগল। বাঁশ দুটির মধ্যে একটি ছিল অন্যটির থেকে পুরু, আর মুখটি খোলা। সরু বাঁশটি হঠাৎ পুরু বাঁশটির মধ্যে ঢুকে গেল। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিয়ে খাঁচার সামনে এল এবং সেটির সাহায্যে সব কলাগুলি টেনে নিয়ে এল।

উপরের পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে অন্তর্দৃষ্টি হঠাৎ আসে। সুলতান প্রথমে বুঝতে পারেনি বাঁশ দুটির সাহায্যে কলাগুলি আনা সম্ভব। সমগ্র পরিস্থিতিটি বুঝে নেবার পর হঠাৎ তার মাথায় এল ঐ বাঁশটিকে দিয়ে চেষ্টা করার কথা।

আজকাল শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে সময় ও শক্তির অযথা অপব্যয় হয়; অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই অপচয় বন্ধ করা যায়।

অন্তর্দৃষ্টি আসে সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা। অন্তর্দৃষ্টি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়। এই প্রক্রিয়া কল্পনা, বিচার বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তিকে সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করে।

অন্তর্দৃষ্টি হয় কখনও সম্মুখদৃষ্টি (fore-sight) আবার কখনও বা পশ্চাৎ দৃষ্টি। (Hindsight) শিম্পাঞ্জী যখন জোড়া দেওয়া বাঁশটি নিয়ে ছুটে গেল কলা আনবার জন্য তখন তার সম্মুখ দৃষ্টি ছিল। সে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল। লক্ষ্যে পৌছানর পথ সে দেখতে পেয়েছিল। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি যখন সামনে থাকে এবং বোধগম্য হয় তখন সম্মুখ দৃষ্টি চলে। কিন্তু থর্ণডাইকের বিড়ালের সামনে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি ছিল না বা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি সে দেখতে পায়নি। সে শুধু একটি সম্ভাব্য পথ পেয়েছিল। সেইজন্য বার বার চেষ্টার পর, খাঁচার দরজা খুলতে পেরেছিল এবং পরের দিন থেকে ভুল চেষ্টাগুলি পরিহার করবার চেষ্টা করেছিল। একে বলা হয় পশ্চাৎ দৃষ্টি (hind-sight)। যখন সমগ্র পরিস্থিতিটি বুঝবার জন্য চেষ্টা করতে হয় তখন পশ্চাৎদৃষ্টি শ্রেয়।

(৩) অনুবর্তিত ক্রিয়া (Conditioning)

একটি বিশেষ উদ্দীপকে ব্যক্তি একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া করে। একে বলে অনমুবর্তিত ক্রিয়া। ঐ বিশেষ উদ্দীপককে বলে স্বাভাবিক উদ্দীপক। যেমন খাবার সামনে দেখলে মুখ লালারসে সিক্ত হয়। এখানে খাবার হ'ল স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং খাবার দেখে লালা গ্রন্থিরস নিঃসরণ হল ঐ উদ্দীপকের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া। অনমুবর্তিত ক্রিয়াকে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াও বলা হয়। কারণ এই ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, শিক্ষাজাত নয় এবং ইহা নিমেষের মধ্যে সাধিত হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একটি বিকল্প উদ্দীপকেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। উপযুক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে অপর একটি উদ্দীপক বারবার উপস্থাপন করলে এরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন খাবার দেবার সময় উজ্জ্বল আলো জেলে বারবার কোন জীবকে খেতে দেওয়া অভ্যাস করা হ'ল। এরপর শুধু আলো জলতে দেখলেই তার মুখ থেকে লালা ঝরবে। একটি বিশেষ পাত্রে কুকুরকে খেতে দেওয়া হল। পাত্রটিতে খাবার না থাকলেও শুধু পাত্রটি দেখলেই মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হবে। এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক হ'ল খাদ্য এবং বিকল্প উদ্দীপক হ'ল খাবারের পাত্র। বিকল্প উদ্দীপকে যখন অনুরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় তখন তাকে বলে অনুবর্তিত ক্রিয়া (conditioning)।

সুপ্রসিদ্ধ রুশ বৈজ্ঞানিক আইভ্যান পি প্যাভলভ একটি কুকুরকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

প্যাভলভ প্রথমে কুকুরকে খাবার দিলেন; কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হ'ল। প্যাভলভ এই লালা নিঃসরণকে বললেন অনমুবর্তিত ক্রিয়া এবং শিক্ষা ব্যতীত এই প্রতিক্রিয়া হওয়ায় ঐ উদ্দীপককে বললেন স্বাভাবিক উদ্দীপক (unconditioned stimulus)। এর পর তিনি খাবার দেবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্তে ঘন্টা বাজালেন। কয়েকদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হল। তিনি লক্ষ্য করলেন খাবার দেবার পূর্ব্বেই ঘণ্টা শোনা মাত্র কুকুরের লালা নিঃসরণ হল। অনুবর্তন স্থাপিত হ'ল। ঘন্টা এখানে বিকল্প উদ্দীপক (conditioned stimulus). ঘণ্টা বাজার প্রতিক্রিয়া হল লালা নিঃসরণ। ঘন্টা ও খাদ্য অনুষঙ্গ বদ্ধ হওয়ায় কুকুরটি শিখল যে ঘন্টা পড়লেই খাবার আসবে। ঘন্টার শব্দ এখানে লালা নিঃসরণ করতে সমর্থ হ'ল।

এরপর প্যাভলভ তাঁর পদ্ধতির পরিবর্তন করলেন। তিনি কয়েকদিন শুধু ঘণ্টা বাজালেন কিন্তু খাবার দিলেন না। কয়েকদিন এরূপ করার পর দেখা গেল কুকুরের লালা ক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশই কমে আসতে লাগল এবং শেষে দেখা গেল লালা নিঃসরণ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। প্যাভলভ একে বললেন অনুবর্তনের লোপ (extinction)। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে অনুবর্তনের জন্য প্রবলীকরণ (reinforcement) দরকার; এখানে খাদ্য হ'ল প্রবলীকরণ।

প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষার জন্য বাত-প্রতিরোধক কক্ষ নির্মাণ করলেন। ঐরূপ আটটি কক্ষে তিনি তাঁর পরীক্ষণ কার্য্য চালাতেন। তিনি কুকুরের গণ্ডদেশে একটি ছিদ্র করে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে একটি রবারের নল ঢুকিয়ে দিলেন। নলটি লালানিঃসারী গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল। নলটির অপর মুখটি একটি দাগকাটা কাঁচের পাত্রে রাখা হ'ল। লালা নিসরণ হলে লালারস ঐ রবারের নলের ভেতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় দাগ কাটা কাচের পাত্রে পড়ে। কাচের পাত্রের সঙ্গে কাইমোগ্রাফের স্টাইলাসটি যোগ করা হল, যাতে লালারস পাত্রে পড়লে স্টাইলাসটি কিমোগ্রাফের ধোঁয়ান কাগজে দাগ কাটে।

কুকুরটিকে বাত নিরোধক কক্ষের একটি টেবিলের উপর দাঁড় করান হ'ল। একটি কাঠের ফ্রেমে তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হ'ল যাতে খুব বেশী নড়াচড়া করতে না পারে অথচ বেশ সহজভাবে দাঁড়াতে পারে।

খাদ্যদানকারীর উপস্থিতি পাছে কুকুরটিকে প্রভাবিত করে সেইজন্য প্যাভলভ খাদ্যদানের সময় যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করলেন। পরীক্ষকের উপস্থিতিতে পরীক্ষণ কার্য্য যাতে কোনরকমে প্রভাবিত না হয় তার জন্য তিনি নিজে ঐ ঘরে থাকতেন না। পাশের ঘর থেকে পেরিস্কোপের সাহায্যে কুকুরটিকে লক্ষ্য করতেন।

পরীক্ষার আগে কুকুরকেও বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা দিয়ে নেওয়া হ'ত।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষা থেকে প্যাভলভ কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

(১) অনুবর্তন স্থাপনের জন্য স্বাভাবিক ও বিকল্প উদ্দীপক বারবার উপস্থাপন করা দরকার।

(২) এর জন্য সব সময়ই প্রবলীকরণ (reinforcement) প্রয়োজন।

খাদ্য এইরূপ একটি প্রবলীকরণ। খাদ্য ব্যতীত পূর্ব্বে স্থাপিত অনুবর্ত্তন নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) খাদ্য দেরীতে দিলে অনুবর্ত্তন স্থাপিত হতে দেরী হয়।

(৪) অনুবর্ত্তন স্থাপনের জন্য পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার এবং শিক্ষার দরকার।

(৫) উদ্দীপকের একই শ্রেণীকরণ (generalisation of stimulus): প্যাভলভ আবিষ্কার করলেন যে উদ্দীপকের একই শ্রেণীকরণ সম্ভব। একটি অনুবর্ত্তন স্থাপনের পর—তিনি দেখলেন তাঁর কুকুরের ঘণ্টার শব্দ শুনে লালাক্ষরণ হয়। এরপর ঘণ্টার শব্দ না করে অন্য কোন শব্দ যেমন মেট্রোনোম শুনেও তার লালা ক্ষরণ হতে দেখা গেল। একে বলে উদ্দীপকের একই শ্রেণী করণ। এখানে উদ্দীপকটিকে একই ধরণের হতে হবে, অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে অনুবর্ত্তন স্থাপিত হলে যে কোনো ধরণের শব্দ করলেই কাজ হবে। তবে এক্ষেত্রে লালার পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কম হবে।

প্যাভলভের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Pavlov's Theory)।

প্যাভলভের মতে শিক্ষণ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া কিছুই না। আমরা যা কিছু শিক্ষা করি সবই করি অনুবর্ত্তনের সাহায্যে। জটিল শিক্ষাকে তিনি বললেন অনেকগুলি অনুবর্ত্তন ক্রিয়ার ধারা। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা প্যাভলভের মতবাদকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আচরণ-বাদীদের কাছে মানুষের আচরণই সব; উদ্দীপনা প্রয়োগ করা হলে মানুষ তার প্রতিক্রিয়া করে। মন, চিন্তা, কল্পনা-বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি আচরণবাদীরা স্বীকার করে না। তাঁদের মতে আমাদের অভ্যাস, পছন্দ, ভয়, রাগ প্রভৃতি সব কিছুই সৃষ্ট হয়েছে অনুবর্তন ক্রিয়া থেকে। ওয়াটসন শিশুর ভয় নিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখলেন প্রথমে শিশুর ভয় থাকে না, পরিবেশ থেকে সে ভয় শেখে। শিশুর সামনে একটি লোমশ পুতুল রাখা হল। শিশু যতবার সেটি নেবার জন্য হাত বাড়ায় ততবারই উচ্চ শব্দ করা হয়। শিশু তখন ভয় পেয়ে হাত সরিয়ে নয়। এরপর এমন হ'ল যে লোমশ কিছু এমন কি শুধ্ লোম দেখলেই সে ভয় পায়। ওয়াটসন প্যাভলভের মতে মত দিয়ে বললেন—আমরা যা কিছু শিখি সবই শিখি অনুবর্ত্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে।

কিন্তু প্যাভলভের এ মতবাদ মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের মানসিক প্রবণতা যেমন ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, আগ্রহ, প্রভৃতিকে বর্জন করে শিক্ষার এইরূপ মতবাদ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা কখনও যান্ত্রিক নয়, নিছক উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া রূপ দৈহিক ক্রিয়া নয়।

তবে এ কথাও ঠিক অনুবর্তনকে আমরা শিক্ষা থেকে একেবারে বর্জনও করতে পারি না। শিক্ষা জগতে এর মূল্য অপরিসীম। অঙ্ক বা সংস্কৃতের শিক্ষকের উপর বিরাগবশতঃ ছাত্র অঙ্ক ও সংস্কৃত বিষয়টিকেই পরিহার করতে পারে। শিশুর প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতিও এইভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। মা যে সব জিনিষ ভালবাসে, শিশুর কাছে সেইসব জিনিসের আদরই বেশী। শিশুর ভাষা শিক্ষাও এই প্রক্রিয়াতেই হয়ে থাকে। শিশুর একটি মাত্র উচ্চারিত ধ্বনি মাকে আকর্ষণ করে আনে, চি— বললেই মা চিনি আনে। এইভাবে শিশু সমস্ত ভাষাটি আয়ত্ত করে।

আমাদের অভ্যাসের মূলেও এই প্রক্রিয়া বর্তমান। ছোটবেলা থেকে শিশু অনুবর্তনের সাহায্যে নানা কাজে অভ্যস্ত হয়। সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা প্রভৃতি অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলি আমরা এইভাবে শিখি।

শিক্ষণের কয়েকটি প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান (Some important factors in learning)।

শিক্ষণের সাধারণ কোন মতবাদ এ পর্য্যন্ত মনোবিদগণ গ্রহণ করেন নি। নানাদিক থেকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়টির আলোচনা করেছেন। আমরা সেই সব মতবাদের প্রধান উপাদানগুলির আলোচনা করব।

পর্য্যবেক্ষণ (Observation) :—পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানা। একবার সেগুলি শিখতে পারলে, পরে আর বারবার অনুশীলন করে শিখতে হয় না কারণ কিভাবে অগ্রসর হবে অথবা পরিহার করবে তা ভাল করে জানা থাকলে পরে ভুল হবে না। ইঁদুর যদি শেখে যে খাবারের পাত্রের শব্দের অর্থই হ'ল খাদ্য তখন কিভাবে পাত্রের কাছে যাবে তা আর শিখতে হয় না।

লক্ষ্যের দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করার সময় একবার নিক্ষেপ করলে ফল লাভ

হ'ল না, লক্ষ্যের উপরদিকে অস্ত্র বিদ্ধ হল ; তখন দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করার সময় তুমি নিশ্চয়ই আর একটু নীচু করে অস্ত্রটি নিক্ষেপ করবে। কিন্তু যদি কোথায় তোমার অস্ত্রটি বিদ্ধ হয়েছে দেখতে দেওয়া না হয়, তাহলে তুমি অন্ধের মত যেমনভাবে খুসী অস্ত্র নিক্ষেপ করে যাবে, তোমার শ্রম ও প্রচেষ্টার অপব্যয় হবে। অতএব শিক্ষণে ফলাফলের জ্ঞান লাভ করা দরকার। (Knowledge of result) যতই ব্যক্তি অবস্থাটিকে নিখুঁতভাবে জানবে এবং সমস্যাটিকে বুঝবে ততই সে শিখবে সমস্যার সমাধানের জন্য কি প্রয়োজন হবে। এক কথায় মনোযোগ দিয়ে ও গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে সহজে শেখা যায় এবং উপযুক্ত শিক্ষা হয়।

অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি (Exercise and repetition) :—সরল কাজগুলি একবারের প্রচেষ্টাতে শেখা যায়। কিন্তু জটিল ক্রিয়া আয়ত্ত করার জন্য বার বার চেষ্টা করার দরকার। কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি যদি কোন কারণে তোমার আগ্রহান্বিত করতে পারে তাহলে তুমি তার নামটি জেনে রাখবে এবং একবারের চেষ্টায় সে নাম মনে করে রাখবে। কিন্তু তার সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ না থাকলে তার নামটি মনে রাখার জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হবে।

পুনরাবৃত্তির সময় (Timing of repetition) :—যদি বিশেষ শিক্ষণীয় অবস্থাটি বহুদিন আর না আসে তাহলে প্রথম বারের শিক্ষার কিছুই মনে থাকে না। পুনরাবৃত্তির সময়ের ব্যবধানের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমার বাইরে চলে গেলে পূর্বের শেখা বিষয় মনে থাকে না।

প্রবলীকরণ (Reinforcement) :—শুধু অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি নয় শিক্ষণের জন্য প্রবলীকরণ দরকার। ফলাফলের জ্ঞান না হলে প্রবলীকরণ হয় না। প্যাভলভের পরীক্ষায় আমরা দেখেছি প্রবলীকরণের জন্য খাদ্য উপস্থাপন না করার ফলে পূর্বের স্থাপিত অনুবর্তন নষ্ট হয়ে গেছে। প্রবলীকরণকে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী পুরস্কার (reward) ও শাস্তি (punishment) বলেছেন। প্যাভলভের কুকুর এবং থর্ণডাইকের বিড়াল খাদ্য দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিল। শিশু গরম জিনিষে হাত দেওয়ার জন্য শাস্তি পেল, তার হাত পুড়ে গেল। এর পর সে গরম জিনিষকে পরিহার করে চলবে।

প্রেষণা (Motivation) :—জীব উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলে কিছুই শিক্ষা করে না। ফললাভের উদ্দেশ্যে মানুষ কাজ করে। এই উদ্দেশ্য খাদ্য লাভ হতে পারে, আবার বিপদ থেকে পলায়নও হতে পারে।

উদ্দেশ্য প্রবল হলে যেমন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত জীব খাদ্য লাভের সম্ভাবনায় সোজাসুজি লক্ষ্য পথে ছুটে যায়; সমস্ত অবস্থাটিকে পর্য্যবেক্ষণ করার ধৈর্য্য তার থাকে না। ব্যর্থ হলে তখন সে ক্রুদ্ধ হয় অন্যভাবে লক্ষ্য অভিমুখে যাবার চেষ্টা করে না।

সেইজন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুরস্কার বা প্রবলীকরণ দরকার। শিক্ষায় ফললাভ না হলে ব্যক্তির শিক্ষার আগ্রহ চলে যায়।

যে ক্রিয়ায় ফললাভ হয় না সে ক্রিয়া পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কখনও কখনও দেখা গেছে ফললাভে ব্যর্থ হবার পরও ব্যক্তি সেই একই ভাবে কাজ করে। এর অর্থ কি? ফললাভের কল্পিত পুরস্কারের (assumed re-inforcement) আশায় সম্ভবতঃ সে ক্রিয়া করে। ব্যক্তির মনে হয়ত ধারণা থাকতে পারে যে সে কিছুটা কাজ করেছে কিন্তু বাস্তবে সে কিছুই করে নি। শিশু কুকুরকে ভয় করে; কুকুর না কামড়ালেও সে কুকুর দেখলেই পলায়ণ করে এবং মনে মনে ভাবে পলায়ন না করলে নিশ্চয়ই তাকে কুকুরে কামড়ে দিত। সুতরাং তার ভয়কে এখানে প্রবল করা হল কল্পনার সাহায্যে।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What do you mean by learning? What are its characteristics.

শিক্ষণ বলতে কি বোঝ। শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

2. Explain and criticise Thorndike's trial and Error learning.

থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন শিক্ষণের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর।

3. Explain and criticise insightful learning.

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষণ মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর।

4. What do you mean by conditioning. Explain Pavlov's experiment in conditioning.

অনুবর্তন বলিতে কি বোঝ? প্যাভলভের অনুবর্তনের পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

5. Explain learning by conditioning.

অনুবর্তনের সাহায্যে শিক্ষণের ব্যাখ্যা কর।

6. Give short notes on :—

Extinction of conditioning অনুবর্তনের বিলোপ, reinforcement প্রবলীকরণ, Law of multiple response বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র।

অষ্টম অধ্যায়

স্মরণ ক্রিয়া

(Remembering)

স্মরণ ক্রিয়া ও স্মৃতি (Memory):—স্মৃতিকে ঘিরেই আমাদের সভ্যতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু স্মৃতি আমরা কাকে বলব। স্মৃতি কথাটি হ'ল বিশেষ্য ; স্মৃতি হল অতীতের ঘটনার পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা ; আর স্মরণ ক্রিয়া হল অতীতের ঘটনার পুনরুদ্রেক। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্মৃতির পার্থক্য থাকতে পারে। স্মরণ ক্রিয়া হল অতীত অভিজ্ঞতাকে চেতন মনে ফিরিয়ে আনা। উডওয়ার্থ (wood worth) বলেছেন স্মরণ ক্রিয়া হল পূর্ব্বে যা শিখেছি তা মনে করা। অতএব স্মরণ ক্রিয়ার জন্য একদিকে দরকার অতীতের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ অপরদিকে দরকার পুনরুদ্রেক। কারণ শুধু অতীত ঘটনা মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হলে তাকে আমরা স্মরণ-ক্রিয়া বলতে পারি না। পুনরুদ্রেক না হলে সংরক্ষণের পরিমাপ হয় না।

আবার স্মরণ ক্রিয়া ও কল্পনা এক নয়। কল্পনায় ঘটনা অতিরঞ্জিত হতে পারে। স্মরণ ক্রিয়ার জন্য ঘটনার অবিকল পুনরুদ্রেক দরকার। এইজন্য উডওয়ার্থ স্মরণ ক্রিয়াকে বলেছেন কল্পনার পুনরুদ্রেক (Reproductive Imagination)।

স্মৃতির উপাদান (Factors of memory) :—

স্মরণ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায়।

১। **শিক্ষণ (learning) :—**অতীত ঘটনাকে স্মরণ করতে হলে প্রথমে দরকার শিক্ষণ। পূর্ব্বে কিছু না শিখলে অভিজ্ঞতা হয় না আবার অভিজ্ঞতা না হলে স্মরণ করব কাকে। তাই কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করে বা কোন কিছু শিক্ষা করে তাকে আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করে রাখি।

শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে :—

(১) যেমন বার বার আবৃত্তি করে মুখস্থ করা। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয় যদি কেবল অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা হয় তাহলে শিখতে দেরী হয়

এবং বেশীদিন মনে থাকে না। অতএব পাঠ্যবিষয়টি বুঝে অভ্যাস করা প্রয়োজন।

(২) অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে ও শেখা যায়। একে বলে চেষ্টা ও ভুলের সমন্বয়ে শেখা (Trial and Error learning)। শিক্ষার্থী প্রথমে একভাবে কোন এক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। তারপর ভুল করে বুঝতে পারে সেভাবে হবে না। তখন আবার অন্যভাবে চেষ্টা করে। এইভাবে বার বার চেষ্টা করে হঠাৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলে।

(৩) অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যেও শেখা যায়। যেমন প্রথমে সমস্যাটি বেশ করে দেখে, বুঝে এবং মনে মনে ভেবে নিয়ে অগ্রসর হলে প্রায়ই ভুল হয় না এবং সময়ও বেশী লাগে না।

শিখনের লেখচিত্র (Learning Curve) :—শিখনের প্রকৃতি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। বার বার শেখার ফলে দ্রুত উন্নতি হয় না ধীর উন্নতি হয়? মনে কর টাইপরাইটিং শিখছি এবং প্রতিদিন আধঘণ্টা অভ্যাস করছি। প্রতিদিন টাইপ করা শব্দের সংখ্যা গণনা করে ফলাফল দ্বারা যদি একটি লেখচিত্র অঙ্কন করি তাহলে আমরা শিখনের লেখচিত্র পাব। এইরূপ একটি লেখচিত্র নিয়ে দেওয়া হল।
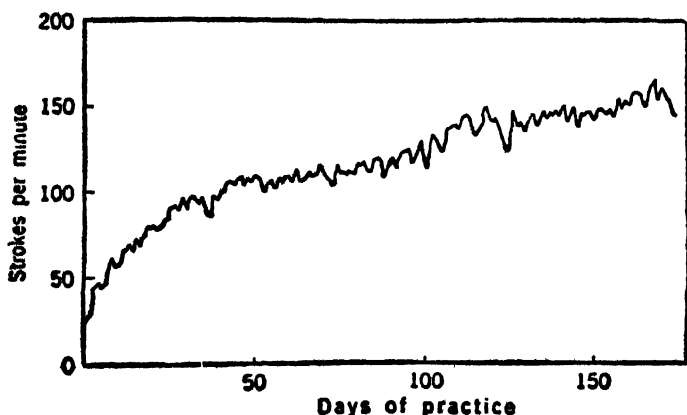
চিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে প্রথমের দিকে শিখনের উন্নতি খুব দ্রুত। কিন্তু পরে উন্নতির হার ক্রমশঃ কমতে কমতে 'একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

উন্নতির হার বন্ধ হতে দেখে প্রথমে মনে হবে বুঝি বা শিখনের শেষ সীমা এসেছে। কিন্তু তা নয়। কিছুদিন পরে আবার উন্নতির হার বাড়তে থাকে। উন্নতির হার যে সময়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় সেই সময়টাকে বলা হয় প্লেটো পিরিয়ড (Plateau Period)!

সহজ শেখা (Economy in Learning)

স্মৃতিশক্তি বাড়ান যায় কিনা অথবা উত্তম স্মৃতিশক্তি বলে কিছু আছে কিনা এবিষয় নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা সকলে একমত যে স্মৃতি একটি সহজাত শক্তি যাকে বাড়ান বা কমান যায় না। তবে সহজে মনে রাখার কতকগুলি উপায় তাঁরা বলেছেন। নিম্নে সেগুলি দেওয়া হল।

(১) **পাঠ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে পাঠক কি-ভাবে বিষয়টি মুখস্থ করবে।**

"Paired association" test-এ অভীক্ষক কতকগুলি শব্দ জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে নেয় এবং প্রত্যেক জোড়া শব্দ অভীক্ষার্থীর কাছে বলে যায়। কিন্তু যেহেতু অভিক্ষার্থী জানে যে এগুলি তাকে পর পর মুখস্থ রাখতে হবে না এবং প্রত্যেক জোড়ার প্রথম শব্দটি বললে তাকে দ্বিতীয় শব্দটি বলতে হবে সেই হেতু সে একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দের সংযোগ স্থাপন করে মনে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি তাকে হঠাৎ উপর থেকে নীচের দিকে পরপর শব্দগুলি মুখস্থ বলতে বলা হয় তাহলে সে পারবে না। কারণ ওভাবে সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা সে করেনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে সংযোগ স্থাপন হল মুখস্থ করার সহজ উপায়।

(২) **খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেও (Observation) মনে রাখা সহজ হয়।**

অর্থহীন বর্ণ তালিকা বা সংখ্যা মুখস্থ করতে হলে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কিভাবে মনে রাখা যায় যেমন অর্থহীন তালিকার বর্ণমালাগুলিকে সমগ্রভাবে একটি হিসাবে কখন দেখবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, এমনকি অনেক সময় অর্থহীন বর্ণ তালিকায় অভিক্ষার্থী অর্থও আরোপ করে থাকে, যেমন কবিতা বা কোন অর্থপূর্ণ বিষয় আয়ত্ত করতে হলে প্রথমে সেটির অর্থ বুঝে নিয়ে তারপর আয়ত্ত করতে হয়।

(৩) মনে মনে পুনরাবৃত্তি করলে সহজে শেখা যায়।

একবার, দু'বার বিষয়টিকে পড়ে নেবার পর বই বন্ধ করে মনে মনে আবৃত্তি করে আবার চেষ্টা করতে হয়। কোথাও আটকে গেলে দেখে নিয়ে আবার পুনরাবৃত্তি করতে হয় এই ভাবে চেষ্টা করলে যে কোন বিষয় সহজে ও অল্প-সময়ে শেখা যায়।

(৪) এক সঙ্গে শিক্ষার চেয়ে (massed learning) বিরতি পূর্ণ (spaced learning) শিক্ষায় সময় কম লাগে :—

যদি কোন কিছু শেখার সময় বার বার ক্রমান্বয়ে একই জিনিষ আবৃত্তি করা হয় তা'হলে যত তাড়াতাড়ি শেখা যায় তার থেকেও তাড়াতাড়ি শেখা যাবে মাঝে মাঝে একটু বিরতি দিয়ে শিখলে। মনে করা যাক পরীক্ষাগারে ১২টি অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করান হচ্ছে। ২ সেকেণ্ড পর পর একটি করে শব্দ বলা হচ্ছে আর তালিকাটি শেষ হলে আরম্ভ করার আগে ৬ সেকেণ্ড বিরতি দেওয়া হচ্ছে। এটা হল এক সঙ্গে শেখার (massed learning) উদাহরণ। আবার অনুরূপ আর একটি পরীক্ষণে আগের মত সব ঠিক রেখে শেষের বিরতি ৬ সেকেণ্ডের জায়গায় ২ মিনিট করা হল। এই ২ মিনিট সময়টা তাকে রং নিয়ে পরীক্ষা করা হল। ফলে দেখা গেল একসঙ্গে শেখায় (massed learning) ১৫ বার আবৃত্তির পর অভিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত্ত করেছে, কিন্তু বিরতি পূর্ণ-শিক্ষায় (spaced learning) ১১ বার আবৃত্তির পরই সেটি আয়ত্ত করেছে।

(৫) সম্পূর্ণ ও আংশিক পদ্ধতিতে শেখা (whole and part learning) :—

একটা বড় বিষয় শিক্ষা করতে গেলে আমরা সাধারণতঃ সেটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিই এবং তারপর প্রত্যেক ভাগকে পৃথক পৃথক ভাবে আয়ত্ত করি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উল্লিখিত পৃথক ভাবে আয়ত্ত না করে যদি সম্পূর্ণ বিষয়টাই বার বার করে পড়া যায় তাহলে আরও তাড়াতাড়ি শেখা যায়।

(৬) পাঠ্য বিষয়টির ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে পড়লে তাড়াতাড়ি শেখা যায়। যেমন গদ্যের চেয়ে পদ্য তাড়াতাড়ি শেখা যায়।

২। ধারণ (Retention)

এতক্ষণ আমরা শিক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম; এখন আলোচনা করব ধারণ সম্বন্ধে। আমরা দেখতে পাই যে আমরা যা শিক্ষা করি, একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তার কিছুটা মাত্র মনে থাকে। একেই ধারণ বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানী মুলার বলেছেন বারবার পাঠ করার ফলে অধীত বিষয়টি আমাদের মস্তিকে তার চিহ্ন রেখে যায়। এই চিহ্নকে বলে স্মৃতি-চিহ্ন। এগুলি খালি চোখে বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার কিছু শিখেছে, তার দাগ তার মস্তিকে থেকে যায় এবং পরে সে জিনিষ আবার তাকে নূতন করে শিখতে হয় না। যে ১২ বৎসর বয়সে সাঁতার শিখেছে সে যদি দশ বৎসর পরে আবার সাঁতার দেয় তাহলে আগের মতই সাঁতার দিতে পারবে। এই চিহ্নের প্রকৃতি কি তা জানা যায় নি কিন্তু মস্তিকে এই দাগ বা চিহ্ন যে পড়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ মুলারের এই চিহ্ন বা ছাপের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন শেখার পর মস্তিকে কোন চিহ্ন পড়ে না। ধারণ ক্রিয়া হ'ল মস্তিকের বিশেষ একটি সংগঠন। যখন অমরা নূতন কিছু শিখি, তখনই মস্তিকে একটি গঠনমূলক পরিবর্ত্তন হয়। হোয়াগল্যাণ্ড (Hoagland) বলেছেন আমরা মস্তিকের এই সংগঠনটিকে ধারণ করে রাখি এবং দরকার হলে আমরা সেটিকে প্রকাশ করি অর্থাৎ মনে করি।

ধারণ-ক্ষমতা পরিমাপের জন্যে পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ তিনটি উপায় অবলম্বন করা হয়।

(১) পুনরুদ্রেক (Recall) :—তুমি বিষয়টি মনে করতে পার যা আমরা পরীক্ষার সময় করে থাকি।

(২) পরিচিতি (Recognition) :—তুমি অধীত বস্তুর যেটা জান সেটা বেছে নিতে পার। "সত্য বা মিথ্যা" অভীক্ষায় (True false test) আমরা এইরূপ করে থাকি। অভীক্ষায় অনেকগুলো উত্তর দিয়ে অভীক্ষার্থীকে ঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিতে বলা হয়।

(৩) পুনঃ শিক্ষণ (Relearning) :—কিছুদিন পূর্ব্বে শেখা একটা বিষয় হয়ত কিছুতেই মনে করতে পারা যাচ্ছে না, তখন কিন্তু ২।১ বার পড়লেই

বিষয়টি মনে পড়বে। কিন্তু যে বিষয়টি শিখতে আগে ১০ মিনিট লেগেছিল এখন সেটা শিখতে ৮ মিনিট লাগবে অর্থাৎ আগের চেয়ে ২ মিনিট কম। একে বলব শিক্ষা ও সঞ্চয় পদ্ধতি (Learning and Saving Method)। Interval বা ব্যবধানের উপর এই ধারণ ক্রিয়া নির্ভর করে। অধীত বিষয়টি যত বেশীদিন পরে মনে করার চেষ্টা করা হবে ততই ধারণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসবে। যেহেতু এই সময়ের ব্যবধানটি কখনই শূন্য নয় সেহেতু ঐ সময়ে অন্য কোন কাজে নিশ্চয়ই আমরা ব্যস্ত ছিলাম এবং এই ব্যস্ত থাকার জন্য ধারণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলো বিষয় মনে রাখতে হবে।

(ক) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা তাড়াতাড়ি ভোলে।

(খ) যে বিষয়টি অতি শিক্ষা করা হয়েছিল (over learned), সেটা অপেক্ষাকৃত ধীরে ভুলি।

অর্থহীন তালিকা মুখস্থ করার ৪ মাস পরে দেখা গেছে একটিও মনে নেই। কিন্তু একটি পদ্য ভাল করে শেখা থাকলে ২০ বৎসর পরেও স্মরণ করা যেতে পারে। অতি শিক্ষা করা বিষয় আমরা অতি সহজেই মনে করতে পারি।

ধারণ বা চিহ্ন থাকে কোথায়—এ নিয়ে দুই প্রকারের মতবাদ আছে। একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন যে অধীত বিদ্যা তার চিহ্ন রেখে দেয় মস্তিষ্কে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে। অপর দল বলেন যে শরীরের মধ্যে অর্থাৎ মস্তিষ্কে স্মৃতি-চিহ্ন তার দাগ রেখে যায় না, দাগ থাকে মনে। এ মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে যদি মনে স্মৃতি-চিহ্ন থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না কেন? এর উত্তরে ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে মনোজগৎকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—চেতন স্তর ও অবচেতন স্তর। পুরাতন অভিজ্ঞতা এই অবচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকে এবং প্রয়োজন মত তাকেই আমরা চেতন স্তরে তুলে আনি অর্থাৎ মনে করি।

পুনরুদ্রেক (Recall)

পুনরায় মনে আনাকেই অধীতবিষটির পুনরুদ্রেক বলব। পুনরুদ্রেকের সময় সর্বপ্রকার ভাবমূর্তি গঠিত হয়। যেমন দর্শনগত ভাবমূর্তি, শ্রবন গত ভাবমূর্তি, স্পর্শধর্মী ভাবমূর্তি ইত্যাদি। শেখার সময় যে ভাবমূর্তি গঠন করে

শিখেছি পুনরুদ্রেকের সময় সেই ভাবমূর্ত্তিই যে গঠন করতে হবে তা নয়। যে কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করে শিখেছি, পুনরুদ্রেকের সময় সেটি লিখতে পারি।

স্মৃতিগত ভাবমূর্ত্তি:—পুনরুদ্রেকের সময় যদি পূর্ব্বে যেভাবে শিখেছি সেইভাবে মনে করতে পারি তবে তাকে বলা হয় স্মৃতিগত ভাবমূর্ত্তি। আকাশের নীল অথবা বরফের ঠাণ্ডাকে তুমি পুনরায় স্মৃতিপটে আনতে পারো।

আইডেটিক ভাবমূর্ত্তি:—অতীতে শেখা দৃশ্যটি যখন সজীব হয়ে চোখের সামনে ভাসে বা অতীতে শোনা সুরটি যখন কর্ণকুহরে স্পন্দিত হয় তখন তাকে বলা হয় আইডেটিক ভাবমূর্ত্তি। পুনরুদ্রেকের সময় শিশুরা এ ধরণের ভাবমূর্ত্তি গঠন করে।

স্মরণ শক্তির একটা সীমা আছে, মনে করা কখনই সম্পূর্ণ হয় না, নির্ভুল হয় না, এমন কি সময় সময় ভ্রম ও হতে পারে। পুনরুদ্রেকের সময় এগুলি আমরা উপলব্ধি করি। কোর্টে সাক্ষ্য দেবার সময় সাক্ষীর এই জন্যে খুব মুস্কিল হয়। একমাস বা এক সপ্তাহ পূর্ব্বের ঘটনা তাকে বিবৃত করতে হয়। আরও মুস্কিল হয় প্রত্যেকটি ঘটনার বা অবস্থার নিখুঁত বিবরণ দেবার সময় যে ঘটনা সে খুঁটিয়ে দেখেনি কেমন করে সে তা স্মরণ করবে। এই কারণে সাক্ষী যা হওয়া সম্ভব, তাই বলে যায় আসল ঘটনা স্মরণ করে বলে না।

পুনরুদ্রেকে বাধা (Interference in recall):—আমি প্রশ্নের উত্তরটা জানি অথচ ভুল উত্তর দিচ্ছি এরূপ ঘটনা ঘটে না কি? অনেক পরে ঠিক উত্তরটি মনে পড়ে। এখানে নানা বাধা প্রতিরোধের কাজ করে।

অতিরিক্ত আবেগ, যেমন ভয়, উৎকণ্ঠা, আত্মসচেতনতা ইত্যাদি বিরোধের কাজ করে। আর এক প্রকার বাধা পুনরুদ্রেকের ব্যাঘাত ঘটায়। অনেক সময় দেখা যায় একই প্রশ্নের দুটি উত্তর মনে আসে। এরকম সময় কিছু সময় নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়, কিছুক্ষণ পর ঠিক উত্তরটি মনে আসে।

পুনরুদ্রেকের কারণ:—বিষয়টি যে আয়ত্ত হয়েছে তার প্রমাণ হল পুনরুদ্রেক। তবে পুনরুদ্রেক না করতে পারলে যে বিষয়টি আয়ত্ত হয়নি এরূপ কথা আমরা বলতে পারি না। কোন বিষয় মনে করতে না পারলেও দ্বিতীয়বার শিক্ষা করার সময় দেখা গেছে বিষয়টি আগেই শেখা ছিল। পুনরুদ্রেক নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলি নিম্নে দেওয়া হল।—

(১) **উদ্দীপকের সম্পূর্ণতা** :—উদ্দীপক ছাড়া কখনও পুনরুদ্রেক হয় না। কবিতা মনে করতে গেলে কবিতার নামটি প্রথম মনে আসে তারপর কবিতাটি মনে আসে।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অতীতে শোনা একটা সুর তোমার কানে ভাসছে কিন্তু কোথায় শুনেছ মনে করতে পারছ না। একে বলে পারসিভারেসন (Perseveration)। সম্পূর্ণ উদ্দীপক বা সম্পূর্ণ পরিবেশ পুনরুদ্রেককে সহায়তা করে।

(২) **মানসিক প্রস্তুতি** :—ইচ্ছা বা মানসিক প্রস্তুতি পুনরুদ্রেকের জন্য একান্ত প্রয়োজন। ঠিক সময়ে মনে আনা অনেক সহজ। পরীক্ষার্থী পরীক্ষার সময় অতি সহজে অধীত বিষয়টি মনে আনে কিন্তু পরীক্ষার পর দ্রুত হারে ভুলে যায়।

(৩) **পুনরুদ্রেকের জন্য চেষ্টা দরকার** :—কোন কাজ করার জন্য চেষ্টা যত বেশী থাকে কাজটা তত ভাল হয়। অনেকে বলেন চেষ্টা পুনুরুদ্রেকের বাধা। কে না জানে বারবার চেষ্টা করেও একটা নাম কিছুতেই মনে আসে না অথচ যখন চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি এমন কি চেষ্টার কথা ভুলে গেছি তখন হঠাৎ মনে পড়ে সেই নামটি ? একথা সত্য সন্দেহ নেই যে অতিরিক্ত চেষ্টা পুনরুদ্রেকের বাধা স্বরূপ, তথাপি একথাও সত্য যে পুনরুদ্রেকের জন্য অল্প চেষ্টার দরকার হয়।

(৪) আবেগজনিত বাধা :—ভাল করে শেখা জিনিষ ও আবেগের সময় মনে আনতে পারি না।

(৫) প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর বিষয় :—মনোবিদ্গণ বলেন আমরা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা দমন করে রাখি এবং প্রীতিকর অভিজ্ঞতাগুলি মনে করি।

পুনরুদ্রেকের বিশেষ কতগুলি উপায় (Special devices for recall) :—বিস্মৃত শৈশবের কাহিনীও কতগুলি পদ্ধতির সাহায্যে মনে করা যায় :—সেগুলি হল (১) হিপনসিস (·Hypnosis) :—হিপন্সিস্ এর সময় অচেতন অবস্থায় অনেক স্মৃতির পুনরুদ্রেক হয়। (২) ক্রিষ্টাল গেজিং (Crystal Gazing) :—একটা কাচের বলের দিকে তাকিয়ে অনেকে হারানো দিনের কথা বলতে পারে। বলটির মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, আলো ছায়ার

খেলা প্রভৃতি হয়ত ব্যক্তিকে মানসমূর্তি গঠনে সাহায্য করে। (৩) কোন ব্যক্তিকে অন্য দিকে মন দিয়ে যা খুশী লিখতে বলা হয়। আনমনা অবস্থায় এই লেখা থেকে অনেক অতীত ঘটনার পুনরুদ্রেক হয়।

পরিচিতি (Recognition)

পরিচিতির সংজ্ঞা হল বিষয়ের উপস্থিতিতে স্মরণ করা। বন্ধুর চেহারা, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি শুনে তুমি বন্ধুকে চিনতে পারছ। কুকুর ঘ্রাণের সাহায্যে তার প্রভুকে চিনতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পরিচিতকে পরিচিত বলে আবিষ্কার করি। সেই জন্য পরিচিতিকে প্রত্যক্ষণের একরূপ ও বলা চলে।

পরিচিতি পুনরুদ্রেকের মত স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন নাম, কোন ছবি, কোন সুর যা তুমি মনে করতে পারছ না কেউ তোমার সামনে সেগুলি উপস্থাপিত করলেই তুমি চিনতে পারবে।

পরিচিতি কিন্তু সব সময় নির্ভুল হয় না। পূর্বে দেখা এক ব্যক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এরকম কাউকে তোমার সামনে আনলে তুমি পরিচয়ের স্বীকৃতি দেবে কিন্তু এ তোমার ভুল পরিচিতি।

পরিচিতির ভুল দুই প্রকারের হতে পারে :—

(১) পরিচিতকে চিনতে না পারা (২) অপরিচিতকে চেনার স্বীকৃতি দেওয়া।—

পরিচিতকে চিনতে না পারার হেতু (ক) পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তন অথবা অবস্থা বা পরিবেশের পরিবর্তন।—(খ) আমাদের মনের অপ্রস্তুতি বা অনিচ্ছা। আবার সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনতে পারার হেতু হল হয়ত আমরা যার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছি তার সঙ্গে এই ব্যক্তির সাদৃশ্য আছে।

আত্মবিশ্বাস পরিচিতির একটি অঙ্গ। পরিচিত সম্বন্ধে যত বেশী বিশ্বাস থাকবে, পরিচিতি তত বেশী নির্ভুল হবে। কিন্তু কোন কোন সময় আত্মবিশ্বাস থাকলেও আমরা ভুল করে চিনি।

স্মরণ ক্রিয়ার সর্ত্ত (Conditions of Remembering) :—স্মরণ ক্রিয়া নির্ভর করে অভিজ্ঞতার ধারণ ও পুনরুদ্রেকের উপর। অতএব কোন সর্ত্তগুলি মেনে চললে ধারণ সুদৃঢ় হয় এবং পুনরুদ্রেক সহজ হয় সেগুলির আলোচনা করতে হবে। তবে একথাও সত্য যে স্মৃতিশক্তি বা ধারণ ক্ষমতা বাড়ান যায় না। কিন্তু সর্ত্তগুলি অনুসরণ করলে ধারণ সুদৃঢ় হয়। সর্ত্তগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করব। (১) শারীরিক (Physical), (২) মানসিক (Mental), (৩) শিক্ষণ-পদ্ধতি মূলক (Methodical), (৪) আবেগমূলক (Emotional) ও (৫) পরিবেশ সম্বন্ধীয় (Environmental)।

(১) শারীরিক (Physical) :—দেহ নীরোগ ও সুস্থ থাকলে ধারণ সুদৃঢ় হয়।

(২) মানসিক (Mental) :—বিষয়বস্তুটি ভাল করে বুঝে শিখলে অধিক দিন ধারণ করা যায়। শেখার জন্য প্রেষণা, মনোযোগ আগ্রহ থাকলে শেখা বিষয়টি বেশীদিন ধরে রাখা যায়।

মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে তার ধারণক্ষমতার যোগ আছে। দেখা গেছে সব ব্যক্তি শেখা বিষয় সমান ভাবে ধারণ করতে পারে না। মেধাবী ছাত্র একবার শেখা বিষয়টি বহুদিন ধারণ করতে পারে কিন্তু অল্পধী ছাত্র বারবার ভুলে যায়। তার স্মৃতিশক্তি কম। শৈশবে ধারণক্ষমতা বেশী কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তা নয়। শৈশবে মুখস্থ করা কবিতাটি পরবর্ত্তী জীবনেও বহুদিন ধারণ করে রাখা যায় এবং পুনরাবৃত্তি করা যায়।

(৩) শিক্ষণ-পদ্ধতিমূলক (Methodical) :—বিষয়টি অনুশীলনের মাধ্যমে বার বার অভ্যাস করলে অধিকদিন মনে রাখা যায়। শেখার পর আবৃত্তি করে নিলে ভাল মনে থাকে। শেখার সময় একটানা অনেকক্ষণ না পড়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিলে ভাল হয়। এর ফলে শেখা বিষয়টি মস্তিকে ধারণ করা যায়। অর্থপূর্ণ বিষয়টি ভাগ করে না পড়ে সমগ্রটি একসঙ্গে পড়লে ভাল মনে থাকে। আবার অর্থহীন বিষয়বস্তু অথবা অত্যন্ত দীর্ঘ বিষয়বস্তু শিখতে হলে অংশ পদ্ধতিতে অর্থাৎ ভাগ করে শিখলে ধারণ ভাল হয়।

(৪) আবেগমূলক (Emotional) :—শোক, দুঃখ, আনন্দ মিশ্রিত

ঘটনা ও বহুদিন মনে থাকে। তোমার জন্মদিনের উৎসবের স্মৃতিটি স্মৃতিপটে আঁকা থাকে। বাড়ীতে ঠাকুমা দিদিমার মৃত্যুকালীন দৃশ্যটি চিরদিন হয়ত মনে ধরে রাখতে পারো। সুদূর অতীতে কবে একদিন দার্জিলিং গিয়েছিলে। তোমার অনুরাগ, বিস্ময়, আবেগ, ভাল লাগার রংএ রঞ্জিত হয়ে সে ভ্রমণের স্মৃতি মানসপটে মুদ্রিত হয়ে আছে।

(৫) পরিবেশ মূলক (Environmental):—অনুকূল পরিবেশে শিখলে শেখা বিষয়টি ভাল মনে থাকে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে পাঠে মনোযোগ থাকে না ও আমরা ভুলে যাই। আবার পরিবেশ পরিবর্ত্তিত হলেও বিষয়টি মনে রাখা কষ্টকর হয়। দেখা গেছে উপরের আলোচিত সর্ত্তগুলি ছাড়া বিষয়ের আকর্ষণীয়তা, চমক, তীব্রতা প্রভৃতিও বিষয়টিকে মনে ধরে রাখে বেশীদিন। উদ্দীপক তীব্র হলে ধারণ ক্রিয়া সুদৃঢ় হয়। যেমন ঝকঝকে আলো, গুরুগম্ভীর স্বর বেশীদিন ধারণ করে রাখি।

স্মরণ ক্রিয়ার প্রধান উপাদান ধারণ ওপরের সর্ত্তগুলি অনুসরণ করলে সুদৃঢ় হবে। এখন পুনরুদ্রেক সহজ হওয়ার জন্যও কয়েকটি সর্ত্ত অনুসরণ করা দরকার।

পুনরুদ্রেকের জন্য ঘটনার প্রসঙ্গটি (context) উত্থাপন করা দরকার। যে প্রসঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গটি মনে পড়লেই ঘটনাটি মনে পড়বে।

পুনরুদ্রেকের জন্য অভিভাবণ (Suggestion) এবং অনুষঙ্গ (Association) বদ্ধ হওয়া দরকার। অনুষঙ্গবদ্ধ একটি ঘটনা প্রথম ঘটনাটিকে আকর্ষণ করে আনে এবং ব্যক্তির প্রথম ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। এই আকর্ষণ করে আনার প্রক্রিয়াকে বলে অভিভাবণ। অনুষঙ্গ হ'ল একটি ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন। এই সংযোগ স্থাপিত হলে দ্বিতীয় ঘটনাটি মনে পড়লে প্রথমটিও মনে পড়বে। পাঠ্যাভ্যাসের সময় যে ছাত্রাবাসে একদিন বাস করেছিলে, আজ তার পাশ দিয়ে গেলেই ছাত্রাবাস-কালীন জীবনের সম্পূর্ণ স্মৃতিটি তোমার মনে পড়বে।

অনুষঙ্গ—মা, ঠাকুরমার আমল থেকে কোন কিছু মনে রাখবার জন্য আঁচলে গেরো দেওয়ার প্রথা চলে আসছে! এই গেরোটি দেখলেই পরে তাঁদের দরকারী কথাটি মনে পড়ে। যখন একটা ধারণা বা একটা ঘটনা আর একটি

ধারণা বা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয় তখন তাকে আমরা বলি অনুষঙ্গ। মনে করো অতীতে দেখা কোন একটি সিনেমার কথা তোমার মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে কবে কোন্ বন্ধুর সঙ্গে ঐ সিনেমাটি দেখেছিলে, সেই বন্ধু আজ কোথায়? তার সঙ্গে দূর অতীতে তুমি কত খেলা করেছ ইত্যাদি কত কোথাই তোমার মনে পড়বে। এই সিনেমার সঙ্গে যেন তোমার বন্ধু এবং তোমার বাল্য অনুসঙ্গবদ্ধ ছিল। একটি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়হুড় করে সব কথা মনে এলো।

মনোবিজ্ঞানীরা অনুষঙ্গের তিনটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। ১। সাদৃশ্যের সূত্র (Law of similarity), ২। সান্নিধ্যের সূত্র (Law of Contiguity), ৩। বৈসাদৃশ্যের সূত্র (Law of Contrast)।

(১) **সাদৃশ্যের সূত্র** (Law of Similarity) :—দূর অতীতে প্রত্যক্ষ করা কোন বস্তুর সঙ্গে বর্তমানের ঘটনার কোন সাদৃশ্য থাকলে অতীতের ঘটনা মনে পড়ে যায়। ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে। পথে দেখা একটি মুখ দেখে তোমার অতীতের কোন বন্ধুর কথা মনে পড়তে পারে, যার মুখের সঙ্গে সদ্য দেখা মুখের যেন অনেকটা মিল আছে। কবি বা সাহিত্যিক তাঁদের কাব্যে যে সব উপমা ব্যবহার করেন—সেগুলি এই সাদৃশ্যের সূত্রকেই অনুসরণ করে। চাঁদের সঙ্গে কবি সুন্দর মুখের তুলনা দিয়েছেন বুঝি চাঁদ ও সুন্দর মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করে।

(২) **সান্নিধ্যের সূত্র** (Law of Contiguity) :—দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি একসঙ্গে বা পরপর সংঘটিত হয় তবে তাকে বলে সান্নিধ্য। দুই বন্ধুতে একদিন কলেজ ফাঁকি দিয়ে বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলে, বহুকাল পরে আবার যদি কখনও বটানিক্যাল গার্ডেনে যাও তখন আবার সেই বন্ধুকে তোমার মনে পড়বে। সেই বন্ধুর সঙ্গে তোমার অতীত জীবনটি যে ভাবে জড়িত হয়েছিল তাও তোমার মনে পড়বে। যদি দুজন ছাত্রের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব থাকে, তারা যদি একসঙ্গে ক্লাসে চলাফেরা করে তাহলে পরে শিক্ষক যদি তাদের একজনকে দেখেন তাহলে অপর জনের কথাও তাঁর মনে পড়বে। এই অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় সান্নিধ্যের জন্য। সান্নিধ্য দুই প্রকারের হতে পারে। সময়ের সান্নিধ্য এবং স্থানের সান্নিধ্য। পুরী যাবার

সময়ে ট্রেনের সহযাত্রীদের কথা তোমার মনে পড়তে পারে স্থানের সান্নিধ্যের জন্য। আবার সকালে ঘুম ভাঙতেই গ্রামের প্রভাতে পাখীর ডাকে তোমার কিভাবে ঘুম ভেঙেছিল তোমার মনে পড়তে পারে। এই প্রকার সান্নিধ্য হল সময়ের সান্নিধ্য।

(৩) **বৈসাদৃশ্যের সূত্র** (Law of Contrast) :—দুইটি বিষয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটির কথা মনে করলে অপরটির কথা মনে পড়ে। মানুষ খুব সুখের দিনে তাই অতীতের দুঃসহ দুঃখের কথা স্মরণ করে। পরীক্ষার ফল বেরোলে যে ছাত্ররা পাশ করেছে যেমন স্মরণ করি, ফেল করা ছাত্রদের কথাও সেইরূপ ভাবি। ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেটিকে যেমন মনে রাখি, সব চেয়ে খারাপ ছেলেটিকেও সেইরূপ মনে রাখি। আলোর সঙ্গে অন্ধকার, জীবনের সঙ্গে মৃত্যু, সুখের সঙ্গে দুঃখ এইরূপে অনুষঙ্গ বদ্ধ।

উপরে যে তিনপ্রকার সূত্রের কথা বলা হল, সকলে ওই তিনটিকেই মৌলিক সূত্র বলে স্বীকার করেন না। সাদৃশ্যের সূত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের সূত্রটির যথেষ্ট মিল আছে। পূর্ব্ব দিক বলার সঙ্গে আমরা যে পশ্চিম দিকের কথা বলি তার কারণ হল এদের মধ্যে জাতিগত অভিন্নতা। পূর্ব্বও দিক, পশ্চিমও দিক উভয়েই এক জাতীয়। সুখের দিনে দুঃখকে মনে পড়ে উভয়েই এক জাতীয় বলে। বস্তু বা ঘটনার মধ্যে এইরূপ জাতিগত বা শ্রেণীগত মিল থাকলে তবেই বৈসাদৃশ্যের সূত্রটি কাজ করে। তাই অনেকের মতে বৈসাদৃশ্যের সূত্র মৌলিক সূত্র নয়।

অনেকে আবার বৈসাদৃশ্যের সূত্রটিকে সান্নিধ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক সমান নয় বা তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও নাই, আছে সান্নিধ্য। সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায় এই ভাবে যখনই পূর্ব্বের কথা ভেবেছি তখনই পশ্চিমের কথা মনে পড়েছে। সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি দেখেছি বলেই সুখের দিনে দুঃখকে মনে পড়ে। সান্নিধ্যের জন্যই এরূপ হয়।

আবার অনেকের মতে (স্পেনসার, ষ্টিফেন প্রভৃতি) সাদৃশ্য সূত্রটাই একমাত্র মৌলিক সূত্র। কাছের জিনিষগুলো আমাদের মনে পড়ে তার কারণ হল— সেগুলির মধ্যে কালের ও স্থানের সাদৃশ্য আছে।

আবার অনেকে বলেন অনুষঙ্গের মৌলিক সূত্র দুটি—সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ছবি দেখে যখন বন্ধুর কথা মনে পড়ে তখন পার্কের বেঞ্চে বসে বন্ধুর কথা ভাবি। তখন সান্নিধ্য হেতুই তাকে মনে পড়ে। পার্কের ঐ শূন্য স্থানটিতে বন্ধু একদিন বসত আজ নেই, পার্কে গেলেই তাই তাকে মনে পড়ে।

হ্যামিলটন এই তিনটি সূত্রকে একটি সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার নামকরণ করেন **সমগ্রীকরণ সূত্র** (Law of Redintegration)। এই সূত্রের অর্থ হল এই যে সমগ্রের একটি অংশকে যদি মনে পড়ে তাহলে পরে সমগ্র অংশটিই মনে পড়বে। মনে করো বন্ধুদের সঙ্গে পাগলা গারদ দেখতে গিয়েছিলে। পরে এই যাত্রার কথা মনে পড়লে সমগ্র দৃশ্যটিই তোমার মনের চোখে ভাসবে। কোন দিদির সঙ্গে কতজন বন্ধু নিয়ে গিয়েছিলে, কোন ডাক্তার তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন, কোন কোন রোগী কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ইত্যাদি সব কথা তোমার মনে পড়বে। যাত্রা করা থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত সমগ্র দৃশ্য যেন অদৃশ্য কোন শৃঙ্খলে বাঁধা। একটির পর একটি ঘটনা তোমার মনে পড়বে। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য উভয় প্রকার সূত্রই মনে পড়ায় সাহায্য করে—যেমন যে বন্ধুর সঙ্গে বিশেষ রোগীটি দেখেছিলে তাকে মনে পড়বে। কিম্বা ঐ রোগীর ঘরে অন্যান্য যে সব রোগী ছিল তাদের কথা মনে পড়বে।

এই অনুষঙ্গ আবার কতগুলি বিষয় দ্বারা পরিচালিত হয়। সেগুলি হল সাম্প্রদায়িকতা (Recency), পৌনঃপুনিকতা (Frequency), ও তীব্রতা (Intensity)।—

বিশ্বজগতে কত কিছুই ত আমরা প্রত্যক্ষ করছি এবং অহরহ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি এর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক অভিজ্ঞতাই আমরা পরে স্মরণ করি। এই স্মরণ করা নির্ভর করে ঘটনার সাম্প্রতিকতা, পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতার ওপর। যদি কাউকে দিন বলার সঙ্গে প্রথম যে কথাটি তার মনে উদয় হয়েছিল তা বলতে বলা হয় তবে সে বলবে রাত্রি। দিনের অবসানে হয় রাত্রির অবসান। বারবার একই অভিজ্ঞতার জন্য দিনও রাত্রির মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঐ দিনটি যদি শীতের দিন হয় আর ঐ

দিন যদি হাড় কাঁপানো শীত পড়ে থাকে তাহলে সে হয়ত দিন কথাটি বলার সঙ্গে বলবে শীত। পৌনঃপুনিকতার জন্য এরূপ উত্তর সম্ভব হয়।

আগ্রহ এবং মনোযোগ অনুষঙ্গ স্থাপনের জন্য কম দায়ী নয়। তোমার বন্ধুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলে তখন তার পাশে যে লোকটি ছিল তার সম্বন্ধে কোন কৌতুহল ছিল না বলে তুমি তার প্রতি মনোযোগ দাওনি তাই পরে বন্ধুকে মনে পড়লেও তার সঙ্গে দেখা ব্যক্তিটিকে তোমার নাও মনে পড়তে পারে। একজন কবি ও একজন মৎস্যব্যবসায়ী গ্রামে গেলে দুজনের একই জিনিষ চোখে পড়ার কথা নয়। কবি দীঘির পাড়ে বসে গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্য্যসুধা পান করবে আর মৎসব্যবসায়ী দীঘিটা কত বড় কত গভীর, মাছ চাষ করলে লাভ আছে কিনা ইত্যাদি চিন্তা করবে। যার যেরূপ, আগ্রহ তার ঘটনার অনুষঙ্গও হবে সেইরূপ।

উত্তম স্মৃতিশক্তি (Good Memory)

উত্তম স্মৃতিশক্তির অর্থ হল কোন বিষয়কে যত শীঘ্র সম্ভব শেখা, বহুদিন মস্তিষ্কে ধরে রাখা এবং অবিকল বিষয়টির পুনরুদ্রেক করা এবং দরকার মত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বিষয়টি মনে করা। যে ব্যক্তি দ্রুত শিক্ষা করে, বহুদিন পরেও সেটি ঠিক ঠিক মনে করতে পারে সে উত্তম স্মৃতি-শক্তির অধিকারী। ভাল স্মৃতির লক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হ'ল :—

(১) সহজেও দ্রুত শিক্ষা :—উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী সেই যে ব্যক্তি বিষয়টি নিয়েই ভাল করে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করতে পারে। দ্রুত শিক্ষার জন্য প্রেষণা মনোযোগ, আগ্রহের দরকার আছে। উদ্দেশ্য না থাকলে শেখার ইচ্ছা তীব্র হয় না, এবং তীব্র ইচ্ছা না থাকলে শেখার জন্য আগ্রহ ও মনোযোগ থাকে না।

(২) বহুদিন বিষয়টিকে ধারণ করা :—শুধু দ্রুত শিখলেই হবে না, শেখা বিষয়টিকে মস্তিষ্কে দীর্ঘদিন ধারণ করে রাখতে হবে। যার স্মৃতিশক্তি বেশী সে বহুদিন পূর্ব্বের শেখা বিষয়টি বেশিদিন মনে রাখতে পারে। ধারণ ক্রিয়া সুদৃঢ় করার জন্য ইচ্ছা থাকা দরকার।

(৩) বিষয়টিকে ঠিক ঠিক পুনরুদ্রেক করা :—ধারণ ক্রিয়ার

পরিমাপ হ'ল পুনরুদ্রেক। পুনরুদ্রেক না করলে আমরা বুঝতে পারব না কোন ব্যক্তি কতটা ধারণ করে রাখতে পারে। পুনরুদ্রেক দুভাবে হতে পারে। কোন প্রাসঙ্গিক জিনিষটি মনে করা, অথবা বিষয়টি দেখে মনে করা (পরিচিত)।

পুনরুদ্রেক আবছা, অস্পষ্ট স্মৃতি হলে হয় না। বিষয়টি অবিকল পুনরুদ্রেক করতে হবে। কল্পনা বা ভাবমূর্ত্তির সাহায্যে আমরা পুনরুদ্রেক করে থাকি।

আবার শুধু পুনরুদ্রেক করলেই হবে না; বিষয়টিকে ঠিক সময়ে অত্যন্ত দ্রুত মনে করতে হবে। পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর লিখছ; লিখতে লিখতে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি দ্রুত পুনরুদ্রেক করতে হবে।

স্মৃতি এক না বহু ? (Is there a memory or memories)

স্মরণ প্রক্রিয়ার জন্য আমরা দেখেছি মস্তিষ্কে শেখা বিষয়টি ধারণ করা দরকার ও ঠিক সময়ে মনে করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে সব বিষয় আমরা সমানভাবে স্মরণ করতে পারি না। কোন ব্যক্তি অঙ্ক ভাল মনে রাখতে পারে অথচ ইতিহাস পারে না। আবার কেহ বা ইতিহাস ভাল মনে রাখতে পারে অঙ্ক বা বিজ্ঞানের বিষয়টি ধারণ করতে পারে না। সেইজন্য অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, স্মৃতি এক না বহু ? ইতিহাসের বিষয়টি স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য মস্তিষ্কে যে প্রক্রিয়া হয় অঙ্ক বিষয়টির ধরে রাখবার জন্য কি বিভিন্ন প্রক্রিয়া হয় ? আসলে কিন্তু মস্তিষ্কে ধারণ প্রক্রিয়া একই ইতিহাসের জন্য একপ্রকার ভূগোলের জন্য অন্য প্রকার নয়। সেদিক দিয়ে স্মৃতি-শক্তি একই বহু নয়। কিন্তু আমরা ব্যক্তি ভেদে স্মৃতিগত বৈষম্য দেখে বলি স্মৃতি বহু। স্মৃতির এই বৈষম্যের জন্য দায়ী হ'ল বিষয়ের প্রকৃতি, শিক্ষার আগ্রহ প্রভৃতি। গল্প কাহিনী প্রায় সকলেই সহজে মনে রাখতে পারে কারণ বিষয়টি ব্যক্তির কাছে আকর্ষণীয়।

স্মরণ ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ (Classification of memory)

স্মৃতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বাল্যকালে একবার পুরী গিয়েছিলে ভাল লেগেছিল তোমার সমুদ্রকে; তার উত্তাল তরঙ্গ, গম্ভীর গর্জ্জন মুহুর্মুহু রংএর পরিবর্ত্তন, তার বিস্তীর্ণ বেলাভূমি তোমার মনে অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার

করেছিল। বহুকাল পরে দীঘার সমুদ্র দেখে তোমার মনে হয় এ সমুদ্র পুরীর সমুদ্রের মত অত বুঝি রূপসী নয়, পুরীর সমুদ্রের সে রূপলাস্য এর নেই। পূর্ব্বে দেখা দৃশ্যের সঙ্গে বর্ত্তমানে দেখা দৃশ্যের এই যে তুলনা এ সম্ভব হয় দর্শনগত স্মরণ ক্রিয়ার জন্য। সেইরূপ পূর্ব্বে শোনা কোন সুর, কোন গানের কলি তোমার মনে পড়তে পারে তখন হবে তোমার শ্রবণগত স্মরণক্রিয়া। কবে বিয়ে বাড়ীতে ভাল কিছু খেয়েছিলে তার স্বাদ পরে তোমার মনে পড়তে পারে তখন হবে স্বাদধর্ম্মী স্মরণ ক্রিয়া। পূর্ব্বে ঘ্রাত কোন ফুলের গন্ধ মনে পড়লে হবে ঘ্রাণধর্ম্মী স্মরণ ক্রিয়া। তোমার সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা স্মরণে আসতে পারে তখন হবে পেশীগত স্মরণ ক্রিয়া। অনেকে আবার ভাবাবেগগত (Affection) স্মরণক্রিয়ার কথা বলেছেন, আনন্দ, দুঃখ বেদনা প্রভৃতির স্মৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

স্মরণক্রিয়া আবার ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক (Personal and impersonal) হতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি হল ব্যক্তিগত স্মরণ ক্রিয়া। আর যদি কোন বিষয় বস্তু বা ঘটনার কথা মনে পড়ে যার সঙ্গে তোমার নিজের কোন যোগ নেই তাহলে হবে নৈর্ব্যক্তিক স্মরণক্রিয়া। মনে করো রবীন্দ্রনাথকে তুমি দেখেছ; তাঁর অটোগ্রাফ নিয়েছ। পরে এ ঘটনা যখন মনে পড়বে তখন হবে ব্যক্তিগত স্মরণক্রিয়া। কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার নিজের অনুভূতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু নেতাজীকে তুমি দেখনি। তাঁর কথা বই-এ পড়েছ। এই বই-এ পড়া কাহিনীই পরে তোমার মনে পড়তে পারে, তখন হবে নৈর্ব্যক্তিক স্মরণ ক্রিয়া।

স্মরণক্রিয়াকে আবার অভ্যাস মূলক (Rote memory or habit memory) স্মরণক্রিয়া এবং বুদ্ধিমূলক স্মরণক্রিয়া (Logical memory or true memory) এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। কোন কিছু না বুঝে মুখস্থ করার পর যখন আমরা স্মরণ করি তখন হবে অভ্যাসমূলক স্মরণ ক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানী এবিংহস অর্থহীন বর্ণতালিকা নিয়ে স্মৃতির অনেক পরীক্ষা করেছেন। এই বর্ণতালিকা মুখস্থ করলে অভ্যাসমূলক স্মরণের উদাহরণ পাওয়া যায়। কোন বিষয় বুঝে মুখস্থ করার পর আমরা যখন স্মরণ করি তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধিমূলক স্মরণ। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত

হয়েছে যে প্রথমোক্ত স্মরণক্রিয়া স্থায়ী হয় না কিন্তু অর্থ বুঝে মুখস্থ করলে ভাল মনে থাকে।

স্মরণক্রিয়া আবার স্থায়ী (Permanent), হতে পারে, তাৎক্ষণিক (immediate) হতে পারে। সক্রিয় স্মরণক্রিয়ায় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয় এবং মন তখন ক্রিয়াশীল থাকে। পরীক্ষার সময় এইরূপ স্মরণের সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি। এর জন্যে মানসিক পরিশ্রম করতে হয়।

নিষ্ক্রিয় স্মরণ আপনা হতেই হয়। সারাদিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর তুমি যখন বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছ তখন তোমার কোন কিছু চেষ্টা করে স্মরণ করার ইচ্ছাও নেই, উদ্যমও নেই। তবুও কত কথা মনের মধ্যে ভিড় করতে পারে পুরনো দিনের বন্ধুটি মনের দরজায় উঁকি দিয়ে চলে গল, আবার এল আর একজন···এল অতীত দিনের কথা। এইভাবে যখন একটার পর একটা ঘটনার জাল বুনে চলি তখন হয় নিষ্ক্রিয় স্মৃতি। এর জন্য মানসিক আয়াসের প্রয়োজন হয় না।

বিষয়টি যখন বিনা আয়াসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে পড়ে তখন হয় নিষ্ক্রিয় স্মরণক্রিয়া। আবার যখন ইচ্ছা করে কোন কিছু মনে করতে হয় তখন হয় সক্রিয় স্মরণক্রিয়া। বৃষ্টি পড়ছে, জানলাটি ধরে দাঁড়িয়ে আছ; আপনা আপনি মনের পর্দায় কত কথা কত স্মৃতি ভেসে আসছে। এ হল নিষ্ক্রিয় স্মরণক্রিয়া। পরীক্ষার খাতার উত্তর লেখার সময় কিছুতেই মনে আসছে না ঠিক উত্তরটি, বারবার চেষ্টা করে মনে করতে হল। তখন হ'ল সক্রিয় স্মরণক্রিয়া।

অভ্যাসের দ্বারা স্মরণক্রিয়ার উন্নতি কি সম্ভব (Can memory be improved by practice ?)।

স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব কিনা এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী জেমসের মতে স্মৃতির উন্নতি সম্ভব নয় কারণ স্মরণক্রিয়া হ'ল সম্পূর্ণরূপে দৈহিক প্রক্রিয়া। মস্তিষ্কের সংগঠন প্রক্রিয়ার উপর স্মরণশক্তি নির্ভরশীল। তিনি বলেন অনুশীলনের দ্বারাও স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয় তবে তিনি স্বীকার করেন অনুরাগ, আগ্রহ, প্রেষণা প্রভৃতি থাকলে বিষয়টিকে দ্রুত শিক্ষা

করা যায়। অনুশীলনের সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয় না। স্মরণ করার কারণ—মনোযোগ, আগ্রহ প্রভৃতির উন্নতি করা।

স্টাউট ও জেমসের মতই মনে করেন অনুশীলনের সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি করা যায় না; তবে এ কথাও তিনি স্বীকার করেন যে অনুশীলনের দ্বারা কোন একটি বিশেষ বিষয়ের স্মৃতির উন্নতি করা যায়। স্মরণক্রিয়ার প্রকৃষ্ট সর্তগুলি অনুসরণ করে একটি বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানকে বারবার অনুশীলন করলে সেই বিষয়ে স্মৃতির উন্নতি করা যায়।

এককথায় স্মৃতিশক্তির উন্নতি করা যায় না সত্য, কিন্তু স্মরণক্রিয়ার বিভিন্ন সর্তগুলি অনুসরণ করলে বিষয়গুলি অনেকদিন মনে রাখা যায়, দ্রুত শেখা যায় এবং সময়মত পুনরুদ্রেকও করা যায়।

স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা (Experiments in memory)

মনোবিজ্ঞানী এবিংহস (Ebbnghaüs) স্মৃতি সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করেছেন। তাঁর পরীক্ষার জন্য তিনি অর্থহীন বর্ণতালিকা ব্যবহার করেছেন। অর্থহীন বর্ণ (nonsense syllable) হ'ল ৩টি বর্ণের সমষ্টি। দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও মধ্যে একটি স্বরবর্ণ নিয়ে অর্থহীন বর্ণ প্রস্তুত করে তিনি পরীক্ষা করতেন। তাঁর কয়েকটি পরীক্ষার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল :—

(১) তিনি **সঞ্চয় প্রণালীর** (Saving method) দ্বারা স্মৃতির পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি একটি অর্থহীন বর্ণতালিকা অভিক্ষার্থীকে দিয়ে মুখস্থ করালেন। দেখা গেল ১২টি অর্থহীন বর্ণ মুখস্থ করতে তার লাগল ৮ বার দ্বিতীয় দিন তিনি আবার ঐ বর্ণতালিকাটি অভিক্ষার্থীকে দিয়ে মুখস্থ করালেন। ঐ দিন মাত্র ৩ বারে অভিক্ষার্থী তালিকা মুখস্থ করে ফেলল। অতএব অভিক্ষার্থীর সঞ্চয় হল ৮—৩=৫ বার। অতএব তার সঞ্চয়ের শতকরা হল ৪১'৪।

(২) ভুলে যাওয়ার হার (Rate of forgetting) :—কোন বিষয় শিক্ষা করার পরই দ্রুত আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাওয়ার হার প্রথমের দিকেই বেশী। মনোবিজ্ঞানী এবিংহস আমরা কি হারে ভুলি সে সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করেছেন। তিনি ভুলে যাওয়ার হারের একটি তালিকা দিয়েছেন। অর্থহীন বর্ণতালিকাটি শেখার পর কিছুটা সময় পরে আমরা দেখি সবটা মনে

করতে পারছি না। কতক্ষণ পরে আমরা শেখা বিষয়ের কতটা ভুলি তার একটি তালিকা এবিংহস দিয়েছেন। নীচে তালিকাটি দেওয়া হ'ল :—

শেখার ও মনে করার মধ্যে সময়ের অন্তর	মনে রাখার শতকরা হিসাব	ভুলে যাওয়ার শতকরা হিসাব
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ ঘণ্টা	৩৬	৬৪
২৪ ঘণ্টা	৩৪	৬৬
২ দিন	২৮	৭২
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ দিন	২১	৭৯

(৩) **আংশিক ও সমগ্র পদ্ধতিতে শেখা** (Part and whole method।

অর্থহীন ১২টি বর্ণের একটি তালিকা প্রথমে সবটা একেবারে মুখস্থ করাতে হবে। মুখস্থ করতে কতবার লাগল লিখে রাখতে হবে। এরপর অনুরূপ একটি বর্ণতালিকা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে, এক একটি অংশ এক একেবারে মুখস্থ করতে হবে। আংশিকভাবে সমগ্র তালিকাটি মুখস্থ করিয়ে দেখতে হবে কতবার লাগল। কোন গদ্যাংশ বা কবিতা নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা চলে। দেখা গেছে সমগ্র পদ্ধতিতে শিখতে সময় কম লাগে।

(ক) পশ্চাৎমুখী বাধা সম্বন্ধে পরীক্ষণ (Retroactive inhibition) :— একটি বিষয় শেখার পর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আর একটি বিষয় শিখলে সুদৃঢ় হয়। কিন্তু একটি বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বিষয় শেখালে, প্রথমে শেখা বিষয়টির অধিকাংশ আমরা ভুলে যাই। একে বলে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ।

দুজন পরীক্ষার্থী নিয়ে এই পরীক্ষাটি করতে হয়। একজন পরীক্ষার্থী দুটি

বিষয় বিরতি সহকারে শিখবে। অপর পরীক্ষার্থী একটি বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গে অপর বিষয়টি শিক্ষা করবে। ফলাফলের তুলনা করলে দেখা যায় বিরতিপূর্ণ শিক্ষার বিষয়গুলি বেশী মনে থাকে।

স্মৃতি রেশ (Reminiscence):—কোন কিছু শিখতে দিয়ে দেখা গেল শিক্ষার্থী বিষয়টির কিছুটা মুখস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা যায় পরীক্ষার্থী বিষয়টির আরও একটু বেশী মুখস্থ বলতে পেরেছে যদিও এই সময়ের মধ্যে সে আর মুখস্থ করেনি। যেমন একজনকে ১০টি অর্থহীন বর্ণতালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ শেখার পর পরীক্ষার্থী দেখা গেল ৬টি বর্ণ নির্ভুল বলছে। আরও কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সে ৮টি বর্ণ বলতে পারে। সে এই দুটি বর্ণ এখন বেশী মুখস্থ বলতে পারল কেমন করে? পরীক্ষণের পর তাকে আর মুখস্থ করতে দেওয়া হয় নি। একে বলে স্মৃতির রেশ। কোন কিছু শেখার পর সময়ের ব্যবধানে স্মৃতির খানিকটা উন্নতি ঘটে।

লেখচিত্রে সময়ের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার অঙ্কন করা হয়েছে। এতে পুনঃ শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পরে পুনরুদ্রেক (Recall) ও পরিচিতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে অধীত বিষয়টি ভুলে যাচ্ছি কিন্তু প্রথমের দিকে এই ভুলে যাওয়ার হার খুব বেশী।
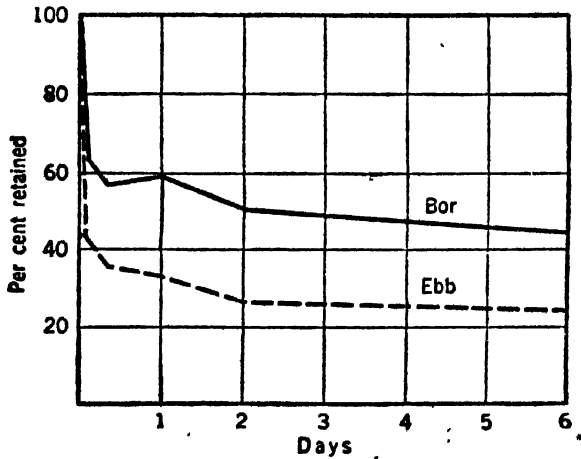
কল্পনা ও স্মরণ (Imagination & Memory)

স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং বৈসাদৃশ্যও আছে।

সাদৃশ্য :—(১) উভয়ের জন্যেই অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে।

(২) উভয় ক্ষেত্রেই ভাবমূর্ত্তিগঠিত হয়। ভাবমূর্ত্তির অভাবে কল্পনা বা স্মৃতি কোনটাই ক্রিয়াশীল হয় না।

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বস্তু সামনে থাকে না।

বৈসাদৃশ্য :—(১) স্মৃতি অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি মাত্র। অতীত ঘটনাগুলি যেভাবে ঘটেছিল স্মৃতির উদ্রেক কালে সেইরূপ ভাবে ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু কল্পনায় অতীত অভিজ্ঞতাকে আমরা ইচ্ছামত নূতন রূপে সাজিয়ে নিই। যেমন আমরা মৎসও দেখেছি, কন্যাও দেখেছি, অতএব মৎস ও কন্যার পৃথক ভাবমূর্ত্তি আমাদের মানসপটে বিরাজ করছে। কল্পনায় আমরা মৎস ও কন্যার আকৃতির সমন্বয় ঘটাচ্ছি।

(২) স্মৃতি কেবলমাত্র অতীতকালের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল সম্বন্ধেই আমরা কল্পনা করেতে পারি।

(৩) স্মৃতি সব সময়ই বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। কিন্তু কল্পনা অবাস্তবও হতে পারে। স্মৃতিতে আকাশ কুসুম রচনা করা সম্ভব হয় না, কিন্তু কল্পনায় মানুষ আকাশ কুসুম রচনা করে।

(৪) স্মৃতি বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু কল্পনা সর্ব্বত্র বিচরণ করে।

(৫) কতগুলি বাহ্যিক ঘটনারই স্মৃতি গঠিত হয় কিন্তু কল্পনায় মানসলোকের চিন্তাধারা কাজ করে। যা ঘটেছে তা ছাড়া আর কিছুই স্মৃতিতে নেই কিন্তু কল্পনা নিজের মনের মাধুরী দিয়ে সৃজন করে।

(৬) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমরা কল্পনা করতে পারি বলে এর শ্রেণীকরণ স্মৃতির শ্রেণীকরণ থেকে পৃথক। সৌন্দর্য্যধর্মী কল্পনা, ব্যবহারিক কল্পনা ইত্যাদি কল্পনার শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কিন্তু স্মৃতির এরূপ কোন শ্রেণীকরণ হয় না।

(৭) স্মৃতি শিখনের অঙ্গস্বরূপ, কল্পনাও তাই। কল্পনা ছাড়া ইতিহাস,' ভূগোলের জ্ঞান অসম্পূর্ণ হত এবং তার ফলে স্মৃতিতে ধারণ ক্রিয়া সুষ্ঠু হত

কিনা সন্দেহ। অতএব দেখা যাচ্ছে স্মৃতি যেমন কল্পনাকে সাহায্য করে, কল্পনাও সেইরূপ স্মৃতিকে সাহায্য করে।

(৮) সকলেই স্মরণ করতে পারে কিন্তু কল্পনা করার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

(৯) কল্পনা বলে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। কল্পনায় মানুষ অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান করে কিন্তু স্মৃতির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

(১০) কল্পনার দ্বারা মানুষ নিজের অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করে। স্মৃতি তা পারে না।

স্মৃতি ও শিক্ষণ (Learning and Imagination)

স্মৃতি ও শিক্ষণের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণে অগ্রসর হলে আমরা দেখি শিক্ষণের সঙ্গে স্মৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোন কিছু শিখলেই হয় না শেখা জিনিষটি মনেও রাখতে হয়। স্মৃতি হল শিখণের পরিমাপ। স্মৃতি না থাকলে প্রত্যেকবারই সব কিছু আমাদের শিখতে হত। মনে কর তুমি একটি অঙ্ক কষতে শিখেছ; স্মৃতি না থাকলে পরের দিন আবার সেটি শিখতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষণ ও স্মৃতি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

সাম্প্রতিকতা (Recency effect) :—সাম্প্রতিকতার অর্থ হ'ল খুব অল্পকালের স্থায়িত্ব। শেখা জিনিষটা খুব অল্পকাল মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়, তারপরই বিলুপ্ত হয়। একে বলে সাম্প্রতিকতা। ভুলে যাওয়ার হার লক্ষ্য করে আমরা দেখেছি যে শেখার অল্পক্ষণ পরই ভুলে যাওয়ার হার বেশী।

বিস্মৃতি (Fogetting)

ভুলে যাওয়া অভিশাপ নয় বরং ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তাই ভুলে যাওয়াকে শুধু স্মৃতির চিহ্নের দুর্ব্বলতা বলতে পারব না। ভুলে যাওয়া দৈহিক ক্ষত নিরাময়ের মতই মানসিক ক্ষত নিরাময় করে। নিত্য-নিয়ত কত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে আমাদের জীবনে। সব অভিজ্ঞতা মনে রাখলে আমরা কি নূতনকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম? তা'ছাড়া মানুষের জীবনে শুধু আনন্দ আর সুখই নেই, আছে দুঃখ, আছে হতাশা বেদনা

ও শোক। মানুষ ভুল করে, অপরাধ করে, সমাজের বিধানে দোষী সাব্যস্ত হয়, লজ্জা পায়। মুহূর্তের ভুলের অপরাধের বেদনা তার অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে মানুষ তার জীবনের অশান্ত ও বেদনাময় মুহূর্তগুলিকে ভুলে গিয়ে সুস্থ মন নিয়ে বাঁচতে পারে।

ভুলে যাওয়ার কারণ (Causes of forgetting)

সময়ের ব্যবধান স্মৃতি চিহ্ন নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু এই সময়ের ব্যবধান কখনই শূন্য থাকে না। বিশ্ব-জগতে সর্ব্বত্রই বিস্ময়; প্রতি মুহূর্তেই মানুষ শিখে চলেছে। সে শিক্ষাও তার চিহ্ন ফেলে চলেছে মস্তিষ্কে। ফলে পূর্ব্বের চিহ্নগুলি আবছা হয়ে আসছে। অতএব ভুলে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সময়ের ব্যবধান নয়, এই ব্যবধানটা কেমন করে কাটছে তা' আমাদের দেখতে হবে, ভুলে যাওয়ার কারণগুলি নিয়ে দেওয়া হল :—

(১) ঘুমের সময় ভুলে যাওয়ার হার খুব মন্থর এবং স্মৃতি চিহ্নের বিঘ্ন বা বিরোধ খুব কম থাকে। তাই কোনরকমে কিছু শিখে যদি ঘুমিয়ে পড় তাহলে পরের দিন সেটা ভালভাবেই মনে পড়বে।

(২) নূতনত্বের প্রভাব (Recency effect) :—ভুলে যাওয়ার হার লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে প্রথমের দিকে ভুলে যাওয়ার হার খুব বেশী। একে বলে Recency effect. এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে শেখার পর আমরা ওই স্বল্প সময়ের জন্যেও বিষয়টি মনে রাখি কেন তাই ভাবতে হবে। ধর একটা গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেউ তোমায় গাইতে বললে তুমি সুরটার অনুকরণ করতে পার। কিন্তু গানটা শোনার বহুক্ষণ পর সুরটা তোমার মনে থাকত না এবং তুমি গাইতে পারতে না। এর কারণ কি ? মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন এর কারণ হল কোন কিছু আমাদের মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করলে সেই উত্তেজনা উদ্দীপক অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। তাই গান থেমে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সুরটা তোমার মস্তিষ্কে ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেইরূপ অধীত বিষয়টি শেখার পরও কিছুক্ষণ মস্তিষ্ককে উত্তেজিত রাখে তাই শেখার সঙ্গে সঙ্গে না ভুলে আমরা একটু পরে ভুলে যাই। এই Rececy effect থেকেই বুঝতে পারা যায় প্রথমেই কেন আমরা অধীত বিষয়ের প্রায় সবটা ভুলে যাই।

(৩) বিরোধ (Interference) :—শেখার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে স্মৃতিচিহ্ন গভীর হয় না, শেখার পরও সময়ের দরকার হয়। তাই একটা বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা বিষয় শিখলে স্মৃতিচিহ্নের অস্পষ্টতার জন্য প্রথমটা আমরা ভুলে যাই।

(৪) পুনরুদ্রেকের গতি (Speed of Recall) :—যে বিষয়টি সম্প্রতি আয়ত্ত করেছি সেটি তাড়াতাড়ি মনে আসে কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা মনে আনতে দেরী হয়।

(৫) স্মৃতিচিহ্ন গঠনে আঘাতের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোন ব্যক্তিকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অজ্ঞান করার পর পুনরায় জ্ঞান ফিরে পেলে সে আর শেখা বিষয়টি মনে করতে পারছে না। কোন আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর জ্ঞান ফিরে পেলে দেখা গেছে সে ব্যক্তি আঘাত পাবার পূর্ব্বের ঘটনা ভুলে গেছে!

(৬) উত্তেজনার প্রভাব (Warming up effect) :—কোন খেলোয়াড় খেলার পূর্ব্বে ব্যায়াম করে শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, একে বলে উত্তেজিত অবস্থা। এইরূপ উত্তেজনার সময় কিছু শিখলে সহজেই ভুলে যাই। বিশ্রামের সময় মস্তিষ্কের এই উত্তেজিত অবস্থা থাকে না ফলে অধীত বিদ্যা সহজেই মস্তিষ্কে স্থিতিলাভ করে।

(৭) ওষুধের ক্রিয়া :—অতিরিক্ত নেশা আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিকে দুর্ব্বল করে, ফলে স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হয়। বিশেষ করে নূতন শেখা বিষয় অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য ব্যবহার করলে মস্তিষ্কে স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পারে না ফলে আমরা ভুলে যাই।

(৮) পশ্চাৎমুখী প্রতিরোধ (Retro active inhibition) :—সদ্য শেখা নূতন একটি বিষয় মস্তিষ্কে স্থায়ী হবার পূর্ব্বেই অপর একটি নূতন বিষয় শিখলে প্রথমে শেখা বিষয়টি আমরা সহজেই ভুলে যাই একে বলে পশ্চাৎমুখী প্রতিরোধ।

(৯) ভাল করে না শিখলে বিষয়টি আমরা সহজেই ভুলে যাই।

(১০) যে সব বিষয় শিখতে দেরী হয় তাদের ভুলতে কিন্তু দেরী হয় না। আবার সহজে শেখা বিষয় সহজেই ভুলি না।

(১১) ফ্রয়েড বলেছেন ভুলে যাওয়াটা মানুষের ইচ্ছাকৃত। অনেক সময়

অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে যেতে চাই। আমাদের জীবনের লজ্জা, অপমানবোধ বেদনাবোধ প্রভৃতিকে আমরা মনে আনতে চাই না। এ ভুলে যাওয়ার কারণ হল অবদমন। চেষ্টা করে এসব স্মৃতিকে আমরা অচেতন মনে ঠেলে দিই বলে ভুলে যাই।

(১২) অবসাদ বা ক্লান্ত অবস্থায় অধীত বিদ্যা আমরা সহজে ভুলি।

(১৩) চর্চ্চার অভাব (Disuse) :—অধিকদিন চর্চা না করলে অধীত বিদ্যা আমরা ভুলে যাই।

(১২) আবেগজনিত বিরোধ :—আবেগের সময় ভাল করে শেখা বিষয়ও আমরা পরে মনে করতে পারি না।

Question (প্রশ্নাবলী)

1. What is memorising? Explain the Processes involved in memorising.

স্মরণ ক্রিয়া কি? স্মরণ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

2. What is memory? How do you recall past experience? In this connection explain the differences between recall and recognition.

স্মৃতি কি? অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করবে কেমন করে? এই প্রসঙ্গে পুনরুদ্রেক—পরিচিতির পার্থক্য বর্ণনা কর।

3. What are the conditions of economical learning? What do you mean by learning?

৪। সহজে শেখার সর্ত্তগুলি কি? শিক্ষন বলতে কি বোঝ?

4. What do you understand by forgetting? State and explain different causes of forgetting.

বিস্মৃতি বলতে কি বোঝ? ভুলে যাওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

5. Explain what are the marks of good memory. Can memory be trained and improved by practiec?

উত্তম স্মৃতিশক্তির লক্ষণ কি ব্যাখ্যা কর। অনুশীলনের দ্বারা স্মৃতিশক্তির উন্নতি কি সম্ভব?

6, Write short notes on—

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(a) Trial and error learning (b) Nonsense syllable (c) Whole and part learning (d) Massed and spaced learning (e) direct and indirect recall (f) memory span (g) Retro-active inhibition (h) True memory and habit momory (i) Contiguity in space (j) Law of contrast (n)

(ক) প্রচেষ্টা ও ভুলের সমন্বয়ে শেখা (খ) অর্থহীন বর্ণ (গ) সম্পূর্ণ ও আংশিক পদ্ধতিতে শেখা (ঘ) একসঙ্গে ও বিরতি সহকারে শিক্ষা। (ঙ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুনরুদ্রেক (চ) স্মৃতি বিস্তার, (ছ) পশ্চাদমুখী বাধা (জ) প্রকৃত স্মৃতি ও অভ্যাস মূলক স্মৃতি (ঝ) স্থানের সান্নিধ্য (ঞ) বৈষম্যের সূত্র।

7· Critically discuss the laws of association.

অনুষঙ্গের সূত্রগুলির সমালোচনা সহকারে ব্যাখ্যা কর।

8. What is the Principle of redintegration ? What are its importance in the formation of mental association ?

৮। সমগ্রীকরণের সূত্রের প্রাধান্য কি ? মানসিক অনুষঙ্গ স্থাপনে এই সূত্রের গুরুত্ব কোথায় ?

নবম অধ্যায়

মনোযোগ (Attention)

মনোযোগের স্বরূপ (Nature of attention):—বস্তুজগতে ঘটনার অন্ত নেই, বিষয়-বস্তুরও অন্ত নেই। নদীর মত অবিরাম ঘটনা প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষ কি একসঙ্গে সব কিছুতেই মন দিতে পারে? তুমি যখন সন্ধ্যার পর টেবিল ল্যাম্পটি জেলে পড়াশোনা করছ, তখন হয়ত পাশের বাড়ীর রেডিও থেকে গান ভেসে আসছে, অন্যদিকে কাদের ঝগড়া শোনা যাচ্ছে, ট্রামবাস, গাড়ী ক্রমাগত হর্ণ দিয়ে চলেছে। এই সব গোলমালে তুমি মন দাও কি? দাও না; যদি যা কিছু ঘটছে সব কিছুতেই মানুষ মনোনিবেশ করত তাহলে গভীর মনোযোগ দিয়ে যে কাজটী করা দরকার, তা করা সম্ভব হত না। আমরা যখন কোন কিছুতে মন দিই, অনেক জিনিষ আমাদের লক্ষ্যের বাইরে থাকে। আবার যে বিষয়ে মন দিই তার সব অংশেও একসঙ্গে মন দিতে পারি না; একটার পর একটা অংশে মন দিই।

(১) মনকে যোগ করাই হল মনোযোগ। যোগ করা একটি কাজ। তাই মনোযোগকে একপ্রকার আচরণ ছাড়া কিছু বলা যায় না। এই আচরণের সময় মন অগণিত ঘটনার থেকে একটিকে মাত্র বেছে নিয়ে তাতে মনকে যোগ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মনোযোগ মানে দুটি কাজ, একটি হল বেছে নেওয়া (selectivity), অপরটি হল মনোনিবেশ। তুমি যখন কোন কিছু পড়, কিছু চিন্তা করো, কিছু প্রত্যক্ষণ করো তখন সেই বিষয়টিতে তুমি মন দাও।

(২) মন যখন কোন কিছুতে নিবিষ্ট হয়, তখন মনোযোগের সীমানার বাইরের ঘটনা বা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন থাকি না তা নয়। তুমি যখন টেবিলল্যাম্প জেলে পড়ছ, তখন এ চেতনা তোমার আছে যে ল্যাম্পটা তোমার সামনে জলছে অথবা পাশের বাড়ীর রেডিওতে গান হচ্ছে। একে বলে **চেতনার সীমানা** (margin)। যে বিষয়টিতে তুমি মনোযোগ দিয়েছ তাকে বলে **চেতনার কেন্দ্র** (focus)। যখন আমরা কোন কিছুতে মন দিই তখন মন চেতনার কেন্দ্রে নিবিষ্ট হয়।

(৩) মন সদা চঞ্চল, মন সর্ব্বদা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যুক্ত হয়। তাই যে জিনিষ এই মাত্র ছিল চেতনার কেন্দ্রে, পরমুহূর্ত্তে তা চেতনার সীমানায় চলে যেতে পারে। একে বলে **মনের বিচলন** (Fluctuation of attention)। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

(৪) মন যখন যে বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, সে বিষয়টি তখন চেতনার কেন্দ্রে থাকে। কোন বিষয় যখন চেতনার কেন্দ্রে থাকে, তখন সেটি থাকে স্পষ্ট। চেতনার কেন্দ্র থেকে সরে গেলে সেটি হয় অস্পষ্ট। ক্লাসে পড়তে পড়তে তোমার মন হয়ত খেলার মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন শিক্ষক মহাশয় যা বলছেন তার এক বর্ণও তোমার মাথায় প্রবেশ করছে না। কিন্তু যখনই তুমি খেলার মাঠ থেকে মনকে সরিয়ে পাঠ্য বিষয়ে নিয়োজিত করবে দেখবে শিক্ষক মহাশয় যা বোঝাচ্ছেন তার কোথাও না বোঝার মত কিছু নেই। বিষয়টি তখন তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(৫) মন কখনও শূন্য থাকে না। সর্ব্বদাই আমরা কোন না কোন বিষয়ে মন দিয়ে থাকি। মন কখনও কোথাও যোগ না করে আমরা থাকতে পারি না। তাই আমরা যখন বলি মেয়েটি ক্লাসে বড় অমনোযোগী, তখন এইমাত্র বলতে পারি যে নির্দিষ্ট বিষয়ে তার মন নেই। অমনোযোগের অর্থ মনোযোগের অভাব নয়। এর অর্থ হল নির্দিষ্ট বিষয়ে তোমার মন নেই কিন্তু অন্য কোথাও নিশ্চয়ই যুক্ত আছে, যেমন ক্লাসে যখন মন নেই, মন তখন আছে খেলার মাঠে।

(৬) আমাদের মনোযোগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পরিবেশের সব কিছুতেই একসঙ্গে মনোযোগ দেওয়া যায় না। তার মধ্যে ৪।৫টিতে আমরা মন দিতে পারি। কিন্তু একসঙ্গে ৪।৫টি জিনিষে মন দেওয়া যায় না, তাই এক্ষেত্রেও একটির পর একটিতে আমরা মন দিই। অতএব দেখা যাচ্ছে আমরা একসঙ্গে একটী মাত্র জিনিষে মন দিতে পারি। কিন্তু এখানে আরও একটি সমস্যা আছে। বস্তু সরল হতে পারে আবার জটিলও ত হতে পারে। অতএব একসঙ্গে একটি মাত্র জিনিষে আমরা মন দিতে পারি একথার অর্থ কি ? ধর একটি বাড়ী দেখছ। একটি একক বাড়ী রূপে তাকে তুমি দেখছ। বাড়ীর দরজা জানলা ইত্যাদি তোমার মনোযোগের বাইরে আছে। কিন্তু এই বাড়ীর অংশও ত কম নয়। দরজা, জানলা, বাড়ীর রং, বাড়ীর গঠন প্রভৃতি কত কি লক্ষ্য করার থাকতে পারে। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জিনিষটি

একটি মাত্র জিনিষ হতে পারে, আবার নাও পারে। যদি বাড়ীটি দেখাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একনজরে আমরা একটি মাত্র জিনিষেই মন দিচ্ছি। কিন্তু বাড়ীতে কটি ঘর আছে, ঘরগুলি ছোট না বড় ইত্যাদি দেখতে হলে একটি একটি করে দেখব। একসঙ্গে অতগুলি জিনিষে মন দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। একেবারে আমরা যে কটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি, তাকেই বলে **মনোযোগের পরিসর** (Span of attention)। পরে এ সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা হবে।

(৭) মনোযোগের জন্য মনের প্রস্তুতির সঙ্গে শারীরিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যেমন ধ্যানের সময় স্থির, নিশ্চল হয়ে বসতে হয়।

(৮) মনোযোগের সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক নিবিড়। আগ্রহ, ইচ্ছা বা প্রয়োজন থাকলে আমরা মনোনিবেশ করি, নতুবা করি না।

(৯) কোন একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলে মনকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে হয়। একে বলে **অপসারণ** (withdrawal)। অপসারণ না করলে কোন কিছুতেই মনোনিবেশ করা যায় না।

এতক্ষণ আমরা মনোযোগের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এখন উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করব।

মনোযোগের পরিসর (Span of Attention)

মনোযোগের পরিসর হল একমুহূর্ত্ত মাত্র দেখে আমরা কতটা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। পরীক্ষাগারে ট্যাচিস্টোস্কোপ নামক যন্ত্রে (tachistoscope), এক মুহূর্ত্তের জন্য কয়েকটি বিন্দু, রেখা, অক্ষর বা বর্ণ দেখানো হয়। দেখানোর সময় খুব কম। $\frac{১}{১০০}$ সেকেণ্ড থেকে $\frac{১}{২}$ সেকেণ্ডের মধ্যে অক্ষর বা বর্ণ সম্বলিত কার্ড দেখানো হয়, যাতে চোখ ঘোরা ফেরা না করতে পারে। দেখা গেছে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ে ৪টি অথবা ৫টি বিন্দু, রেখা ইত্যাদি দেখা সম্ভব হয়। একে ধারণার পরিসরও (Span of Apprehension) বলে। এখানে একটি মজার ব্যাপার আছে। ৫টি বিন্দু বা ৫টি লাইন বা ৫টি অক্ষর যেমন আমরা একসঙ্গে দেখতে পারি, সেইরূপ ৫ জোড়া বিন্দু বা ৫ জোড়া লাইন বা ৫টি শব্দও দেখতে পারি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং অভ্যাসে মনোযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য মনোযোগের পরিসর ঠিকই থাকে।

একসঙ্গে উপস্থাপন না করে, একটির পর একটি উপস্থাপন করলেও একই জিনিষ পরিলক্ষিত হয়। ধর যদি কোন মেট্রোনোমের ঘণ্টা এত দ্রুত বাজান হয় যে অভীক্ষার্থীর পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়, তাহলেও দেখা গেছে অভীক্ষার্থী ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজার সংখ্যা বলতে পারে।

আমরা সাধারণতঃ যা দেখি বা যা শুনি তা সবই জটিল, দেখার বা শোনার পর জটিল বস্তুর উৎপাদনগুলি বিশ্লেষণ করি। উত্তেজক যখন সরিয়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আর উত্তেজিত করে না, তখনও আমাদের মস্তিষ্কে পরাভব মূর্ত্তি বা পরাসংবেদন হয় অর্থাৎ যে বাজনাটা এই মাত্র শুনলাম তার রেশ বাজনা বন্ধ হওয়ার পরও থাকে। উত্তেজক অন্তর্হিত হওয়ার পর আমরা এই পরাভব মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করে থাকি। ট্যাচিস্টোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে বিন্দু বা রেখা দেখি, সেগুলি গণনা করা হয় অন্তর্হিত হওযার পর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যার ভাবমূর্তি গঠনের ক্ষমতা বেশী, তার মনোযোগের পরিসরও অধিক। অতএব দেখা যাচ্ছে মনোযোগের পরিসর নির্ভর করে ভাবমূর্ত্তি গঠনের ক্ষমতার উপর।

মনোযোগের বিচলন (Fluctuation of Attention)

একটি মাত্র জিনিসে আমরা কতক্ষণ মনোযোগ দিতে পারি? আমরা কাজ করি মাসের পর মাস, দিনের পর দিন ধরে কিন্তু অতদিন ধরে কি শুধু একটি জিনিষে মনোনিবেশ করে থাকি? সামান্য একটি কিছু পাঠ করার সময়ও আমাদের মন সেই বিষয়ে স্থির থাকে না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমন করে। মন সদাচঞ্চল, মনোযোগের বিচলন যে হয় একথা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু এই বিচলনের পরিমাপ করা খুবই কঠিন। উত্তেজক যদি খুব দুর্ব্বল হয় তাহলে মনোযোগের বিচলন সহজেই ধরা পড়ে। মনে করো এমন স্থানে একটি ঘড়ি রাখা হল যেখান থেকে ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ কোন রকমে শোনা যায়। অভীক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বলবে ঘড়ির আওয়াজটা সব সময় শোনা যায় না, কখনও শোনা যায়, কখনও যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় মনোযোগ ৫ থেকে ৬ সেকেণ্ড পর পর বিচলন করে। ক্ষুদ্রতম বিচলন হল ৩ সেকেণ্ড এবং সব চেয়ে বেশী হল ২৫ সেকেণ্ড। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মনোযোগের বিচলনের পার্থক্য দেখা দেয়, আবার পরিবেশের উপরও বিচলনের কম বেশী নির্ভর করে! স্তব্ধ শান্ত পরিবেশে বিচলন কম হয়।

মনোযোগের বিভাজন (Division of Attention)

অনেক সময় আমরা দুটো কাজ একসঙ্গে করে থাকি। যেমন উল বুনতে বুনতে ক্রিকেট খেলা দেখা। কিন্তু বিভক্ত মনোযোগ অসম্ভব ব্যাপার। এক সঙ্গে আমরা কখনই দুটো জিনিষে মন দিতে পারি না। যখন আমাদের মনে হয় আমরা দুটি জিনিষে একসঙ্গে মনোযোগ দিচ্ছি, তখন আসলে দুটো জিনিষে মনোযোগ দিই না। এই সময় নিম্নলিখিত তিনটি জিনিষ ঘটে থাকতে পারে :—

(১) হয়ত দুটি কাজের মধ্যে একটিতে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন হয় না। উল বোনার সময় মনোযোগ উল বোনার প্রতি থাকে না, থাকে খেলার মাঠে।

(২) মনোযোগ একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ঘোরা ফেরা করতে পারে। সভায় বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি আবার বক্তৃতাও শুনছি। এক্ষেত্রে মনোযোগ কখনও থাকে বন্ধুর প্রতি, কখনও থাকে বক্তৃতায়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায় না। বিষয়টি আয়ত্ত করতে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ সময়ের অপচয় হয়।

(৩) অনেক সময় আমরা একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে থাকি তার কারণ আমরা সেগুলিকে অনেকগুলি বস্তু হিসাবে দেখি না, একক বস্তু হিসাবে দেখি। রাস্তায় তিনটে গাড়ী একসঙ্গে যখন দেখি তখন সেগুলিকে একক করে দেখি, পৃথকভাবে তিনটি গাড়ী দেখি না। তিনটে গাড়ীর রং, আকৃতি ইত্যাদি যদি বিশদ ভাবে দেখতে হয় তাহলে এক একটি গাড়ী পৃথক ভাবে দেখতে হবে।

মনোযোগের বিকর্ষণ (Distraction of Attention)

আকস্মিক গোলমাল বা সবিরাম গোলমাল মনোযোগকে একটানা গোলমাল থেকেও বেশী ব্যাহত করে। অর্থপূর্ণ শব্দ যেমন সঙ্গীত বা কথোপকথন অর্থহীন গণ্ডগোলের চেয়েও বেশী প্রভাবিত করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গোলমালের দ্বারা মনোযোগ প্রভাবিত হলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

তবে মনোযোগের ওপর গোলমালের প্রভাব একেবারেই নেই বললে ভুল হবে। গোলমালের সময় কোন কিছুতে মনোনিবেশ করার জন্য শক্তির ক্ষয়

হয় বেশী। বহু চেষ্টা করে মনসংযোগ করতে হয়, এমনকি অর্থহীন শব্দ যেমন টাইপ করার শব্দ হলেও মনসংযোগের জন্য অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। অল্পক্ষণের জন্য খুব সামান্য কাজ করতে হলে, এই শক্তি ক্ষয় হয় না কারণ অভীক্ষার্থীর অনেক শক্তি তখনও সঞ্চিত আছে। কিন্তু যখন কোন দুরূহ কাজ বা বুদ্ধিমূলক কাজ করি তখন এই গণ্ডগোলের বিরোধিতা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হয় এবং আমরা হাঁফিয়ে উঠি।

মনোযোগে গোলমালের প্রভাব আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন হয়। কোন ব্যক্তি সামান্য গোলমালেই কাজ করতে পারে না আবার কেহ কেহ শত গোলমালেও বিচলিত নয়, নিজের কাজে অতি সহজেই মনঃসংযোগ করতে পারে।

প্রত্যাশিত মনোযোগ (Expectant Attention)

প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয়ের সময় তোমরা দেখে থাকবে পরীক্ষার্থী যদি প্রস্তুত হবার পর চাবির দিকে মনোযোগ দেয় তাহলে তার প্রস্তুতির জন্য অধিক মনোযোগ দিতে হয়। মনোযোগ যখন উত্তর দানের জন্য ব্যগ্র হয় তখন প্রতিক্রিয়া কাল কম হয়; আর উত্তেজকের প্রতি মন নিবিষ্ট থাকলে প্রতিক্রিয়াকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়। একে প্রত্যাশিত মনোযোগ বলে। মন পূর্ব্ব থেকে উত্তেজককে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাই প্রতিক্রিয়া দ্রুত হয়। যেমন কেউ আসবে জানা থাকলে, কড়া নাড়ামাত্রই দরজা খুলে দিই।

মনোযোগের প্রস্তুতি (Attentive Set)

কোন কিছুতে মন দেবার সময় আমাদের মন একাগ্র হয়ে ওঠে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়। পেশীগুলি দৃঢ়বদ্ধ হয়, বিশেষ করে ঘাড় ও কাঁধের পেশী। তাই মনোযোগের সময় আমরা ঘাড় লম্বা করি এবং কাঁধ খাড়া রাখি। দেহের অন্যান্য অঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখ বড় করি, কান খাড়া করি এবং শ্বাস ক্রিয়া দ্রুত হয়। ব্যক্তি যদি বসে থাকে তাহলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মনোযোগের অবধারক (Conditions of Attention)

বহির্বিশ্বের অফুরন্ত সামগ্রী মানুষের মনোযোগকে আকর্ষণ করার জন্য মায়াজাল বিস্তার করছে। নয়ন মনোহর দৃশ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উৎকট শব্দ তার শ্রুতিতে সংবেদন জাগায়, উজ্জ্বল আলো তার চোখ ধাঁধাঁয়। বহির্বিশ্বে কত বিষয়, কত দ্রব্য সম্ভারের আয়োজন রয়েছে। মানুষ নিত্য যা দেখে তাতে নূতন করে মন দেয় না। কিন্তু নূতন কিছু, অদ্ভুত কিছু দেখলেই মানুষের কুতূহলী মন তাতে মনোনিবেশ করে। কেবল বহির্বিশ্বেই যে আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে তা নয়, মানুষের মনেও আছে অপার কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা, তার বাসনা ও কামনা। তাই মানুষ তার কাম্য বস্তুটি যত্ন করে দেখে ; তার আগ্রহের সমাধান যেখানে পায়, সেখানেই ক্ষুধিত দৃষ্টি স্থাপন করে। এইভাবে বহিবিশ্বে ও মানুষের অন্তরজগতে উভয়স্থানেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে মনোযোগের অবধারক। এই অবধারক দুই প্রকার :—

১। বস্তু নির্ভর হেতু (Objective Condition of Attention)

২। ব্যক্তি নির্ভর হেতু (Subjective Condition of Attentoin)

আমরা একে একে এগুলির আলোচনা করব :—

১। মনোযোগের বস্তুনির্ভরহেতু (Objective Condition of Attention)

বস্তুর তীব্রতা, আকৃতি পরিবর্তনশীলতা, পুনরাবৃত্তি, নূতনত্ব প্রভৃতি মনোযোগের বস্তুনির্ভরহেতুর অন্তর্ভুক্ত।

(ক) বস্তুর তীব্রতা (Intensity) :—উত্তেজক যদি তীব্র হয় তবে তা সহজেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। উজ্জ্বল রং, উচ্চ শব্দ, উগ্র গন্ধ আমাদের মনকে অধিক আকৃষ্ট করে। ক্ষীণ শব্দ, ম্যাড়মেড়ে রং, এর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য। উত্তেজকের এই বিশেষ গুণ তীব্রতা তার শক্তির সাহায্যে সহজে মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(খ) আয়তন (size) বস্তুর আয়তন ও আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে। আমাদের মনের কাছে বৃহৎ বস্তুর আবেদন কম নয়। সেইজন্য বিজ্ঞাপনের পোস্টারের লেখাগুলো বড় বড় করা হয়।

(গ) আকৃতি :—বস্তুর আকৃতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পথে চলতে খুব লম্বা লোক দেখলে ' আমরা সহজেই মনোযোগ দিই। বিরাট

দেহধারীকে রাস্তায় দেখলে মন না দিয়ে কেউ পারে না। মোটা লোক থপথপিয়ে চলছে এ দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য।

(ঘ) পরিবর্ত্তনশীলতা :—কোন কিছুর পরিবর্ত্তন আমাদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। দীর্ঘদিন ধরে এক পথে চলছ, কিছুদিন বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে সেই পথের পাশে একটা নূতন বাড়ী নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করলে এটা ত এখানে ছিল না, কিন্তু কি ছিল এখানে মনে করতে চেষ্টা করলে দেখবে সহজে মনে পড়ছে না। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা খালি জমিটা বা ভাঙ্গা বাড়ীটা তোমার চোখেই পড়েনি। আজ নূতন বাড়ীটা সহজেই চোখে পড়ল। . বাইরের গোলমাল হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বক্তার দীর্ঘ বক্তৃতাও শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে পারে যদি বক্তা স্বর বা বলার ভঙ্গির পরিবর্ত্তন করেন।

(ঙ) গতিশীলতা (Movement) :—গতিশীল বস্তু আমাদের মনকে সহজে আকর্ষণ করে। গাছে একটা পাখী বসে আছে, তোমার চোখ পড়ছে না অথচ পাখীটা উড়ে গেলে চোখে পড়বে। চলমান ট্রেন গেলে তাই সেদিকে সহজেই মন দিই। একই কারণে আজকাল আলোর সাহায্যে এই গতিশীলতা দেখান হয়। কলকাতায় চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যার পর যারা গেছে তারাই দেখেছে এই আলোর খেলা। Lipton Tea-এর একটার পর একটা অক্ষর জলে, সবগুলো জলে উঠলে আবার নিভে যায়। চৌরঙ্গীতে এরকম কত বিজ্ঞাপনই দেখা যায়।

(চ) পুনরাবৃত্তি (Repetition) :—একই জিনিষ বারবার আবৃত্তি করেও মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। তবে যদি বহুক্ষণ ধরে পুনরাবৃত্তি করা হয় তাহলে কেউ মন দেয় না। হাওড়া স্টেশনে প্রথম প্রবেশ করলে মাইকের সাহায্যে যে ট্রেনের সময়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তাতে আমরা মন দিই। কিন্তু বহুক্ষণ ধরে একই জিনিষের আবৃত্তি আমাদের মনকে শেষে আর আকর্ষণ করতে পারে না।

(ছ) নূতনত্ব (Novelty) : নূতনত্ব আমাদের মনকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। অপরিচিত কিছু দেখলেই আমরা সে বিষয়ে মনোযোগী

হই। চিড়িয়াখানায় নূতন সাদা বাঘের আগমন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ক্লাসের নূতন ছাত্রটিকে আমরা বার বার লক্ষ্য করি।

(জ) বৈষম্য ঃ—কোন কিছুর মধ্যে বৈষম্য বা বিভেদ দেখলেও আমরা মনোনিবেশ করি। যেমন একটি সুন্দর চিত্রে একটি কালো দাগ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। সবুজ গাছের লাল ফুলটি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। কাপড়ের ছেঁড়া বা দাগ লাগা অংশ আমাদের চোখে পড়ে।

(ঝ) অদ্ভুত আকৃতি ঃ—অদ্ভুত সাজপোষাক পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আমাদের চোখে পড়ে। সার্কাসের ক্লাউনের দিকে তাই আমরা মন দিই।

(ঞ) গোপনতা ঃ—কোন কিছুর গোপনতা আমাদের সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। রহস্যপূর্ণ কোন ঘটনার আভাস পেলে, আমরা তা শোনার জন্য ব্যগ্র হই। কারোও গোপন কুৎসা শুনবার জন্য আমরা কান পাতি।

২। মনোযোগের ব্যক্তি নির্ভরহেতু (Subjective Condition of Attention)

বস্তুগত কারণগুলিই মনোযোগের একমাত্র কারণ নয়। ব্যক্তির আগ্রহ, রুচি, প্রবৃত্তি প্রভৃতিও মনোযোগের হেতু। বিজ্ঞাপন দাতাগণ এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে থাকেন। বিজ্ঞাপনের দ্বারা তাঁরা ব্যক্তির আত্ম প্রত্যয়, কৌতূহল অথবা ভয় প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে জাগাবার চেষ্টা করেন। খাদ্য প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট শিশুর ছবি দেওয়া হয় মাতৃস্নেহকে উদ্দীপ্ত করার জন্য। বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদন ও থাকে। যে কোন দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে যৌবন ভারাক্রান্ত নারীর মূর্ত্তি দেওয়া থাকে। কাপড়ের দোকানে সাজানো নারীর মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির আবেদন কম নয়।

(ক) আগ্রহ ঃ—বস্তুর মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা না থাকলে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি অথবা অর্জ্জিত আগ্রহ মনকে বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে। নির্জ্জন শৈলময় অঞ্চলে সূর্যাস্তের দৃশ্য কবি-মনে ভাবাবেগের সৃষ্টি করবে। কিন্তু অকবি জন সূর্যাস্তের সূচনায় বিপদাশঙ্কায় ত্বরিতে প্রস্থান করিবে। নিজের সন্তানের ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ আর কেউ শুনতে না পেলেও মায়ের কানে ঠিক পৌঁছায়। নিজের নাম ধরে কেউ ডাকলে, সে ডাক আমরা শুনতে পাবই।

(খ) আবেগ :—আবেগ আমাদের মনোযোগকে প্রভাবিত করে। মনে আনন্দ থাকলে, আগ্রহ না থাকলেও আমরা অনেক বিষয়ে মন দিই। তুমি নুন মিশিয়ে কাঁচা আম খেতে ভালবাস, মনে যদি আনন্দ থাকে তাহলে রাস্তার পাশের আমগাছটা তোমায় আকর্ষণ করবে। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করার সংবাদ নিয়ে ফেরার সময় শত আম গাছের আবেদন ও নিষ্ফল হবে।

(গ) শিক্ষা :—আবার বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা থাকলে আমরা সেই সেই বিষয়ে মনোযোগী হই। শিল্পীর কাছে অজন্তা গুহার আকর্ষণ খুবই প্রবল সুরকার একটি ভাল গান শুনলেই কান পেতে শুনবে, কিন্তু যারা গান জানে না তারা মন দেবে না।

(ঘ) পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা : পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা অনেক সময় আমাদের বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে। যেমন বর্ষাকালে পল্লীগ্রামে আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে ছপাৎ করে শব্দ হলেই তুমি সাপ আছে কিনা দেখবে। জলা জায়গায় সাপ থাকে, সাপে কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য্য এরূপ অভিজ্ঞতা আছে বলেই এরূপ মনোযোগ।

বস্তুনির্ভর কারণ অপেক্ষা ব্যক্তিনির্ভর কারণগুলি মনোযোগকে বেশী প্রভাবিত করে। উচ্চ শব্দের চেয়ে ফিস্‌ফিস্ আওয়াজে আমরা বেশী মন দিই যদি সেই আওয়াজের বিশেষ কোন পূর্ব্ব সঙ্কেত থাকে ব্যক্তির কাছে। বস্তুর এমনিতে কোন অর্থ নেই, কোন আকর্ষণ নেই, মানুষই তাকে অর্থময় করে তোলে, মানুষের কামনা বাসনা প্রভৃতি তাকে বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে। মানস প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়। মদ্যপের কাছে মদের বোতলের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। আবার যে খেলোয়াড়, সে সংবাদপত্রের খেলার খবরটাই আগে পড়বে ; বেকার চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখবে। এ পৃথিবীতে কত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বাস করে। তাদের রুচি, প্রকৃতিও বিভিন্ন। অতএব বস্তু যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তোমার মানসিক ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ না থাকলে তুমি মনোযোগ দিতে না।

ব্যক্তি নির্ভর, বস্তু নির্ভর হেতু ছাড়া আর একটি হেতু হল শারীরিক সুস্থতা। সুস্থ, সজীব মানুষের কাছে চমকপ্রদ বস্তুর আবেদন থাকতে পারে কিন্তু অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন। আবার দেহ ও মন যখন ক্লান্ত তখনও কোন কিছুতে মন দেওয়া যায় না। তাই সকালে ঘুমের

পর দুরূহ বিষয়টির সমাধান সহজেই হয় কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি নিয়ে রাত্রে কিছুতেই সেই বিষয়টিতে তুমি মনঃসংযোগ করতে পারবে না।

মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention and interest)

আগ্রহ সর্ব্বদাই কোন না কোন মানসিক বৃত্তিকে জাগরিত করে। এই সহজাত বৃত্তির সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে। যেমন ছবি তোলার প্রতি হয়ত কোন ব্যক্তির আগ্রহ আছে। এর অর্থ হল ছবি তুলতে তার ভাল লাগে এবং ছবি তোলার প্রতি তার একটা আকর্ষণ বা প্রবৃত্তি আছে। তাই মনোবিদগণ আগ্রহকে বলেছেন অনুভূতি মূলক (affective), জ্ঞানমূলক নয় (cognitive)। যার প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে তা আমাদের সেই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। যেমন যার সূচীশিল্প ইত্যাদিতে ঝোঁক আছে, সে নূতন একটি প্যাটার্ণ দেখলেই সে বিষয়ে মনোযোগী হবে। দাবা খেলায় যার আগ্রহ আছে সে দাবার নূতন চাল দেখলেই মনোযোগ দেবে। আগ্রহ দুই প্রকার (১) ব্যক্তিগত (২) জাতিগত।

(১) **ব্যক্তিগত আগ্রহ** :—ব্যক্তিগত আগ্রহ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে থাকে। যে ব্যক্তির সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ আছে সে সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোযোগী হবে। এ আগ্রহ নিতান্তই ব্যক্তিগত, জাতিগত নয়। দাবা খেলায় তোমার যে আসক্তি তা জাতির সকলের থাকে না, আরও কয়েকজনের থাকতে পারে মাত্র। এই জন্য এ হল ব্যক্তিগত আগ্রহ। ব্যক্তিগত আগ্রহ আবার স্থায়ী এবং অস্থায়ী হতে পারে। পরীক্ষার সময় পাঠের প্রতি ছাত্রের যে আগ্রহ তা হল সাময়িক বা অস্থায়ী আগ্রহ, পরীক্ষার পর এ আগ্রহ আর থাকে না। তেমনি কোন বেকার কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ততদিন দেখবে যতদিন না তার ভাল চাকুরি হয়। তোমার যখন একটা রেডিও কেনা দরকার তখনই তুমি নানা ধরণের রেডিওর প্রতি মনোযোগী হবে। কাগজে রেডিওর বিজ্ঞাপন সহজেই তোমার চোখে পড়বে।

কোন ব্যক্তির আগ্রহ আবার স্থায়ী হতে পারে। যেমন যে ব্যক্তির সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ আছে, সারা জীবন তার এই আগ্রহ থাকতে পারে। যে দার্শনিক সে সারাজীবন দর্শনচর্চ্চায় আগ্রহ পোষণ করতে পারে।

এই দিক থেকে দেখলে আগ্রহকে আমরা জন্মগত ও ব্যক্তিগত এই দুই

শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। শিল্পীর জন্মগত আগ্রহ হল রূপসৃষ্টি। এ ক্ষমতা তার জন্মসূত্রে পাওয়া। সুন্দর ছবি, নয়ন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য তাই সহজেই শিল্পী মনকে আকর্ষণ করবে। এ আগ্রহ স্থায়ী এবং সারাজীবনই এ আগ্রহ থাকবে।

আগ্রহ অর্জ্জিত হতে পারে, যেমন ভ্রমণের প্রতি তোমার এখন আগ্রহ আছে, পরে নাও থাকতে পারে। এখন তুমি চিঠি লিখতে ভালোবাসো, চিঠি লেখার প্রতি তোমার এই আগ্রহ অর্জ্জিত। এখন তোমার ষোল বৎসর বয়স, মনের ভাবে ভাষা দিতে চাও তাই বন্ধুকে চিঠি লেখো, উত্তরের অপেক্ষা না রেখে আবার লেখো। কিন্তু এ বয়স যখন চলে যাবে যখন তোমার কর্ম্মজগতে তুমি প্রবেশ করবে, তখন হয়ত চিঠি লেখার প্রতি তোমার এ আগ্রহ থাকবে না। ছাত্র অবস্থায় খেলার প্রতি যে আগ্রহ থাকে, পরবর্ত্তীকালে তা নাও থাকতে পারে ; এ হল **অর্জ্জিত আগ্রহ**।

(২) **জাতিগত আগ্রহ** :—এক একটি জাতির এক একটি বিশেষ আগ্রহ থাকতে পারে। ফরাসী জাতি যেমন বিলাস ব্যসনের প্রতি আগ্রহশীল। যেমন রোমের নৃত্য গীতের প্রতি আসক্তি। ভারতের আসক্তি তার ধর্ম্ম। যৌন আগ্রহকে আমরা জাতিগত আগ্রহ বলতে পারি। এ আগ্রহ ব্যক্তি বিশেষের নয়। জাতির সকল ব্যক্তির। মাতৃস্নেহ যৌন আগ্রহের একটা দিক।

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেছেন টাকার দুপিঠ দেখার মত মনোযোগ ও আগ্রহকে আমরা দেখি। অর্থাৎ মনোযোগ ও আগ্রহ হল একই জিনিষের দুপিঠ। মানসিক গঠনের শৃঙ্খলাযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে উভয়ের মূলে। আগ্রহ অর্থে আমরা এই মানসিক গঠনকে বুঝি। মনোযোগ হল ঐ গঠন যা করতে চায় তারই প্রকাশ। কোন কিছুতে আগ্রহ থাকার অর্থই হল সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করা। মানসিক গঠনের সক্রিয়তাই হল মনোযোগ। আগ্রহ হল গুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হল ক্রিয়ারত আগ্রহ ("Interest is latent attention and attention is interest in action.")

সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের কোন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের হেতু। এতক্ষণ যে মানসিক গঠনকে আমরা মনোযোগের হেতু বলছিলাম, তাকে আমরা জন্মগত সহজাত প্রবৃত্তি বলতে পারি। কিন্তু কেবল অনর্জ্জিত সহজাত

প্রবৃত্তি নয় (instinct), অর্জিত বৃত্তি (sentiment) থাকতে পারে। কোন ব্যক্তি ছবি তুলতে ভালবাসে এই কথাটিকেই একটু ঘুরিয়ে আমরা বলতে পারি ছবি তোলার প্রতি উক্ত ব্যক্তির একটা সেন্টিমেন্ট আছে। সেন্টিমেন্ট হল অর্জিত আগ্রহ সেন্টিমেন্টের সঙ্গে আবেগ জড়িত থাকে।

এতক্ষণ আমরা সহজাত প্রবৃত্তি এবং সেন্টিমেন্টকে মনোযোগের হেতু স্বরূপ বলছিলাম। এ প্রকার মনোযোগ হল স্বতঃস্ফূর্ত, অনৈচ্ছিক (Non volitional)। কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা সেন্টিমেন্ট না থাকলেও আমরা কোন কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে থাকি। এখানে ইচ্ছার (will) প্রভাব আছে। পরীক্ষার সময় ছাত্রের মনোযোগ হল ইচ্ছাকৃত (volitional)। এখানে আগ্রহ ও মনোযোগের নিবিড় সম্বন্ধটা যেন নষ্ট হয়ে গেল মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে পরীক্ষার সময়• মনোনিবেশের হেতু হল একটা উদ্দেশ্য, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যশ সম্মান লাভ ইত্যাদি। এক কথায় এর প্রয়োজন আছে (it matters) তাই ছাত্র মনোযোগী হয়।

এখন যে ইচ্ছাকে ছাত্র মনোনিবেশের জন্য প্রয়োগ করছে, সে ইচ্ছা কি? এ ইচ্ছা শুধু তার সহজাত বৃত্তি নয়, সেন্টিমেন্ট নয়, এর মূলে আছে মানসিক গঠন। সমস্ত ব্যক্তিত্ব এই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব আগ্রহ এই সহজাত বৃত্তি, ওই সহজাত বৃত্তি বা এই সেন্টিমেন্ট, ওই সেন্টিমেন্ট নয়, সমস্ত সেন্টিমেন্ট বা সমস্ত সহজাত বৃত্তি। এদিক থেকে দেখলে ঐচ্ছিক মনোযোগকেও আমরা আগ্রহেরই ক্রিয়াশীল প্রকাশ বলতে পারি।

মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ (Types of attention)

বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে মনোযোগের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হয়:—

(১) মনোযোগকে **ইন্দ্রিয়গত** (sensorial) ও **ভাবগত** (ideational) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মনোযোগের বিষয় যখন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, তখন তাকে বলা হয় ইন্দ্রিয় গত মনোযোগ। যেমন রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা তাতে মনোযোগ দিই। আবার যখন আমরা গল্পের কথা ভাবি বা অপ্রত্যক্ষ, অমূর্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন হয় ভাবগত মনোযোগ। কোন কিছুর কল্পনা করাও এই মনোযোগের অন্তর্ভুক্ত।

(২) মনোযোগ আবার স্বতঃ-প্রণোদিত (Nonvolitional) এবং ইচ্ছা-প্রণোদিত (volitional) হতে পারে। পরীক্ষার সময় পড়তে ভাল না লাগলেও জোর করে যখন পাঠে মনসংযোগ করি তখন হয় ইচ্ছা প্রণোদিত মনোযোগ। উপন্যাস পাঠের মনোযোগ হল স্বতঃ প্রণোদিত।

(৩) মনোযোগকে প্রত্যক্ষ (direct) ও পরোক্ষ (indirect) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্তাকর্ষক বস্তুর প্রতি মনোযোগ হল প্রত্যক্ষ মনোযোগ। সুন্দর শাড়ীর প্রতি মেয়েদের মনোযোগ হল প্রত্যক্ষ মনোযোগ। অনেক বিষয় আছে যা অন্য কোন আকর্ষণের সঙ্গে জড়িত থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন অতি নগণ্য কোন ব্যক্তিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে যদি কোন মহাপুরুষ বা সম্মানিত ব্যক্তির পাশে তাকে দেখা যায়। ছেঁড়া চটির প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকার কথা নয় কিন্তু যদি কেহ বলে এই চটি বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যবহার করতেন, তাহলে তখনই আমরা তাতে মনোযোগ দেব।

(৪) মনোযোগ সংশ্লেষাত্মক (synthetic) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytic) হতে পারে। যখন কোন জিনিষ আমরা সমগ্রভাবে দেখি, তখন হয় সংশ্লেষাত্মক মনোযোগ, যেমন একটি গাড়ীকে যখন একক গাড়ী হিসাবে দেখলাম তখন হল সংশ্লেষাত্মক মনোযোগ। কিন্তু গাড়ীর চাকা, ইঞ্জিন, রং, ড্রাইভার, আরোহী প্রভৃতির প্রতি যখন আমরা একে একে মনোযোগী হই, তখন হয় বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. Define the nature of attention, what are its different kinds ?

মনোযোগের স্বরূপ কি ? মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ কর।

2. State and explain the Conditions of attention.

মনোযোগের সর্ত্তগুলি বল ও ব্যাখ্যা কর।

3. Interest is latent attention and attention is interest in action Explain this Statement giving concrete examples.

আগ্রহ হল গুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হল ক্রিয়ারত আগ্রহ। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

4. What is attention? Describe the mentel processes involved when you concentrate on any subject.

মনোযোগ কি? মনোযোগের সময় তোমার মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বর্ণনা দাও।

5. Explain the relation between attention and interest.

মনোযোগ ও আগ্রহের সম্বন্ধ নিরূপণ কর।

6. Write short notes on :—

(a) Voluntary and Nonvoluntary attention.

(b) Attention and interest.

(c) Fluctuation of attention.

(d) Span of attontion.

(e) Subjective Conditions of attention.

(f) Attentive set.

(ক) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মনোযোগ।

(খ) মনোযোগ ও আগ্রহ।

(গ) মনোযাগের বিচলন।

(ঘ) মনোযোগের বিস্তার।

(ঙ) মনোযোগের ব্যক্তি নির্ভর হেতু।

(চ) মনোযোগের প্রস্তুতি।

দশম অধ্যায়

পরিসংখ্যান
(Statistics)

পরিসংখ্যান গণিত শাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপদেই আমরা উপলব্ধি করি। এই পরিমাপের সহজতম উপায় হল সারি-বিন্যাস (ranking)। স্কুলে তোমরা যে পরীক্ষায় প্রথম স্থান, দ্বিতীয় স্থান, ইত্যাদি অধিকার কর—তা এইভাবে সারি বিন্যাস করে ও পাওয়া যায়। সারি বিন্যাসের দ্বারা কিন্তু ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সম্পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায় না শ্রেণীর অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় কার কিরূপ কৃতিত্ব বোঝা যায় মাত্র।

আর এক উপায়ে আমরা কৃতিত্বের মান নির্দ্ধারণ করে থাকি, তা হল রাশি দ্বারা (scores)। কোন কিছুর পরিমাপকে আমরা এইভাবে রাশির সাহায্যে ব্যক্ত করে থাকি। তোমরা পরীক্ষার নম্বর এভাবেই পেয়ে থাক। এই নম্বর কিন্তু ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই স্কোর নানারকমের হতে পারে, যেমন ওজনের বেলায় গ্রাম, কিলোগ্রাম, দৈর্ঘ্য প্রস্থের বেলায় মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদি।

এই স্কোরগুলিকে সমদূরত্বে সাজালে স্কেল (Scale) পাওয়া যায়। যেমন ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ সমদূরত্ব বিশিষ্ট সংখ্যাগুলি একটি স্কেলের আভাস দেয়।

এই স্কোর আবার বিন্যস্ত (grouped) হতে পারে; অবিন্যস্ত (ungrouped) হতে পারে। একসঙ্গে অনেক স্কোরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে স্কোরগুলি সাজিয়ে না নিলে চলে না। এই স্কোরগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কোন স্কোর হয়ত ১০ বার এসেছে, কোন স্কোর ৫ বার, কোন স্কোর হয়ত একবার। এই ভাবে স্কোরগুলিকে সাজিয়ে নেওয়াকে বলে পরিসংখ্যা বণ্টন (frequency distribution)। এই স্কোরগুলির সঠিক বণ্টন (distribution) করা হলে, তাকে বলা হয় বিন্যস্ত (grouped) স্কোর।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন (Frequency distribution)

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের কতগুলি নিয়ম আছে। প্রথমে স্কোরগুলিকে শ্রেণী ব্যবধানে (class-interval) সাজিয়ে নিতে হয়। শ্রেণী ব্যবধান ঠিক করার জন্য প্রথমে স্কোরগুলির প্রসার দেখে নিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন স্কোরের বিয়োগফলকে প্রসার (Range) বলে। এরপর শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা ১০ এর কম বা ২০ এর বেশী হয় না।

শ্রেণী ব্যবধান ঠিক হলে স্কোরগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে সাজিয়ে নিতে হবে। এবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যে ফেলতে হবে। নীচের উদাহরণটি দেখ :—

৫০টি ছেলের পরীক্ষার নম্বর :—

80	25	25	40	30	29	34	44	42	45
44	20	48	44	44	48	36	46	46	46
36	60	32	48	32	60	65	75	35	10
60	20	46	48	50	38	48	34	50	60
34	80	75	20	15	70	68	38	62	48

তালিকা নং—১

উপরের উদাহরণে সর্ব্বোচ্চ স্কোর 80 সর্ব্বনিম্ন স্কোর 10 এবং প্রসার 70

শ্রেণী-ব্যবধান (class-interval)	ট্যালি (tallies)	ফ্রিকোয়েন্সি (frequencies)
10—19	//	2
20—29	𝍸 /	6
30—39	𝍸 𝍸 /	11
40—49	𝍸 𝍸 𝍸 //	17
50—59	//	2
60—69	𝍸 //	7
70—79	///	3
80—89	//	2

তালিকা নং—২

দেখা যাচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান যদি 10 ধরা হয় তাহলে শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা হবে 70 ÷ 10 = 7 অতএব সর্বোচ্চ শ্রেণী ব্যবধান থেকে আরম্ভ করে শ্রেণী ব্যবধানগুলি সাজিয়ে নিয়ে সুরু করা যায়। উপরে ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন করা হল।

উপরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে দেখা যাচ্ছে "10—19" শ্রেণী ব্যবধানে দুইটি মাত্র চিহ্ন (tally) পড়েছে; এর অর্থ হল দুইজন মাত্র ছেলে 10—19র মধ্যে নম্বর পেয়েছে; 20—29 শ্রেণী ব্যবধানে 6টি চিহ্ন পড়েছে অর্থাৎ 6টি ছেলে 20—29 এর মধ্যে পেয়েছে ইত্যাদি।

পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency polygon)

পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করতে গেলে গ্রাফ কাগজে প্রথমে দুটি অক্ষরেখা ঠিক করে নিতে হবে। অনুভূমিক লাইনে শ্রেণী-ব্যবধানগুলি বসিয়ে

শ্রেণী-ব্যবধান (class-interval)	সংখ্যা (frequencies)	শ্রেণী-ব্যবধান (class-interval	সংখ্যা (frequence)
195—199	1	165—169	6
190—194	2	160—164	4
185—189	4	155—159	4
180—184	5	150—154	2
175—179	8	145—149	3
170—174	10	140—144	1
			N = 50

তালিকা নং—৩

নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধান উল্লেখ করার সময় প্রকৃত প্রান্তগুলির উল্লেখ করতে হবে। প্রকৃত প্রান্ত বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে বুঝান হল। উপরের 3নং তালিকায় দেখা যাইতেছে যে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী-ব্যবধান হল 140—144; তার উপরের শ্রেণী-ব্যবধান হল 145—149, এখন

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে 144 থেকে 145 পর্যন্ত যে ব্যবধান সেটি কি তবে শূন্য থাকবে? মোটেই তা নয়। শ্রেণী-ব্যবধান "140—144" বললে বোঝায় যে ওই শ্রেণী-ব্যবধানটির 139·5 থেকে আরম্ভ এবং 144·5 এতে শেষ। 139.5 কে বলা হয় এই শ্রেণী-ব্যবধানের নিম্ন প্রান্ত (lower limit) এবং 144·5 কে বলা হয় এই শ্রেণী ব্যবধানটির উর্দ্ধপ্রান্ত (upper limit)। আবার শ্রেণী ব্যবধান "145—149" এর আরম্ভ 144·5 এ এবং শেষ 149·5 এ ইত্যাদি।

লেখচিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য অনুভূমিক লাইনের ডান প্রান্তে একটি এবং বাম প্রান্তে একটি বেশী শ্রেণী ব্যবধান নিতে হবে। এবং এই দুই শ্রেণী ব্যবধানের পরিসংখ্যা 0 ধরিতে হবে।

পরিসংখ্যা (frequency) বসানোর জন্য আমরা অনুভূমিক লাইনের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্য বিন্দু ধরে লম্বা রেখা বরাবর উপরের দিকে যেখানে উক্ত পরিসংখ্যাটি পড়বে ততদূর যাব এবং ঐ স্থানে একটি বিন্দু চিহ্নিত করব। এই ভাবে এর পরের শ্রেণী ব্যবধানটিরও মধ্য বিন্দু থেকে উপরের দিকে নির্দ্দিষ্ট পরিসংখ্যা পর্য্যন্ত গিয়ে দাগ দেব। এইভাবে সব শ্রেণী ব্যবধানগুলির নির্দ্দিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি চিহ্নিত করা হলে, আমরা লেখচিত্রে কয়েকটি বিন্দু পাব। এই বিন্দুগুলি এবার যোগ করে দিতে হবে। অনুভূমিক লাইনের দুই প্রান্তে যে দুটো বেশী শ্রেণী ব্যবধান নেওয়া হয়েছে, তার মধ্য বিন্দুতে আমাদের অঙ্কিত লেখচিত্রের প্রান্তগুলি যোগ করে দিতে হবে।

লেখচিত্রটা যাতে খুব লম্বা বা খুব চওড়া না হয় তার জন্য একটি একক ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণতঃ লম্বরেখাটি অনুভূমিক লাইনের $\frac{3}{4}$ ভাগ হয়ে থাকে। ধর অনুভূমিক লাইনের ঘরগুলি গুনে দেখা হল 60। এখন $60 \times \frac{3}{4} = 45$ ঘর নিতে হবে লম্ব রেখার জন্য।

পরিসংখ্যা বহুভুজের মধ্যবর্ত্তী অংশটির ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ পরিসংখ্যা (total faequencies) বোঝায়। লেখচিত্রে শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্য বিন্দুটি সমস্ত শ্রেণী ব্যবধানকে বোঝায়। ৩নং তালিকার সাহায্যে নীচে একটি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হল।
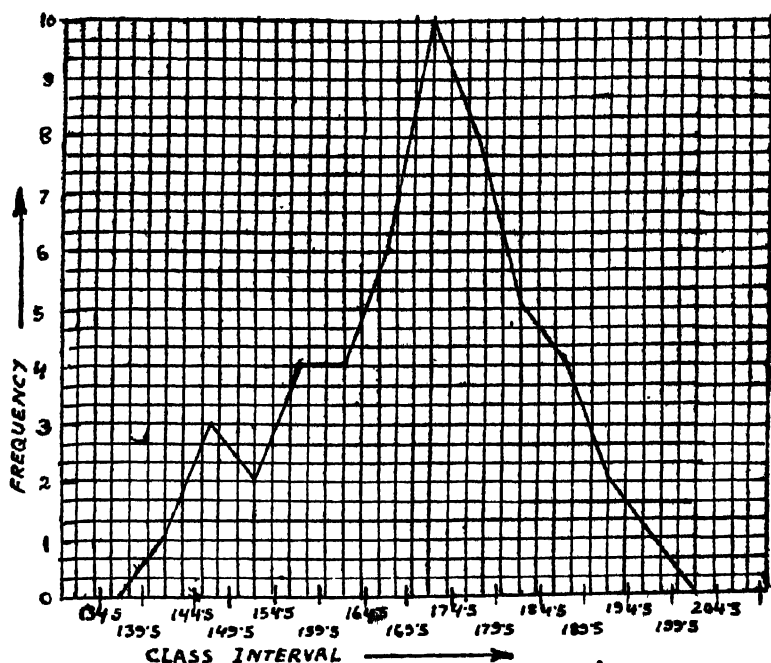
Question (প্রশ্নাবলী)

1. Relate the Procedure you will follow to find a frepuency distribution from the raw scores. Discuss with examples.

পরিসংখ্যা বণ্টনের নিয়মগুলি উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।

2. Suppose that sets of scores have the ranges given below. Indicate how large an interval and how many intervals you will suggest for use in drawing up a frequency distributicn of each set.

Range :—

16 to 87, 0 to 46, 110 to 212, 63 to 151, 4 to 16.

কতগুলি স্কোরের প্রসার নিয়ে দেওয়া হল। পরিসংখ্যা বণ্টনের জন্য

কতগুলি শ্রেণী-ব্যবধান হতে পারে আর সবচেয়ে বেশী শ্রেণী ব্যবধান কত হতে পারে বল।

প্রসার :—16 – 87, 0 – 46, 110 – 212, 63 – 151, 4 – 16।

3. Tabulate each of the following scores into a frequency distribution using an interval of 3 and 5. and plot frequency polygons.

নিম্নের স্কোরগুলির পরিসংখ্যা বণ্টন কর। শ্রেণী ব্যবধান 3 অথবা 5 হইবে এবং পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

(a)				
	72	78	76	72
	75	65	76	72
	77	86	70	61
	67	78	83	67
	72	67	71	84
	81	82	63	69
				64

(b)					
	72	75	77	72	67
	81	78	65	73	86
	67	82	76	70	76
	83	71	72	72	63
	61	67	69	64	84

(c)					
	54	61	63	64	65
	64	59	67	68	64
	51	62	64	64	62
	65	67	63	61	66
	63	66	59	66	64

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Measures of central tendency)

কোন পরীক্ষণের পর তার স্কোরকে ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনে সাজানোর পর তার কেন্দ্রীয় প্রবণতা দেখতে হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে আমরা বুঝব একটি অঙ্ক যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা বিবিধ। প্রথমতঃ ইহা ঐ দলের সমস্ত স্কোরের একমাত্র প্রতিনিধি, ফলে এর থেকে গোষ্ঠী দলটির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ দুই বা ততোধিক দলের কৃতিত্বের তুলনা করায় ইহা সাহায্য করে। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের তিনটি পদ্ধতি আছে। সেগুলি হল।

(১) মিন (Mean), মিডিয়ান (Median), ও মোড (Mode)।

১। মিন (Mean) (ক) অবিভক্ত স্কোরের মিন নির্ণয় (Mean from ungrouped data) উপরিউক্ত তিন প্রকার পদ্ধতির মধ্যে Mean

সর্ব্বাধিক প্রচলিত। মিন বা গাণিতিক গড় নির্ণয়ের সাধারণ উপায় হল স্কোরগুলিকে যোগ করে তাদের সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করা। ধর ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০ স্কোর পাওয়া গেছে। এর মিন নির্ণয় করিতে হবে। স্কোরের যোগফল হল ১০০, একে স্কোর সংখ্যা ৫ দিয়ে ভাগ করিলে গাণিতিক গড় পাওয়া গেল ১০০÷৫=২০। উপরের অঙ্কটি আমরা পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যেও করিতে পারি।

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$ এখানে M = মিন বা গাণিতিক গড়।

Σ = যোগফলের চিহ্ন, X = প্রত্যেকটি স্কোর, N = স্কোরের সংখ্যা।

স্কোরগুলি অবিন্যস্ত থাকলে এই সূত্র মিন নির্ণয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বিন্যস্ত স্কোরের গড় নির্ণয় এভাবে চলতে পারে না।

(খ) **বিনস্ত স্কোরের মিন নির্ণয়** (Mean from grouped data): স্কোর বিন্যস্ত হলে অন্য সূত্রের সাহায্যে মিন নির্ণয় করিতে হয়।

বিন্যস্ত স্কোরের মিন দুভাবে নির্ণয় করা যায়:—(ক) দীর্ঘ পদ্ধতি, (খ) হ্রস্ব পদ্ধতি।

(ক) **দীর্ঘ পদ্ধতি (Long method):** দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন করার সূত্র হল :

$$M = \frac{\Sigma fx}{N}$$ এখানে M = মিন

Σ = যোগফলের চিহ্ন, F = ফ্রিকোফেন্সি, X = প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু, N = Σf = মোট সংখ্যা।

নীচে এই নিয়মে গড় বের করা হল :—

শ্রেণী-ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি f	মধ্য বিন্দু x	f x
195—199	1	197	197
190—194	2	192	384
185—189	4	187	748
180—184	5	182	910
175—179	8	177	1416
170—174	10	172	1720
165—169	6	167	1002
160—164	4	162	648
155—159	4	157	628
150—154	2	152	304
145—149	3	147	441
140—144	1	142	142
	N = 50		8540

তালিকা নং—৪

উপরের উদাহরণটি দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে কি উপায়ে দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন বার করা যায়। এখানে প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হয়, তারপর এই মধ্যবিন্দুকে (x) তৎসংশ্লিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি (f) দিয়ে গুণ করতে হয় (fx)। শেষে প্রত্যেকটি গুণফলকে (fx) যোগ করে পাওয়া গেল 8540 (Σfx)। এই যোগফলকে 50 (N) দিয়ে ভাগ করলে মিন পাওয়া যাবে। মিন $= \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{8540}{50} = 170{\cdot}80$।

(খ) হ্রস্ব পদ্ধতি (Short method) দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন নির্ণয় সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। সেইজন্য পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে হ্রস্ব পদ্ধতিতে প্রথমে একটি মিন কল্পনা (Assumed) করা হয়। পরে ভুল শুধরে নেওয়া হয়। নিম্নে কল্পিত মিন নির্ণয়ের প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। এই কল্পিত মিনের সূত্র হল :—

$M = AM + Ci$। এখানে $M =$ মিন

$$C = \frac{\Sigma fx'}{N}$$

AM = কল্পিত মিন, C = Correction অর্থাৎ ভুল সংশোধন, i = শ্রেণী ব্যবধান (interval), x′ = কল্পিত গড় বিচ্যুতি, N = ফ্রিকোয়েন্সির সমষ্টি।

নীচের উদাহরণটি দেখলে আরোও ভাল করে বুঝতে পারবে।

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু x	f	x′	fx′	Σ f′
195—199	197	1	5	5	
190—194	192	2	4	8	
185—189	187	4	3	12	
180—184	182	5	2	10	
175—179	177	8	1	8	
170—174	172	10	0		+43
165—169	167	6	—1	— 6	
160—164	162	4	—2	— 8	
155—159	157	4	—3	- 12	
150—154	152	2	—4	— 8	
145—149	147	3	—5	—15	
140—144	142	1	—6	— 6	
		50			−55

12, −12

তালিকা নং—৫

$AM = 172{\cdot}00$ $\quad C = \frac{-12}{50} = -{\cdot}240$

$Ci = -1{\cdot}20$ $\quad i = 5$

$M = 170{\cdot}80$ $\quad Ci = -{\cdot}240 \times 5 = -1{\cdot}20$

হ্রস্ব পদ্ধতিতে কল্পিত মিন নিতে হয় বণ্টনের কেন্দ্রস্থল থেকে। সবচেয়ে বেশী ফ্রিকোয়েন্সি যে শ্রেণী বিভাগের তার মধ্যবিন্দু সাধারণতঃ কল্পিত মিন ধরা হয়। এখন এই কল্পিত মিন থেকে প্রত্যেক স্কোরের অন্তর হল x′ (deviation)। কল্পিত মিনে এই x′ হবে 0। তারপর উপরের দিকে ক্রমশঃ 1, 2, 3 ইত্যাদি এবং 0 থেকে নীচের দিকে 1, 2, 3 ইত্যাদি লিখতে হবে। তারপর f কে x′ দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল fx′। এবার Ci

$=\frac{\Sigma fx'}{N}\times i$ নির্ণয় করে কল্পিত মিনের সঙ্গে যোগ দিলে আসল মিন পাওয়া যাবে।

মিডিয়ান (Median)

মিডিয়ান হচ্ছে স্কোরগুচ্ছের মধ্যবিন্দু। অবিন্যস্ত স্কোরে স্কোর জোড় অথবা বিজোড় হতে পারে। যেমন 7, 10, 8, 12, 11, 7 এটি বিজোড় স্কোরগুচ্ছ। এগুলিকে নিম্নরূপে সাজানো হল।

7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; একবার মাত্র দেখলেই বুঝতে পারবে, এখানে মিডিয়ান হবে 9 কারণ 9 এর ডানদিকেও তিনটি স্কোর আছে, বাঁদিকেও তাই আছে। কিন্তু স্কোরগুচ্ছ যদি জোড় হয় তাহলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। যেমন ধর স্কোর হল 7' 8, 9, 10, 11, 12 ; এখানে মিডিয়ান হবে 9·5 (9 ও 10 এর মধ্যবিন্দু)। অবিন্যস্ত স্কোর থেকে মিডিয়ান নির্ণয়ের সূত্র হল $Mdn=\left(\frac{N+1}{2}\right)$ তম সংখ্যা। প্রথম উদাহরণটিতে $\left(\frac{N+1}{2}\right)$ তম সংখ্যা $=\frac{7+1}{2}=4$; অর্থাৎ ঐ স্কোরগুচ্ছের যে কোনদিক থেকেই গণনা করি না কেন মিডিয়ান হবে চতুর্থ সংখ্যাটি।

বিন্যস্ত স্কোর থেকে মিডিয়ান নির্ণয়ের সূত্র হল

$$Mdn=l+\left(\frac{\frac{N}{2}-F}{fm}\right)i$$

$l=$ যে শ্রেণী বিভাগে মিডিয়ান আছে তার নিম্ন সীমা। $\frac{N}{2}=$ মোট সংখ্যার অর্দ্ধেক। $F=$ মিডিয়ানের নিম্নসীমার স্কোরগুলির যোগফল।

$fm=$ যে শ্রেণীবিভাগে মিডিয়ান আছে তার স্কোর। $i=$ শ্রেণী ব্যবধান।

এই সূত্রের ব্যবহার বুঝতে হলে নিম্নের উদাহরণটি লক্ষ্য কর :—

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f	
195—199	197	1	
190—194	192	2	
185—189	187	4	
180—184	182	5	↓
175—179	177	8	20
170—174	172	10	
165—169	167	6	20
160—164	162	4	↑
155—159	157	4	
150—154	152	2	
145—149	147	3	
140—144	142	1	

তালিকা নং—৬

এখানে $l = 169{\cdot}5$, $\frac{N}{2} = 25$, $F = 20$, $fm = 10$ এবং $i = 5$ অতএব

মিডিয়ান, $Mdn = l + \dfrac{\left(\frac{N}{2} - F\right)}{fm} i = 169{\cdot}5 + \left(\dfrac{25 - 20}{10}\right) 5 = 172{\cdot}00$

ওপর দিক থেকেও মিডিয়ান নির্ণয় করা যায়। তখন সূত্রটি হবে

$$Mdn = U - \dfrac{\left(\frac{N}{2} - F\right)}{fm} i$$

U = যে শ্রেণী বিভাগে মিডিয়ান আছে তার উচ্চসীমা।

F = যে বিভাগে মিডিয়ান আছে তার উপরের স্কোরগুলির যোগফল।

ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনে (ক) **ফাঁক বা শূন্য থাকলে** মিডিয়ান এভাবে নির্ণয় করা যায় না। এই অবস্থায় কি ভাবে মিডিয়ান নির্ণয় করা যায় নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা হল :—

ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনে ফাঁক বা শূন্য থাকলে উপরের নিয়ম চলবে না। নীচের উদাহরণ দেখ। এখানে $N = 10$ এবং $\frac{N}{2} = 5{\cdot}00$ নীচের থেকে

ফ্রিকোয়েন্সি যোগ করলে $\frac{N}{2}=5$ হবে 6 – 7 শ্রেণী ব্যবধানে অতএব শ্রেণী ব্যবধানের উচ্চসীমা হবে 7·5। কিন্তু উপর থেকে গুণলে দেখা যাবে মিডিয়ান $\frac{N}{2}=5$ হবে 12 – 13 শ্রেণী বিভাগে। এরূপ হয়েছে 8 – 9 এবং 10 – 11 দুইটি শ্রেণী ব্যবধানে 0 ফ্রিকোয়েন্সি থাকার জন্য। এরূপ অবস্থায় 6 – 7 না করে শ্রেণী ব্যবধান করা যায় 6 – 9 এবং 10 – 13। এখন উপর থেকে গুণলে দেখা যাবে মিডিয়ানের উচ্চসীমা 1 হবে 9·5, আবার নীচে থেকে গুণলেও হবে 9·5।

অতএব এখানে $\text{Mdn}=l+\dfrac{\left(\frac{N}{2}-F\right)}{fm}i=9{\cdot}5+\frac{0}{2}\times 2=9{\cdot}5$

শ্রেণী ব্যবধান	f	
20—21	2	
18—19	1	
16—17	0	
14—15	0	
12—13	2	10—13
10—11	0	
8— 9	0	6— 9
6— 7	2	
4— 5	1	
2— 3	1	
0— 1	1	

তালিকা নং—৭

মোড (Mode)

মোড দুই প্রকারে নির্ণয় করা যেতে পারে: (১) স্থূল মোড (Crude Mode), (২) প্রকৃত মোড (True Mode)।

যদি অবিভক্ত স্কোরগুলি ক্রমানুসারে সাজান থাকে, তাহলে যে স্কোরটি বেশীবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেটিকে স্থূল মোড বলে। যেমন ধর 10, 11, 11,

12, 12, 14, 13, 13, 14, 14, 14 সারিটির মধ্যে 14 সব চেয়ে বেশীবার এসেছে। অতএব 14 হল ঐ সারির স্থূল মোড।

বিস্তৃত সারির স্থূল মোড নির্ণয় করতে হলে যে শ্রেণী ব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সি বেশী সেই শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুটি নেওয়া হয়।

৬নং তালিকা দেখ। এখানে স্থূল মোড হবে 170 – 174 শ্রেণী ব্যবধানে, কারণ এর ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশী। অতএব শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু 172 হবে স্থূল মোড।

প্রকৃত মোড হল ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টনের শীর্ষ বিন্দু অর্থাৎ এই বিন্দুতে স্কোরের সংখ্যা হল সবচেয়ে বেশী। যদি ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন বহুভূজ সামঞ্জস্যপূর্ণ (symmetrical) হয়, তাহলে প্রকৃত মোড নিম্নলিখিত সূত্রটির সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে :

প্রকৃত মোড = 3 মিডিয়ান – 2 মিন (approx)। স্থূল মোড কেন্দ্রীয় প্রবণতার অস্থায়ী পরিমাপ। এটা একটা মোটামুটি ধারণা যা চোখে দেখে বার করা যায়।

মিন মোড ও মিডিয়ানের ব্যবহার

(When to use Mean Mode and Median)

১। **মিন ব্যবহার করতে হয়** কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য যখন প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন (weight) সমান হওয়া দরকার।

২। যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার সবচেয়ে বেশী নির্ভরতা (reliability) দরকার।

৩। আদর্শ বিচ্যুতি σ (সিগমা) বা সহপরিবর্তনের (r) মান নির্ণয় করার সময়, মিনের দরকার হয়। বণ্টনটি স্বাভাবিক হলে তবে মিনএর ব্যবহার কাজে লাগে।

মিডিয়ান ব্যবহার হয়

১। যখন খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানার দরকার হয়।

২। যখন বণ্টনের উভয় প্রান্তে খুব বেশী বা খুব কম মানের স্কোর থাকে।

৩। যখন বণ্টনটি খুব বেশী মাত্রায় অস্বাভাবিক হয় অর্থাৎ যখন বণ্টনটির মিন বার করা যায় না।

মোড ব্যবহার করতে হয়

১। যখন কোন স্কোরটি বেশীবার এসেছে জানতে চাই।

২। যখন খুব তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটা মানের দরকার হয়।

৩। যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটি সাধারণ পরিমাপ হলেই চলে।

Questions প্রশ্নাবলী

1. Calculate the mean, median and mode from the following distribution by using both the short and long methods. হ্রস্ব ও দীর্ঘ পদ্ধতিতে মিন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় কর :—

(a)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
40—41	4
38—39	2
36—37	5
34—35	7
32—33	9
30—31	8
28—29	6
26—27	5
24—25	5
22—23	4
20—21	3

(b)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
80—82	2
77—79	4
74—76	5
71—73	6
68—70	0
65—67	0
62—64	6
59—61	4
56—58	3
53—55	2
50—52	2

(c)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
50—54	1
45—49	2
40—44	2
35—39	3
30—34	4
25—29	5
20—24	4
15—19	4
10—14	2
5— 9	2
0— 4	1

(d)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
80— 84	6
85— 89	20
90— 94	22
95— 99	30
100—104	18
105—109	8
110—114	6

2. Find out the mean, median and mode of the following scores :—

নীচের স্কোরগুলির মিন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় কর :—

72, 75, 77, 67, 72, 81, 78, 65, 86, 73, 67, 82, 76, 76, 70, 83, 71, 62, 72, 72, 61, 67, 84, 69, 64.

3. Below is the height measurement in inches of 25 individuals, Find the mean, mode and median.

নীচে ২৫ জনের উচ্চতর পরিমাপ দেওয়া হল। মিন, মিডিয়ান ও মোড নির্ণয় কর।

54, 64, 51, 65, 63, 61, 59, 62, 67, 66, 63, 67, 64, 63, 59, 64, 68, 64, 61, 66, 65, 64, 62, 66, 64.

4. Define mean, median and mode and try to establish the relation that exist between them.

মিন, মিডিয়ান, মোড কাহাকে বলে? তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ কর।

5. What is meant by the central tendency? What are the different measures of central tendencies and what are their uses.

কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলিতে কি বোঝায় ? কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয়ের বিভিন্ন প্রণালী কি এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা কি ?

Answers

1. (a) Median = 31·06, Mean = 30·64
   Mode = 31·90
   (b) Median = 67'50, Mean = 67·06
   Mode = 68·38
   (c) Mean = 26·67
   Median = 26·50, Mode = 26·16.
   (d) Mean = 95·78
   Median = 95·67
   Mode = 95·55
   (2) Mean = 72·88
   Median = 72·00
   Mode = 72·24
   (3) Mean = 62·86
   Median = 64·50
   Mode = 63·78

বিস্তৃতির পরিমাপ (Measuring Variabiliy)

কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা নির্ণয় করলেই স্কোরগুচ্ছের সব বৈশিষ্ট্যগুলি জানা হল না। যেমন ধরা যাক 50 জন ছাত্র ও 50 জন ছাত্রীর ইংরেজী পরীক্ষায় দেখা গেল ছাত্রদলের সবচেয়ে বেশী স্কোর হল 68 আর কম স্কোর হল 20। কিন্তু ছাত্রী দলে সবচেয়ে বেশী স্কোর হল 54 আর সবচেয়ে কম স্কোর হল 36। কিন্তু উভয় দলেরই মিন হল 38·4। দেখা যাচ্ছে দুটি দলের বিস্তৃতির পার্থক্য খুব বেশী। ছাত্র দলে সবচেয়ে বেশী স্কোর 68 আর কম স্কোর 20 অর্থাৎ বিস্তৃতি হল 48; কিন্তু ছাত্রীদলের বিস্তৃতি হল 18। দেখা যাচ্ছে স্কোরগুচ্ছের মিন জানলেই শুধু হবে না; তাদের গড় বিস্তৃতিও জানা দরকার। চার প্রকারে এই বিস্তৃতির পরিমাপ করা হয়।

(১) প্রসার (Range)
(২) চতুর্থক বিচ্যুতি (quartile deviaton)
(৩) গড় বিচ্যুতি (Average deviation)।
(৪) আদর্শ বিচ্যুতি (standard deviation)।

(১) **প্রসার :** প্রসার হল সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্কোরের অন্তরফল।

(২) **চতুর্থক বিচ্যুতি :** ৭৫তম শতক (75th percentile) এবং ২৫তম শতকের (25th percentile) অন্তরের অর্দ্ধেক হল চতুর্থক বিচ্যুতি।

25 তম শতক হল স্কোরগুচ্ছের প্রথম চতুর্থক, এই স্কোরের নীচে থাকবে স্কোরের শতকরা 25 ভাগ। ৭৫তম শতক তৃতীয় চতুর্থকের স্কোর অর্থাৎ এই স্কোরের নিম্নে থাকবে শতকরা 75 ভাগ স্কোর। চতুর্থক বিচ্যুতি আমাদের সিলেবাস বহির্ভূত বলে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হল না।

(৩) গড় বিচ্যুতি (Average deviation): কোন স্কোরগুচ্ছের মিন থেকে প্রত্যেক স্কোরের যে বিচ্যুতি তাকে বলা হয় গড় বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি ধনাত্মক (positive) অথবা ঋণাত্মক (negative) হতে পারে। ধনাত্মক হবে যখন স্কোরটি গড় অপেক্ষা বড় হয় আর ঋণাত্মক হবে যখন স্কোরটি গড় অপেক্ষা ছোট হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—6, 8, 10, 12, 14। সহজেই বোঝা যাচ্ছে এর গড় হবে 10। যখন এই গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরকে বিয়োগ করলে যথাক্রমে 4, 2, 0,—2,—4 হবে। লক্ষ্য কর এই পার্থক্যগুলি যোগ করলে যোগফল হবে, 0। এখন চিহ্ন নিরপেক্ষ ভাবে এগুলিকে যোগ করলে হবে 12। এই 12 কে স্কোর সংখ্যা 5 দিয়ে ভাগ করলে হবে 2·4। ইহাই গড় বিচ্যুতি বা A D।

অতএব **অবিন্যস্ত স্কোরের** গড় বিচ্যুতির সূত্র হল :

$AD = \frac{\Sigma |x|}{N}$ এখানে AD = গড় বিচ্যুতি।

$\Sigma |x|$ = চিহ্ন নিরপেক্ষ ভাবে গড় পার্থক্যগুলির যোগফল। N = স্কোরের সংখ্যা।

কিন্তু স্কোর যখন বিন্যস্ত থাকে তখন এভাবে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় আমরা গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারি না। তাই আমরা শ্রেণী ব্যবধানের

প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দু থেকে গড়ের পার্থক্য নির্ণয় করি। অতএব বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত স্কোরের গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় একমাত্র পার্থক্য হল প্রথমটিতে গড় থেকে শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর পার্থক্য নিতে হয়, দ্বিতীয়টিতে গড় থেকে প্রত্যেক স্কোরের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। স্কোর যখন বিন্যস্ত থাকে তখন গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র হল

$$AD = \frac{\Sigma/fx/}{N}$$

নীচের উদাহরটি দেখ। গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হলে প্রথমে প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু বার কর। তারপর মিন নির্ণয় করতে হবে। তারপর মিন থেকে প্রত্যেক মধ্যবিন্দুর অন্তরফল নির্ণয় করতে হবে। একে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে গুণ করে হল fx তারপর fx কলমে যে সংখ্যা আছে সেগুলিকে চিহ্ন নিরপেক্ষ ভাবে যোগ করতে হবে। তারপর এই যোগফলকে ফ্রিকোয়েন্সী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় বিচ্যুতি পাওয়া যাবে।

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্যবিন্দু ×	f	x	fx
195—199	197	1	26·20	26·20
190—194	192	2	21·20	42·40
185—189	187	4	16·20	64·80
180—184	182	5	11 20	56 00
175—179	177	8	6·20	49·6(
170—174	172	10	1·20	12·00
165—169	167	6	− 3·80	−22·80
160—164	162	4	− 8·80	−35·20
155—159	157	4	−13·80	−55·20
150—154	152	2	−18·80	−37·60
145—149	147	3	−23·80	−71·40
140—144	142	1	−28·80	−28·80
		N=50		502

তালিকা নং—৮

উপরের উদাহরণটিতে মিন=170·80

$$AD = \frac{\Sigma/fx/}{N} = \frac{502{\cdot}00}{50} = 10{\cdot}04$$

AD খুব বড় হলে বুঝতে হবে বণ্টনের বিস্তৃতি খুব বেশী আর AD খুব ছোট হলে বুঝতে হবে প্রসার বা বিস্তৃতি খুব কম।

আদর্শ বিচ্যুতি (Standard deviation)

গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করার সময় আমরা চিহ্নের কোন মূল্য দিই নি। সবগুলিকে ধনাত্মক ধরে নিয়ে যোগ করেছি। আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় এই ক্রটি দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আমরা প্রত্যেকটি গড় পার্থক্যের বর্গ ধরে নিয়ে তারপর যোগ করি। এই যোগফলকে স্কোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে, সব বর্গমূল বার করা হয়। এই বর্গমূলই হল আদর্শ বিচ্যুতি σ (সিগমা)।

অবিন্যস্ত স্কোর থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য নীচের উদাহরণটি নেওয়া হল।

8, 10, 12, 14, 16। মিন $=\frac{60}{5}=12$.

গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের বিচ্যুতি $=-4, -2, 0, 2, 4$,

গড় বিচ্যুতির বর্গ $=16, 4, 0, 4, 16$ বিচ্যুতির যোগফল $=40$

স্কোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে $\frac{40}{5}=8$ হয়। ইহার বর্গমূল $\sqrt{8}=2.83$.

অতএব এই সারির $\sigma=2.83$।

এর থেকে আমরা **অবিন্যস্ত** রাশিমালার আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র পাই।

$$\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}$$ x = গড় বিচ্যুতি N = সংখ্যা

বিন্যস্ত রাশিমালা থেকে σ (সিগমা) নির্ণয়

বিন্যস্ত রাশিমালা থেকে আদর্শ বিচ্যুতি σ নির্ণয়ের তুইটি পদ্ধতি আছে: (১) দীর্ঘ পদ্ধতি (long method) ও (২) হ্রস্ব পদ্ধতি (short method)।

(১) **দীর্ঘ পদ্ধতি**: অবিন্যস্ত স্কোরের যে ভাবে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করা হয়, এতেও তাই, তবে এতে শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু থেকে গড় পার্থক্যকে বর্গ করা হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সী (f) দিয়ে গুণ করা হয় এবং এইভাবে আমরা fx^2 পাই। এই উপায়ে σ নির্ণয়ের সূত্র হল

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}}$$

এখানে fx^2—শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু থেকে গড় পার্থক্যের বর্গ x ফ্রিকোয়েন্সী'র যোগফল। নিম্নের উদাহরণে এই পদ্ধতির বিশ্লেষণ করা হল।

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f	x	fx	fx^2
195—199	197	1	26·20	26·20	68?·44
190—194	192	2	21·20	42·40	898·88
185—189	187	4	16·20	64·80	1049·76
180—184	182	5	11·20	56·00	627·20
175—179	177	8	6·20	49·60	307·52
170—174	172	10	1·20	12·00	14·40
165—169	167	6	−3·80	−22·80	86·64
160—164	162	4	−8·80	−35·20	309·76
155—159	157	4	−13·80	−55·20	761·76
150—154	152	2	−18 80	−37·60	706·88
145—149	147	3	−23 80	−71·40	1696·94
140—144	142	1	−28·80	−28·80	829·44
		N = 50		502·00	7975·62

তালিকা নং—৯

$$\text{এখানে}\ \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N}} = \sqrt{\frac{7975\cdot62}{50}} = 12\cdot63$$

(খ) **বিন্যস্ত স্কোর হইতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে** σ **নির্ণয়।** নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে σ নির্ণয় করা হল। এই উপায়ে σ নির্ণয়ের সূত্র হল

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - c^2} \times i\ (\text{interval})$$

সংক্ষিপ্ত উপায়ে প্রথমে মিন নির্ণয় করতে হবে। এই জন্য প্রথমে যে শ্রেণী ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশী তার মধ্যবিন্দু হবে কল্পিত মিন। এই কল্পিত মিনে 0 ধরে উপরের দিকে 1, 2, 3 এবং নীচের দিকে—1, −2, −3 ইত্যাদি লিখে x' কলম প্রস্তুত করা হল। এবং ফ্রিকোয়েন্সি (f) দিয়ে এই x' কে গুণ করে fx' কলম নির্ণয় করা হল। এবার fx' × x' করে পাওয়া গেল fx'^2

এবার সূত্রানুযায়ী

$$AM = 172{\cdot}00 \qquad \sigma = \sqrt{\left(\frac{\Sigma fx^2}{N} - c^2\right)} \times i$$

$$C = \frac{12}{50} = -{\cdot}240 \qquad = \sqrt{\left(\frac{322}{50} - {\cdot}0576\right)} \times 5 = 12{\cdot}68$$

শ্রেণী ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f	x^1	fx^1	fx^2
195—199	197	1	5	5	25
190—194	192	2	4	8	32
185—189	187	4	3	12	36
180—184	182	5	2	10	20
175—179	177	8	1	8	8
				43	
170—174	172	10	0	0	
165—169	167	6	−1	− 6	6
160—164	162	4	−2	− 8	16
155—159	157	4	−3	−12	36
150—154	152	2	−4	− 8	32
145—149	147	3	−5	−15	75
140—144	142	1	−6	− 6	36
				−55	322

তালিকা নং—১০

সংক্ষিপ্ত উপায়ে অবিন্যস্ত স্কোর হইতে σ নির্ণয়

অবিন্যস্ত স্কোর থেকেও সংক্ষিপ্ত উপায়ে σ নির্ণয় করা যায়। এতে কল্পিত মিন ধরা হয় O। অতএব প্রত্যেকটি স্কোরের গড় পার্থক্য হবে স্কোরগুলিই।

C = প্রকৃত মিন (M)—কল্পিত মিন

অতএব $C = M - O = M$

এবার স্কোরগুলিকে σ স্কোর-সংখ্যা N দিয়ে ভাগ করিলে M পাওয়া যাবে।

এবার σ নির্ণয়ের জন্য আমরা x' অর্থাৎ X কলমের বর্গ নির্ণয় করব, এগুলিকে যোগ করলে পাওয়া যাবে $\Sigma' x^2$ বা $\Sigma X'^2$ একে N দিয়ে ভাগ করে, এর থেকে c^2 বা M^2 বিয়োগ করতে হবে। এই বিয়োগফলের বর্গমূল হবে σ। নিম্নে উদাহরণ দেখ :—

স্কোর x	x' বা (X)	x'^2 বা (X^2)
18	18	324
25	25	625
21	21	441
19	19	361
27	27	729
31	31	961
22	22	484
25	25	625
28	28	784
20	20	400
236	236	5734

তালিকা নং—১১

এখানে AM = 0 $M = \frac{236}{10} = 23{\cdot}6$ $C = 23{\cdot}6 - 0 = 23{\cdot}6$

$c^2 = 556{\cdot}96$ $i = 1$

$\sigma = \sqrt{\left(\frac{5734}{10} - 556{\cdot}96\right)} \times i = \sqrt{16{\cdot}44} = 4{\cdot}06$

σ-র উপর প্রভাব নির্ণয়

(ক) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করে (খ) গুণ করে।

(ক) প্রত্যেকটি স্কোরকে যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে যোগ করা হয় তাহলে σ-র কোন পরিবর্তন হয় না। নিম্নে উদাহরণ দেখ। প্রথমে স্কোরের মিন ছিল 7 এবং σ ছিল 1·41. প্রত্যেকটি স্কোরের সঙ্গে 5 যোগ করার পরও দেখা গেল মিন হয়েছে 12(7 + 5) কিন্তু σ রইল 1·41 অতএব আমরা এর থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা

স্কোরের সঙ্গে যোগ করলে মিন বাড়ে কিন্তু σ ঠিকই থাকে। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা এইভাবে বিয়োগ করলেও দেখা যায় মিন কমেছে কিন্তু σ ঠিক আছে।

আসল স্কোর x	x^1	x^2	স্কোর (x+5)	x^1	x^2
9	2	4	14	2	4
8	1	1	13	1	1
7	0	0	12	0	0
6	−1	1	11	−1	1
5	−2	4	10	2	4

তালিকা নং—১২

$M = \frac{35}{7} = 5 \quad \sigma = \sqrt{\frac{10}{5}} = 1.41$ | $M = \frac{60}{5} = 12 \quad \sigma = \sqrt{\frac{10}{5}} = 1.41$

(খ) যখন প্রত্যেকটি স্কোরকে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তখন কিন্তু σ বেড়ে যায়। নিম্নের উদাহরণ লক্ষ্য কর :—

আসল স্কোর x	x × 10	x′	x'^2
9	90	20	400
8	80	10	100
7	70	0	0
6	60	−10	100
5	50	−20	400

5 | 35
 7

তালিকা নং—১৩

1000

$M = 7 \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1000}{5}} = \sqrt{200} = 14.14 \qquad \sigma = 1.4$

Questions

1. Calculate the σ and A. D for each of the following frequency distribution.

নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনগুলির σ ও A. D নির্ণয় কর।

(a)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
40—41	4
38—39	2
36—37	5
34—35	7
32—33	9
30—31	8
28—29	6
26—27	5
24—25	5
22—23	4
20—21	3

(b)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
80—82	2
77—79	4
74—76	5
71—73	6
68—70	0
65—67	0
62—64	6
59—61	4
56—58	3
53—55	2
50—52	2

(c)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
95—99	1
90—94	2
85—89	4
80—84	5
75—79	8
70—74	10
65—69	6
60—64	4
55—59	4
50—54	2
45—49	3
40—44	1

(d)

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
120—122	2
117—119	2
114—116	2
111—113	4
108—110	5
105—107	9
102—104	6
99—101	3
96— 98	4
93— 95	2
90— 92	1

2. Calculae the mean and and mean deviation of the following frequency distributions :—

মিন ও গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

শ্রেণী ব্যবধান	ফ্রিকোয়েন্সি
120—139	50
100—119	150
80— 99	500
60— 79	250
40— 59	50

3. What are ths different measures of variability? write what you know about them.

বিস্তৃতির বিভিন্ন পরিমাপ কি কি? সেগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

4. Define the average deviation. Describe how you will proceed to determine the average deviation of frequency distributions? Enùmerate its defects.

গড় বিচ্যুতি কাহাকে বলে? পরিসংখ্যা বিভাজনের গড় বিচ্যুতি কিরূপে নির্ণয় করিবে? ইহার ত্রুটিগুলি বিবৃত কর।

5. What is meant by standard deviation? Mention how you will proceed to determine the standard deviation of a given data.

আদর্শ বিচ্যুতি বলিতে কি বোঝায়? কিরূপে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করিবে বর্ণনা কর।

Answers :—

1. (a) $\sigma = 5·50$ A.D $= 4·455$ (b) $\sigma = 9.06$ AD $= 8·29$
   (c) $\sigma = 12·63$ AD $= 10·04$ (n) (d) $\sigma = 7·23$ AD $= 5·55$
2. Mean $= 91·5$ AD $= 12·8$

সহপরিবর্ত্তন (Correlation)

আমরা এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বা কোন দলের কোন একটি বিশেষ গুণ বা শক্তির আলোচনা করেছি। কিন্তু অনেক সময় একটি কার্য্যদক্ষতার সঙ্গে অপর কার্য্যদক্ষতার তুলনা করার দরকার হয়। দুইটি গুণেই ব্যক্তির কতদূর কৃতিত্ব আমরা জানতে চাই। একটি বিষয়ে যে ব্যক্তি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে অপর বিষয়েও তার কৃতিত্ব সমান কিনা আমরা জানবার চেষ্টা করি। এইভাবে দুটি গুণের মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা এবং থাকলে তা কতটা তাও আমরা পরিমাপ করি। বুদ্ধিমান ছেলেরা বোকাদের চেয়ে কম মানসিক বিকার গ্রস্থ হয় কিনা, যে অঙ্ক ভাল পারে সে সাহিত্যে ভাল কিনা, যে ইংরেজী ভাল পারে, সে বাংলাতে কিরকম ইত্যাদি জানতে হলে আমাদের দুটি গুণের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপন করতে চেষ্টা করতে হবে। এই রকম দুটি গুণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ করাকে বলে সহপরিবর্ত্তন (Correlation)

মনে কর ১০০টি ছেলের দুটি যোগ্যতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি দেখা যায় দুটি পরীক্ষাতেই সব ছেলেরা একরকম করেছে অর্থাৎ যে ছেলে একটাতে প্রথম সে অপরটিতেও প্রথম হয়েছে, যে দ্বিতীয় হয়েছে সে দুবারই দ্বিতীয় হয়েছে ইত্যাদি, তাহলে আমরা বলব সহপরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ 1·00।

আবার যদি ঠিক এর উল্টোটি হয় অর্থাৎ যে একটিতে প্রথম হয়েছে সে অপরটিতে সবচেয়ে খারাপ করেছে ইত্যাদি তাহলে সহপরিবর্ত্তন হবে—1·00

সহপরিবর্ত্তন + 1·00 থেকে—1·00 পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 0· থেকে 1·00 পর্য্যন্ত সহপরিবর্ত্তন হল ধনাত্মক এবং 0 থেকে—1·00 সহপরিবর্ত্তন হল ঋণাত্মক। মনে করো ১০টি ছেলের বুদ্ধি ও স্মৃতির পরীক্ষা করা হল। তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল।

ছাত্র :—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
স্মৃতির স্কোর	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
বুদ্ধির স্কোর	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছেলের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী তার স্মৃতিও সব চেয়ে বেশী। আবার যার বুদ্ধি সবচেয়ে কম তার স্মৃতিও সবচেয়ে কম। এখানে সহপরিবর্ত্তন = 1·00

আবার আর দশটি ছেলের স্মৃতি ও বুদ্ধির পরীক্ষা করে নিম্নরূপ ফল পাওয়া গেল :—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
স্মৃতির স্কোর	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
বুদ্ধির স্কোর	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22

এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতির পরীক্ষা সব চেয়ে বেশী পেয়েছে (21) সে বুদ্ধির পরীক্ষায় সব চেয়ে কম পেয়েছে (22)। এবং যে ছেলে বুদ্ধির পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী পেয়েছে, সে স্মৃতির পরীক্ষায় সব চেয়ে কম পেয়েছে। অর্থাৎ এই স্কোরগুলির পরিবর্ত্তন বিপরীত মুখী কিন্তু নিখুঁত, এখানে সহপরিবর্ত্তন হল—1·00.

সহপরিবর্ত্তনের এর মানকে (Coeficient of Correlation) r অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। r নির্ণয়ের উৎকৃষ্ট ও প্রচলিত পদ্ধতি হল প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product moment method)। আর একটি পদ্ধতিকে বলে সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank difference method)।

সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank difference method)

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণের পার্থক্য আমরা সাধারণতঃ সারি দ্বারা প্রকাশ করি। সততা, সামাজিকতা, আবেগ প্রবণতা ইত্যাদির মান নির্ণয়ের সময় আমরা ব্যক্তির স্কোরগুলিকে ক্রমানুযায়ী সাজাই। গুণানুসারে ব্যক্তির এই প্রকারে সারি বিন্যাস করা হয় এবং সহপরিবর্ত্তন নির্ণয় করা হয়। নিম্নের উদাহরণে এই সহপরিবর্ত্তন নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করা হল।

ছাত্র	বুদ্ধির পরীক্ষা		স্মৃতির পরীক্ষা		দুই সারির পার্থক্য	সারি পার্থক্যের বর্গ
	স্কোর	সারি	স্কোর	সারি	D	D^2
ক	64	4	56	2	2	4
খ	72	2	52	3	−1	1
গ	56	6	48	6	0	0
ঘ	52	7	46	7	0	0
ঙ	60	5	49	5	0	0
চ	68	3	50	4	−1	1
ছ	76	1	60	1	0	0
						6

তালিকা নং—১৪

সূত্রানুযায়ী Correlation $\rho = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$

$$= 1 - \frac{6 \times 6}{7(49-1)} = 1 - \frac{36}{336} = 1 - \cdot 11 = \cdot 89$$

দেখা যাচ্ছে এখানে সহপরিবর্তন খুব বেশী। এর অর্থ এই যে ছেলের বুদ্ধি বেশী সাধারণতঃ তার স্মৃতি শক্তিও বেশী।

নিম্নে আর একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

ছাত্র	অঙ্কের শতকরা নম্বর	বিজ্ঞানের শতকরা নম্বর	অঙ্কের সারি	বিজ্ঞানের সারি	সারি পার্থক্য D	সারি পার্থক্যের বর্গ D^2
ক	64	52	4	4	0	0
খ	72	58	3	3	0	0
গ	56	48	6	6	0	0
ঘ	52	50	7	5	2	4
ঙ	60	47	5	7	−2	4
চ	45	40	8·5	10	−1·5	2·25
ছ	88	64	1	1	0	0
জ	75	60	2	2	0	0
ঝ	45	42	8·5	8	·5	·25
ঞ	40	41	10	9	1	1
						11·5

তালিকা নং—১৫

$$\sigma = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)} = 1 - \frac{6 \times 11 \cdot 5}{10(100 - 1)} = 1 - \cdot 07 = \cdot 93$$

উপরের উদাহরণে দেখ অঙ্কে দু'জন ছেলে একই নম্বর (45) পেয়েছে, এক্ষেত্রে সারি বিন্যাস করলে দুজনের সারি হবে 8·5। অর্থাৎ 8 ও 9 এর মধ্য বিন্দু। এবং 45এর কম যে পেয়েছে তার সারি হবে 10.

এই ভাবে যদি একই নম্বর 3 জন ছেলে পায় তা হলে তখন তাদের প্রত্যেকের সারি হবে তিনটি সারির মধ্য বিন্দু। যেমন ধর কোন ছাত্র দলের তিন জনের নম্বরের সারি হচ্ছে 7. এখানে 7, 8, 9 এই তিনটি সারির মধ্য বিন্দু 8 হবে প্রত্যেকটী ছেলের সারি। অর্থাৎ এই দলে 7 সারি এবং 9 সারিতে কোন ছেলে থাকবে না। 6 সারির পর হবে 8 সারি, তারপর হবে 10 সারি।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is meant by the correlation and co-efficient of correlation ? সহপরিবর্তন ও সহপরিবর্তনের ফল বলিতে কি বোঝায় ?

2. Calculate the co-efficient of correlation for each of the following. নিম্নের প্রত্যেকটির সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় কর।

(a)

Subjects	Height in inches	Weight in pounds
1	70	102
2	69	97
3	62	94
4	67	90
5	60	82
6	65	78
7	59	81
8	62	94
9	67	98
10	64	89

(b)

'Subjects	Intelligence test scores	Cancellation test score
1	185	110
2	203	98
3	188	118
4	195	104
5	176	112
6	174	124
7	158	119
8	197	95
9	176	94
10	138	97
11	126	110
12	160	94
13	151	126
14	185	120
15	185	118

Answers

9. (a) $\rho = \cdot 66$-

$\rho = -1 \cdot 7$.

একাদশ অধ্যায়

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

(Methods of Psychology)

বিজ্ঞানের কাজ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা সত্যকে আবিষ্কার করা। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক নানাবিধ পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্য নেন। বহু তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করেন, পরীক্ষা করেন। সত্যতা যাচাই করে তবে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মনোবিজ্ঞান ও অন্য বিজ্ঞানের মত বস্তু নির্ভর বিজ্ঞান। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সূত্র আবিষ্কার করা এর কাজ। তাই মনোবিজ্ঞানীকেও মন জানার জন্যে বহু পরীক্ষা করতে হয়। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বর্হিজগতে বিদ্যমান। তাই সেগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক খুব সহজেই পরীক্ষা করতে পারেন। বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল মন। এ মনকে দেখা যায় না; মানুষের ব্যবহার দেখে এ মনকে বুঝে নিতে হয়। কিন্তু মনের আবার নিজস্ব অনুভূতিও আছে; নিজের মনের অবস্থা, গতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ সচেতন থাকে। তাই মনোবিজ্ঞানে দুইপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :—(১) ব্যক্তি নির্ভর পদ্ধতি (Subjective method). ও (২) নৈর্বক্তিক পদ্ধতি (Objective Method)।

১। ব্যক্তি নির্ভর পদ্ধতি (Subjective Method)

অন্তর্দর্শন (Introspection) :—অন্তর্দর্শনে মানুষ নিজে অন্তরকে দর্শন করে। ব্যক্তির মনের মধ্যে যেসব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা হয় অন্তর্দর্শনের সাহায্যে তা জানা যায়। আমার রাগ হয়েছে, রাগের সময় মনের মধ্যে যে অনুভূতি হচ্ছে তা একমাত্র আমিই বলতে পারি, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে এই অনুভূতির খবর জানা যায় না। কারণ আমার মনোভাব শুধু আমিই জানি, অন্য কারোও পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

অন্তর্দর্শনে মন একাধারে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, অর্থাৎ মন নিজেই জানতে চায়

আবার জানার বিষয়ও সে নিজে। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে মানুষ নিজেই নিজেকে পাঠ করে।

অন্তর্দর্শনে মনকে একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করে মন জানার চেষ্টা করতে হয়। তাই এর জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও দরকার হয় না। উপরন্তু জোর করে ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ করে নিজের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করলে তবে অন্তদর্শন হয়।

মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন মানে কষ্ট করে মনোনিবেশ নয়, নিজের ক্রিয়া কলাপের ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন হয় না। অন্তর্দর্শন হল শুধু মনকে পর্য্যবেক্ষণ করা।

অন্তর্দর্শন মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি। অন্য কোন বিজ্ঞানে অন্তর্দর্শনের সাহায্য নেওয়া হয় না। কিন্তু মনকে জানা খুব কঠিন কাজ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সর্ব্বদাই আমরা নিজেকে জানার চেষ্টা করি। নিজেকে প্রকাশ করি। যখন বলি আমি ক্ষুধার্ত্ত বা আমার মাথা ধরেছে, আমার দুঃখ হয়েছে, বা আনন্দ হয়েছে তখন প্রকৃতপক্ষে আমার মনের অনুভূতির কথাই বলি। কিন্তু এ অন্তর্দর্শন শিক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত নয়, এলোমেলো। মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শনের জন্য কিছু অভ্যাস ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। পরীক্ষণের সময় মনকে অন্তরের গভীরে নিবিষ্ট করে, সেই সময়ের ভাবনা চিন্তা অনুভূতিগুলিকে লক্ষ্য করে প্রকাশ করাই হল অন্তর্দর্শন।

অন্তর্দর্শনের কতকগুলি অসুবিধা আছে। অনেকে অন্তর্দর্শনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তাঁরা এর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলি নীচে দেওয়া হল :—

(১) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে সব চেয়ে জোরালো আক্রমণ এল ব্যবহারবাদীদের দিক থেকে। তাঁদের মতে মন, চেতনা বলতে কিছুই নেই, আছে শুধু মানুষের ব্যবহার। এইজন্য অন্তর্দর্শনকে তাঁরা সোজাসুজি অস্বীকার করলেন। তাঁরা বললেন জীবজন্তুর ব্যবহার দেখেই আমরা তাঁদের বিচার করি, তাদের মনে কি হচ্ছে জানার চেষ্টা করি না।

(২) দার্শনিক কাঁৎ আর একদিক থেকে এর বিরুদ্ধে আঘাত হানলেন। তিনি বললেন, অন্তর্দর্শনে যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞেয়। অর্থাৎ যে জানতে চায়, সেই হল জানার বিষয়। তিনি বললেন এ কি করে সম্ভব? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হওয়া অসম্ভব, তাই অন্তর্দর্শনও অসম্ভব।

(৩) অন্তর্দর্শনের আর একটি ত্রুটি হল পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশ। এই কৃত্রিমতার মধ্যে মনকে জানা সম্পূর্ণ হয় না।

(৪) পরীক্ষাগারে পরীক্ষণের সময় একই সঙ্গে পরীক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং মনের গভীরে মনোনিবেশ করা অসম্ভব। একসঙ্গে দুটি বিষয়ে আমরা মন দিতে পারি না। তাই অন্তর্দর্শনের সাহায্যে পরীক্ষণের যে ফলাফল পাওয়া যায়, তাতে ত্রুটি থেকে যায়।

(৫) মন সদা চঞ্চল, প্রতি নিয়ত তার চিন্তা প্রবাহ ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। চলমান কোনো জিনিষে মন দেওয়া সম্ভব কি?

(৬) পরীক্ষণের সময় অন্তর্দর্শন করলে পরীক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্হিত হতে পারে। যেমন রাগের সময় মনের অবস্থা কি হচ্ছে জানতে চাইলে রাগ চলে যেতে পারে।

(৭) পরীক্ষণের সময় আমরা যখন প্রত্যক্ষণ করি তখন যদি মনের অবস্থা কি হচ্ছে জানবার চেষ্টা করি তাহলে প্রত্যক্ষণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

(৮) অন্তর্দর্শনে ব্যক্তির নিজের প্রভাবও কম নয়। ইচ্ছা থাকলে মনের কথা নাও প্রকাশ করতে পারি, পরিবর্তে বানিয়ে অন্য কথাও বলতে পারি। এইজন্য অন্তর্দর্শনের তথ্য নির্ভুল হয় না।

(৯) প্রত্যক্ষণের সময় অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, কারণ ঘটনা ঘটে যাবার পর আমরা মনের ভাব লক্ষ্য করতে পারি। তাই অন্তর্দর্শনে স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়।

(১০) প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মত অন্তর্দর্শন স্পষ্ট নয়। তাই এই সময় ব্যক্তি অনুমান ও কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

(১১) শিশু ও অশিক্ষিতদের অন্তর্দর্শন হয় না। অন্তর্দর্শনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।

(১২) আমাদের মন হল বর্হিমুখী, এই বর্হিমুখী মনকে আত্মস্থ করা খুবই কঠিন কাজ।

(১৩) অন্তর্দর্শনের সাহায্যে মনকে জানা খুব সহজ নয়। কারণ মানসিক ক্রিয়া অস্পষ্ট এবং আবছা। প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর মত মনকে স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

(১৪) দুজন পরীক্ষকের পক্ষে একই পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য এরূপ হয়।

অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে বহু মতবাদ থাকলেও এর সপক্ষেও কম যুক্তি নেই। সপক্ষের যুক্তিগুলি নীচে দেওয়া হল।

(১) মনকে জানতে হলে শুধু তার ব্যবহারটা জানলে হয় না। প্রতিনিয়ত আমরা নিজেকে প্রকাশ করে থাকি। শুধু মনোবিদ নয়, ডাক্তারেও রোগীর কথা শুনে থাকেন। নিজের মনে কি হচ্ছে আমি নিজে ছাড়া কেউ বলতে পারেনা। অতএব মনের খবর জানার জন্য অন্তর্দর্শনের প্রয়োজন আছে।

(২) মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করতে গেলে মনের রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি অন্তর্হিত হয় একথা ভুল। ক্ষুধার সময় মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলে ক্ষুধা অন্তর্হিত হয় কি?

(৩) মানসিক অবস্থার যদি নিখুঁত বিবরণ দিতে বলা হয় তাহলে হয়ত অন্তর্দ্রষ্টার পক্ষে খুব কঠিন হতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে মনের অবস্থা বলা কঠিন নয়।

অন্তর্দর্শনের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, অন্তর্দর্শন না হলে মনকে জানা সম্ভবই নয়। ব্যক্তি অতিরঞ্জিত খবর দিতে পারে আবার মনের সব কথা প্রকাশ নাও করতে পারে, তার জন্যে অন্য পরীক্ষাও করা দরকার। মনোবিদগণ সকলেই অন্তর্দর্শনের ত্রুটি স্বীকার করেছেন। তবুও তাঁরা বলেন অন্তর্দর্শনকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিনা। এই জন্যে যদি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ প্রভৃতি অন্যান্য পদ্ধতিও গ্রহণ করি তাহলে মনকে নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হবে।

২। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (Objective Method)

(ক) **পর্য্যবেক্ষণ** (Observation):—ব্যক্তির বাইরের আচরণ লক্ষ্য করাকেই বলে পর্যবেক্ষণ। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই এরূপ পর্য্যবেক্ষণ সংঘটিত হয়। কাউকে হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে দেখলে আমরা বুঝতে পারি সে রাগ করেছে। কেউ প্রাণপনে ছুটে আসছে এবং তার চোখ মুখের চেহারা বিপন্ন হয়েছে দেখলে বুঝতে পারি সে ভয় পেয়েছে। এইভাবে পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব হয় অন্তর্দর্শনের জন্য। আমি পূর্ব্বে রাগ করেছিলাম, তাই আমি জানি রাগ করলে বাইরের ব্যবহার কেমন হয়। তাই সেইরূপ

ব্যবহার দেখলেই বুঝতে পারি তার মনে কি হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পর্যবেক্ষণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করে।

পর্যবেক্ষণের সময় আমরা ব্যক্তির ব্যবহার দেখে তার মনের ভাবটা কল্পনা করে নিই। অনুমান বা কল্পনা আমাদের পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। ব্যক্তির ব্যবহার সব সময় পর্যবেক্ষণকারীর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নাও মিলতে পারে। তখন পর্য্যবেক্ষণকারী খানিকটা অনুমান করে নেন।

যে সমস্ত বাহ্যিক ব্যবহার দেখে আমরা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অনুমান করি সেগুলি নিম্নরূপ। কোন ঘটনার সময় ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি চোখ মুখের ভাব, ঘন ঘন শ্বাস অথবা শ্বাসরোধ, কথা বার্তার ধরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করে আমরা কোন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করতে পারি। লাল চোখ মুখ, দ্রুত শ্বাস, মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রভৃতি দেখলে বুঝি ক্রুদ্ধ হয়েছে। আবার চোখের কোণে জল, ফোঁপানি প্রভৃতি দেখলে বুঝি কাঁদছে, অতএব দুঃখ পেয়েছে। আবার ব্যক্তির মনোভাব তার শিল্পে সাহিত্যে তার কাজের মধ্যে ফুটে উঠতে পারে। সামাজিক ব্যবহার, সৌজন্যপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহার, বিনীত ও নম্রমুখ অথবা কর্কশ রূঢ় ব্যবহার, কড়া কথা ইত্যাদি লক্ষ্য করে বুঝতে পারি উক্ত ব্যক্তি কি ধরনের মানুষ।

পর্য্যবেক্ষণও কিন্তু ত্রুটি শূন্য নয়। এর প্রধান অসুবিধা হল পর্য্যবেক্ষণ কারী নিজের মনোভাব অনুসারে ব্যক্তির ব্যবহারের বিচার করে। এই বিচার ভ্রান্ত হতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য যত বেশী হবে এই বিচারও তত ভুল হবে।

যে ব্যক্তির আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করছি তার প্রতি পর্য্যবেক্ষণকারীর মনোভাব যদি বিরূপ থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত পোষণ করতে পারি না। আবার আমরা যাকে ভালবাসি তার ত্রুটি সহজেই চোখ এড়িয়ে যায়। কথায় আছে যারে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা।

পর্য্যবেক্ষণের আর একটি অসুবিধা হল এই যে এর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। কোন ব্যক্তির রাগ আছে কিনা জানতে হলে সে কবে রাগ করবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

পর্য্যবেক্ষণের সময় ব্যক্তি তার মনোভাবকে সুকৌশলে গোপন রাখতেও পারে। অতএব তার ব্যবহার দেখে তার মনকে জানা ভুল হতে পারে।

তোমাকে মিষ্ট কথায়, মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করার সময় হয়ত সে মনের মধ্যে ছুরিতে শান দিচ্ছে।

ব্যক্তির আচরণ প্রত্যক্ষ করছি। বিভিন্ন কারণে ব্যক্তি একই আচরণ করে থাকে। দৈহিক আচরণ দেখে মনোভাব বুঝে নেওয়া খুব সহজ নয়। কোন ব্যক্তি হয়ত গম্ভীর হয়ে আছে। বিশেষ কথা বলছে না। তার গাম্ভীর্যের কারণ সে না ব্যক্ত করলে জানা সম্ভব কি? অন্যের ওপর মনে মনে রাগ করে গম্ভীর হতে পারে, দূরে কোন প্রিয়জন আছে, তার অমঙ্গল চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হতে পারে; আবার পার্থিব জীবনে বৈরাগ্য বশতঃ হয়ত সে চুপচাপ থাকতে পারে। আচরণ দেখে তাই সব সময় ব্যক্তির মনোভাব বোঝা যায় না; কারণ আচরণ সুনির্দ্দিষ্ট নয়।

মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ দুই প্রকার পদ্ধতিরই প্রয়োজন আছে। উভয়েরই ত্রুটি আছে। কিন্তু একটি আর একটির অনুপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্তর্দর্শন ছাড়া পর্যবেক্ষণ হয় না আবার শুধু পর্য্যবেক্ষণ করলে ত্রুটি থাকতে পারে। তাই পর্য্যবেক্ষণের সময় ব্যক্তির অন্তর্দর্শন থেকেও তার মনোভাবের কিছু জানা যেতে পারে।

এখানে মনে রাখতে হবে শিশু, বিকৃত মস্তিষ্ক এবং পশুদের অন্তর্দর্শন হয় না, তাদের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করেই আমরা তাদের সম্বন্ধে ধারণা করে থাকি।

অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মনকেই শুধু জানা যায়। কিন্তু অন্যের মনকে জানতে হলে পর্য্যবেক্ষণ ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ করে সমাজ মনকে জানতে হলে, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে সুনিপুণ পর্য্যবেক্ষণকারী পর্য্যবেক্ষণের ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারে। কোন ব্যক্তির হয়ত মুখে হাসি আছে কিন্তু বেদনায় অন্তর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। পর্য্যবেক্ষণকারী তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম অপক্ষপাত দৃষ্টিদ্বারা সেই অন্তরকে দেখে ফেলতে পারেন। পর্য্যবেক্ষণ মাত্র একবারে সম্পূর্ণ হয় না, বারবার পর্য্যবেক্ষণ করে তবে মানুষের সম্বন্ধে অভিমত দেওয়া সম্ভব। যাকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি তার ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখলেই পর্য্যবেক্ষণকারী বুঝে নেবে এই ব্যতিক্রমের কারণ। অতএব দেখা যাচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োজন আছে মনোবিজ্ঞানে।

(খ) **পরীক্ষণ** (Experimental Method) :—বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মনোবিজ্ঞানেও এই প্রকার পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে অন্তদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কোন পদ্ধতিই ত্রুটিশূন্য নয় এবং একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে মনোবিজ্ঞানে চলে না।

পরীক্ষণ পদ্ধতির জন্য পরীক্ষাগারের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগারে আমরা যে মানসিক ক্রিয়াকে পরীক্ষা করতে চাইছি সেটিকে উদ্দিপ্ত করার জন্য কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করতে হয়। যেমন ভয় পেলে মানসিক অবস্থা কিরকম হবে জানা দরকার। ফলে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম ভয়ের সৃষ্টি করতে হয় এবং ভয়ের সময় অভীক্ষার্থীর চোখ মুখের ভাব, নাড়ির গতি, বুকের স্পন্দন, রক্তের চাপ প্রভৃতি নেওয়া হয়।

পুনরাবৃত্তি (Repeatation) :—পরীক্ষণের একটি সুবিধা এই যে বার বার এই পরীক্ষা করা যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিলনে জল তৈরী হয় এ পরীক্ষাটি বার বার করা যায়। সেইরূপ মনোবিজ্ঞানে আবৃত্তি পাঠের সহায়তা করে এই পরীক্ষা করার জন্য দুই দল ছাত্র নেওয়া হ'ল। একদল ছাত্র আবৃত্তি করে শিখল, আর একদল আবৃত্তি না করে শিখল। দেখা গেল যে দল আবৃত্তি করে শিখেছে তারাই ভাল শিখেছে। অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে আবৃত্তি করে পাঠ করলে অনেকদিন মনে থাকে। এই পরীক্ষাটি বার বার করা যায়। ফলাফল সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করতে পারি। অতএব পরীক্ষণ পুনরাবৃত্তির দ্বারা আমরা পরীক্ষাটির নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হই।

একই পরীক্ষা দুজন ব্যক্তির দ্বারা করা যেতে পারে। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী দুজনেই এই পরীক্ষাটি করতে পারেন এবং দুজনেই পরীক্ষার ফলাফল দেখে একমত হতে পরেন। বিভিন্ন পরীক্ষকের ঐক্যমত এই পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি বিশেষ সুবিধা।

পরীক্ষণে কোন কোন মানসক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়। যেমন মনে কর ক্যাফিনের দ্বারা বুদ্ধি প্রভাবিত হয় কিনা পরীক্ষা করা দরকার। পরীক্ষার জন্য দুদল অভিক্ষার্থী নেওয়া হ'ল। এক দলকে ক্যাফিনের বড়ি খাওয়ান হ'ল। অন্য দলকেও অনুরূপ দেখতে বড়ি (Plaubos) দেওয়া হ'ল কিন্তু ঐ বড়িতে ক্যাফিন ছিল না। পাছে অভিক্ষার্থীর মন প্রভাবিত হয়

এই জন্ম দুই দলকেই বড়ি খাওয়ান হ'ল। ক্যাফিনশূন্য বড়ি (Plaubos) যে দলটিকে দেওয়া হল তাদের বলে নিয়ন্ত্রিত দল (Control group)। ক্ষেত্র অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন আমরা বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে চাই আমরা এ ক্ষেত্রে যমজ সন্তান সংগ্রহ করে বংশগতির প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তারপর বিভিন্ন পরিবেশে যমজ দুটিকে রেখে পরীক্ষা করে জানতে পারি পরিবেশের প্রভাব কতখানি।

মানসিক ক্রিয়া একটি নয়। মনের ভাব অজস্র এবং মনের ভাব একটি আর একটির সঙ্গে জড়িত থাকে। এইজন্য কোন একটি বিশেষ মনের ভাব বা অনুভূতিকে পরীক্ষা করতে হলে নিয়ন্ত্রিত অবস্থার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মত মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায়ও দুরকমের **চল** (Variable) ব্যবহৃত হয়। আমরা যে অবস্থাগুলোর ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারি তাদের বলা হয় **স্বাধীন চল** (Independent variable)। আর উল্লিখিত ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপর যে ঘটনাগুলি নির্ভরশীল তাদের বলা হয় **অধীন চল** (Dependent variable)। ধর স্মৃতির উপর মনোযোগের প্রভাব নির্ণয় করতে চাইছ। এখানে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীকে মুখস্থ করান হবে। এখানে মনোযোগ স্বাধীন চল আর স্মৃতি হল অধীন চল। স্বাধীন চলের পরিবর্ত্তন করলে দেখা যাবে অধীন চলেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। ধর কোন নির্জ্জন পরিবেশে একান্ত নিবিষ্ট মনে তোমাকে কোন একটি বিষয় মুখস্থ করতে দেওয়া হল, এবং তোমার স্মৃতির পরিমাপ করা হল। এরপর ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা হল, এবং স্মৃতির পরীক্ষাও নেওয়া হল। দেখা গেল এবার অনুরূপ বিষয়টি মুখস্থ করতে দেরী হচ্ছে। এইভাবে বহুবার বহুজনের উপর পরীক্ষা করে পরীক্ষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, মনোযোগ স্মৃতিকে প্রভাবিত করে।

ক্যাফিনের পরীক্ষায় ক্যাফিন হল স্বাধীন চল। কারণ আমরা এই পরীক্ষায় ক্যাফিনের পরিমাণ ইচ্ছামত বাড়াতে পারি। অপরদিকে এই পরীক্ষায় বুদ্ধি হল অধীন চল। কারণ আমরা জানতে চাই ক্যাফিনের মাত্রা বৃদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি প্রভাবিত হয় কিনা।

লেখচিত্রে ফলাফল উপস্থাপন করার সময় অনুভূমিক রেখাটিতে (X

axis) স্বাধীন চল দেখান হয় এবং অক্ষ রেখাটিতে (Y axis) দেখানো হয় অধীন চল।

মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষাগারে দুজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। একজন পরীক্ষা করেন (Experimenter) অপর জনকে পরীক্ষা করা হয় (subject)।

প্রত্যেক পদ্ধতির মত পরীক্ষনেরও সুবিধা অসুবিধা আছে। এর সব চেয়ে বড় ত্রুটি হল পরীক্ষাগারের কৃত্রিম অবস্থা। মনের ক্রিয়াকলাপ অতি জটিল ও সূক্ষ্ম। পরিবেশের জন্য মন সহজেই অন্যদিকে ধাবিত হতে পারে। ফলে অভীক্ষার্থীর ব্যবহারও কৃত্রিম হতে পারে।

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পূর্ব অনুসৃত অবস্থার একটিকে পরিবর্ত্তন করে মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি মন অতি জটিল, তাই মনের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা সন্দেহ। মনকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য একজনের উপর পরীক্ষা করলে ঠিক ফল পাওয়া যায় না। সেইজন্য বহুজনের উপর পরীক্ষা হয়।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্য পরীক্ষক সব সময় অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি ও করতে পারেন না। ভীরু স্বভাব যার, ভয়ের জিনিষ দেখলে সহজেই আঁতকে উঠবে ; কিন্তু ধীর মস্তিষ্ক সম্পন্ন এবং সাহসী ব্যক্তি এই কৃত্রিম ভয়ে সাড়া দিবে না। তাছাড়া ইচ্ছে করলেই সব অবস্থার সৃষ্টি করা যায় না। হাসতে বললে হাসা, এবং কাঁদতে বললেই কাঁদা সম্ভব কি ? তারপর মনের বৃদ্ধি (growth) ইত্যাদি পরীক্ষা করার অনেক অসুবিধা।

পরীক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকতে পারে। ফলে পরীক্ষণ নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল এই যে যখন খুসী একে ব্যবহার করা যায় না। পদার্থবিদ, রসায়নবিদ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, কারণ আলো, শব্দ, রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি পরীক্ষণের সময় কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু মানুষ বা জীবজন্তুকে নিয়ে পরীক্ষা এত সহজ নয়। তারা সব সময় আমাদের পরীক্ষায় সহযোগিতা করে না। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল বুদ্ধিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত

করে জানতে হলে মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু কোন জীবিত ব্যক্তি কি তার মস্তিষ্কের কিছু অংশ সরিয়ে দিয়ে এই রকম পরীক্ষা করতে সম্মত হবে?

কখনও কখনও পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার সময় আমরা যে বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করছি সেটিই বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন ব্যক্তি জোর শব্দে কিরূপে ক্লান্ত হয় পরীক্ষা করতে চাই। পরীক্ষাগারে ব্যক্তির কাছে বিকট শব্দ করা সুরু হ'ল। পরীক্ষক যত রকম উপায়ে সম্ভব পরীক্ষা করে দেখল কিছুতেই ব্যক্তি ক্লান্ত হচ্ছে না। এর কারণ হল ব্যক্তি যখন সচেতন থাকে যে তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তখন সে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করে ভাল ফল করতে। ধর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সে ঠিক তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না অর্থাৎ পরীক্ষার সময় সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে তার ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করে ফুটিয়ে তুলতে।

পরীক্ষণের এই সমস্ত ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে দেখা যায় অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে পরীক্ষণের সুবিধাই বেশী। পরীক্ষণে অবস্থা আয়ত্তাধীন থাকার জন্য পরীক্ষক যখন খুশী পরীক্ষা করতে পারেন। এই পরিবর্তন তিনি নিজে করেন বলে কি পরিবর্তন করেছেন সে সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে এই সুবিধাগুলি থাকে না।

তাছাড়া আজকাল মনোবিজ্ঞানে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টিরও চেষ্টা চলছে। যেমন কোন ব্যক্তির সামাজিকতা গুণ পরীক্ষা করার জন্য তাকে কতগুলি লোকের সঙ্গে রাখা হয়। বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তিকে রাখা হয়।

এই পরীক্ষণে ইচ্ছামত অবস্থার সৃষ্টি করা যায় আর যতটুকু প্রয়োজন, তত টুকুই মানসিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়; অন্য অবস্থাগুলিকে ধরা হয় না। বহুবার পরীক্ষা করলে ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রভাব দূর করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানী উণ্ড (wound) পরীক্ষাগারে প্রথম এই পরীক্ষা করেছিলেন। আজ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) এই পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজেই ব্যস্ত।

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা ব্যক্তি মনের গুণ অবস্থা, অনুভূতি ইত্যাদি

পরিমাপ করি। পরীক্ষণের পর ফলাফল নির্ণয় করে মন্তব্য প্রকাশ করি। এর জন্য আমরা পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতি ছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানে গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন—ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতি, কেস হিস্ট্রি (Case History), ক্রম বিকাশ পদ্ধতি (develop mental method), প্রভৃতি। এইসব পদ্ধতিগুলি সিলেবাস বহির্ভূত বলে এখানে আলোচনা করা হল না।

Questions

1. Discuss in brief the chief methods followed in Psychology. Is it possible to accept any one of them ?

১। মনোবিজ্ঞানের তিনটি পদ্ধতির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। সেগুলির মধ্যে মাত্র একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় কি ?

2. What are the methods of studying mental events. Do you think any of these methods sufficient for a scientific study of mind ?

২। মানসিক ঘটনাকে জানার জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করবে ? এই পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটিই কি মানসিক ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথে যথেষ্ট ?

3. Has Psychology any special method of its own ? In this connection mention also the other methods necessary for Psychological enquiry.

৩। মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব কোন পদ্ধতি আছে কি ? এই প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা কর।

4. Is introrspection Possible ? Fully discuss the question. This science Psychology has a method of its own. Discuss the statement. What are the charges against this method.

৪। অন্তর্দর্শন সম্ভব কিনা বিশদভাবে আলোচনা কর। 'মনোবিজ্ঞানের

একটি নিজস্ব পদ্ধতি আছে।' এই উক্তির আলোচনা কর।—এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি কি ?

5. What are the differences between the methods in Psychology and those in general science ?

৫। মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে বিজ্ঞানের পদ্ধতির পার্থক্য কি ?

6. Discuss the merits and demerits of experimental methods.

৬। পরীক্ষণ পদ্ধতির গুণাগুণও ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর।

7. Write short notes on :—

(a) Introspection. (b) methods of Psychology. (c) Objective methods. (e) Subjective method.

৭। সংক্ষেপে টীকা লিখ :—(ক) অন্তর্দর্শন, (খ) মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি, (গ) নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি, (ঘ) ব্যক্তি নির্ভর পদ্ধতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

জন্মের পর শিশুর বর্দ্ধন ও বিকাশ

(Development of Child after birth)

শিশুর বর্দ্ধন ও বিকাশের আলোচনা করতে হলে একেবারে জীবনের সূচনা থেকে আলোচনা করা দরকার। মাতৃগর্ভে জন্মের সূচনা থেকে শিশু জীবনের বর্দ্ধন ও বিকাশ সুরু হয়। শিশুর বর্দ্ধনের ধারাকে দুইভাগে ভাগ করা যায় (ক) জন্মপূর্ব্ব (খ) জন্মের পরবর্তী।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসে বর্দ্ধন আমরা কাকে বলব? বর্দ্ধন হল পরিবেশের সহিত দেহ যন্ত্রের উপযোজনের ফল। জন্মের সময়ই শিশু দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু শৈশবেই এই শক্তি বিকশিত হয় না। জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঐ শক্তি বিকশিত হয়। জন্মের সময় শিশুর অস্থি মস্তিষ্ক প্রভৃতি নরম থাকে; সব পেশী ক্রিয়া করতে পারে না। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে শিশুর দৈহিক বর্দ্ধন হয়, ওজন বাড়তে থাকে। জন্মসময়ে তার সকল ইন্দ্রিয়গুলি সমান ক্রিয়াশীল থাকে না। জন্মের পর ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বয়সের ক্রমপরিণতিতে শিশুর দৈহিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়।

জন্মসময় থেকেই শিশুর কতগুলি মৌলিক আবেগ থাকে যেমন রাগ, ভয় ভালবাসা প্রভৃতি। এই আবেগের প্রতিক্রিয়া তার ব্যবহারে দেখা যায়। ধীরে ধীরে পরিবেশের থেকে সে আরও জটিল আবেগ শিক্ষা করে, এবং নানারূপ আবেগজ ক্রিয়া করে।

শুধু দৈহিক নয় শিশুর মানসিক বিকাশও ধীরে ধীরে লক্ষ্য করা যায়। তাহার স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের থেকে শিশু বাহ্যজগত সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞান লাভ করার জন্য শুধু ইন্দ্রিয় নয়, ভাষারও দরকার হয়। শিশু মা, বাবা পরিবেশের কাছ থেকে ভাষা শিক্ষা করে এবং জীবনের অগ্রগতির পথে ধাপে ধাপে মাতৃভাষা আয়ত্ত করে ফেলে।

বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সমাজও পরিবর্দ্ধিত হয়। জন্ম সময়ে মা,

বাবা ছোট সংসারটি নিয়ে তার সমাজের গণ্ডী। ক্রমে শিশুর বন্ধু, প্রতিবেশী এবং পরে বিদ্যালয়ের সমাজে তার সামাজিক জীবনের শুরু হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল শিশু দেহ যেমন একদিকে বর্দ্ধিত হয় অপরদিকে তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক শিক্ষা দ্বারা বিকশিত হয়। শিক্ষা ও দৈহিক বর্দ্ধন উভয়ের পূর্ণতাতেই শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ। বিকাশ বলতে আমরা বুঝব বর্দ্ধন এবং শিক্ষা উভয়কেই। নিম্নে আমরা শিশুর গতিমূলক, ভাষামূলক, সামাজিক ও বয়ঃসন্ধিকালের বিকাশ ও বর্দ্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(১) **গতিমূলক বিকাশ (Motor Development)**—গতিমূলক কথাটি একটি বিশেষণ এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া, দেহভঙ্গি, চলার ক্ষমতা, কর্ম্ম ক্ষমতা প্রভৃতিকে বোঝায়। গতিমূলক ক্ষমতার প্রধান বিকাশ পরিলক্ষিত হয় শিশুর জন্ম সময় থেকে দুই বৎসর বয়স কাল পর্য্যন্ত। এই সময়ে শিশু যা কিছু শেখে তার ওপর পরবর্ত্তী জীবনের ভিত্তি"স্থাপিত হয়।

জন্মপূর্ব্বের (Pre-natal) বিকাশ :—এই সময় শিশু মাতৃগর্ভে পর গাছার মত অবস্থান করে। এইস্থানে শিশু বাইরের আঘাত থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পায়। কয়েক মাসের মধ্যেই তার স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। সাত মাসে মাতৃগর্ভেই শিশু প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া করে যেমন মাথা ঘোরাতে পারে, হাত পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়াতে পারে। হাতে কিছু ঠেকলে চুষতে পারে। সাধারণতঃ জন্মের পূর্ব্বে শিশুর এই সব প্রতিক্রিয়া করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাত মাসে ভূমিষ্ট হবার পর দেখা যায় শিশু এই সব কাজ করতে পারে।

শৈশবে (Infancy) :—জন্মের পরই অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে শিশু নূতন পরিবেশে পৃথিবীর আলোতে ভূমিষ্ঠ হয়। হঠাৎ তার পরিবেশের প্রভূত পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবেশে সময়ের ব্যবধানে শিশু খাদ্য লাভ করে, আলো, শব্দ প্রভৃতি শিশুর ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করে। এখন শিশুকে নূতন পরিবেশের উপযোগী ক্রিয়া করতে হয়। এখন শিশুকে খাদ্য পরিপাক করতে হয়, দৈহিক তাপ রক্ষা করতে হয়। এই সব ক্রিয়ার উপযোগী হওয়ার জন্য শিশুর কয়েকটি দিন দরকার হয়। এই সময় তার কিছু ওজন কমে যায়।

তারপর শিশুর শৈশব শুরু হয়। এই সময় শিশু নানাবিধ ক্রিয়া করে। শিশু তার নিজের শরীরটিকে নিয়ন্ত্রনে আনে, সে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করতে

পারে ; সামনে, পেছনে পাশে হাঁটিতে পারে ; সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ও নীচে যেতে পারে ; হাতের আঙুল দিয়ে জিনিষ ধরতে শেখে। জন্মের পর থেকে ছুবছরের মধ্যে শিশু এই সব কাজ করতে পারে। শিশুর ক্রমবর্দ্ধন লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিকাশের একটি সুনির্দ্দিষ্ট ধারা আছে। যেমন, শিশু বসার পূর্ব্বে মাথা তুলতে পারে ; এবং হাঁটবার পূর্ব্বে হামাগুড়ি দিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক মানব শিশুর ক্ষেত্রেই এই বিকাশের সুনির্দ্দিষ্ট ধারাটি লক্ষ করা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় সুস্থদেহ শিশু ছয়, সাত মাসে বসতে পারে, ন-দশ মাসে কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে। এক বছর পাঁচ মাস-ছয় মাসে চলতে পারে। এই সময় শিশুর ক্রিয়া কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশে চালিত হয়। তার ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে সে বাহ্যবস্তুর বা ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে এবং অনুরূপ ক্রিয়া করে। শিশু প্রথমে বস্তুকে প্রত্যক্ষণ করে পরে আবার দেখলে চিনতে পারে। যে ব্যক্তিকে সে পছন্দ করে তাকে দেখলে সে হাসে, হাত নাড়ে। ছু-তিন মাস বয়েসে শিশু এইরূপ ক্রিয়া করে।

শিশুর চোখ ও হাত একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু জন্মের পরই শিশু এই কাজ করে না। চোখে আলো লাগলেও শিশু আলোর সংবেদনে সাড়া দেয় না। তার হাতের মুঠিতে কোন জিনিষ শক্ত করে ধরা থাকতে পারে, কিন্তু সে সেদিকে তাকায় না। ছুমাস বয়স থেকে শিশুর চোখ চলমান বস্তুকে অনুসরন করে এবং দূরের ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সে বস্তুকে এইভাবে নিরীক্ষণ করে কিন্তু ধরবার জন্য হাত বাড়ায় না। তারপর শিশু কোন বস্তু দেখলে হস্ত সঞ্চালন করে, কিন্তু কেমন করে বস্তুটি পাওয়া যাবে বুঝতে পারে না, তাই এলোমেলো হাত নাড়ে। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে শিশু বস্তুটির জন্য সামনে ছুহাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু জিনিষটি ঠিক মত ধরতে পারে না। সাত মাস বয়সে শিশু বস্তুটি ধরতে পারে, হাতের তালু এবং সব আঙুল দিয়ে সে জিনিষটি ধরে। লক্ষ্য পথে এখন সে সোজাসুজি অগ্রসর হয় এবং আরও কয়েক মাস পরে বুড়ো আঙুল এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে জিনিষ ধরতে পারে।

শিশু একবার হাঁটতে শিখলে ধীরে ধীরে এই হাঁটা কাজটি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করে ; পরে সে দৌড়াতে পারে।

ধারণ (Prehension) :—জিনিষপত্র হাত দিয়ে ধরাকে ধারণ বলে।

সব চেয়ে সরল ধারণ হল হাত দিয়ে ধরা। যেমন আমরা গাছের ডাল ধরে ঝুলি অথবা সিঁড়ির বাঁশ ধরে উঠি। সূক্ষ্ম ধারণ হ'ল পেন্সিলটি অথবা ছুঁচটি মেঝে থেকে তুলে ধরা। শৈশবে ধরবার এই ক্ষমতা খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। কতগুলি মৌলিক ক্রিয়ার থেকে এই ক্ষমতা জন্মায়। প্রথমে শিশুকে বস্তুটির কাছে যেতে হবে; তারপর সেটিকে আঁকড়ে ধরবে, তারপর সেটিকে হাতের মধ্যে আনতে হবে। একটি জিনিষ শিশুর সামনে ধরলে সে এলোমেলোভাবে হাত নাড়ে। চার মাস বয়েসে সে বস্তুর দিকে হাত বাড়াতে পারে এবং দু চারবার ব্যর্থতার পর সে সেটিকে ধরিতে পারে। গোটা হাত দিয়ে, বিশেষ করে তালু দিয়ে শিশু বস্তুটি ধরে।

তিন চার মাস বয়েসে শিশু তার বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে। একমাত্র মানুষ অথবা বানর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর এই ক্ষমতা নেই।

শিশু যখন জন্মায় তখন তার প্রাথমিক ইন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এই সময় সে ইন্দ্রিয় সংবেদনের জন্য কোন প্রতিক্রিয়া করে না। ধীরে ধীরে তার ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা প্রথমে বৃদ্ধি পায়, তারপর তার শ্রবণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। এই শিশু তিক্ত, মিষ্ট ও লবণাক্ত স্বাদ সংবেদনও লাভ করে। পনের দিনের শিশু বেদনাদায়ক উত্তেজকে ত্বক সংবেদন লাভ করে।

হাঁচি, কাসি, খাদ্য গলাধঃকরণ প্রভৃতি প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়াগুলি শিশুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হলে বা আরামের অভাব হলে শিশু কাঁদে; প্রিয় পরিচিত জনকে দেখে হাসে।

সদ্যোজাত শিশুর ক্রিয়া সামগ্রিক। শিশু যা কিছু করে সমগ্র অঙ্গচালনা দ্বারা করে; বিশেষ একটি অঙ্গচালনা করে না। তার অঙ্গ সঞ্চালন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সহজাত এবং কোনো লক্ষ্যের উদ্দেশে সুনির্দ্দিষ্ট নয়। এইজন্য তার অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা থাকে না, সেগুলি এলোমেলো এবং শিশুর অঙ্গসঞ্চালন তার নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। ক্রমশ শিশু পৃথকভাবে অঙ্গসঞ্চালন করতে শেখে।

প্রথমের দিকে শিশুর অঙ্গসঞ্চালন থাকে খুবই সরল ক্রমশ সেগুলি জটিল হয়। যেমন, শিশু চলতে শেখে তারপর দৌড়ায়, তারপর লাফায়, ডিগবাজি খায়, সবশেষে খেলাধূলার জন্য দুরূহ, জটিল অঙ্গসঞ্চালন করতে পারে।

শিশু জন্মের প্রথম বৎসরে দুই ধারার ক্রিয়া করে। একটি হল সঞ্চরণ-মূলক (locomation), অপরটি হল ভারসাম্যজনিত (balancing)। জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস সে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার চেষ্টা করেনা। ছ-সাত মাস বয়েসে সে মেঝেতে ঘুরে বেড়াবার চেষ্টা করে এবং আট মাসে হামাগুড়ি দিতে সক্ষম হয়। কিছুদিন পর সে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারে এবং ন মাসে সে স্বচ্ছন্দে ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এগুলি হল সঞ্চরণমূলক ক্রিয়া। ভারসাম্যমূলক ক্রিয়াও একইভাবে মাথা, কাঁধ ও পা কে অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয়। তিন, চার মাসে শিশু মাথা সোজা রাখে, সাত, আট মাসে বসতে পারে, দশ মাসে ধরে দাঁড়াতে পারে। শিশু দশ-এগার মাস বয়েসে ধরে ধরে হাঁটিতে পারে, আঠার মাসে চলতে পারে। চলার সময় সে প্রথমে তার পাগুলি দূরে দূরে ফেলে এবং হাত ছড়ান থাকে পরে ভারসাম্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পা আরও কাছাকাছি থাকে এবং হাতগুলি ছড়ানো থাকে না।

সবশেষে আমরা বলতে পারি শিশুর বর্দ্ধন ও ক্রমবিকাশের পথে শিক্ষার দানও কম নয়। অনুশীলন এবং প্রবলীকরণ (reinforcement) শিশুর ক্রিয়াকে সহজ করে। শিশু যখন একটি কাজ করতে সক্ষম হয়, তখন হয় প্রবলীকরণ। সার্থকতা শিশুর উৎসাহ বৃদ্ধি করে ও তার শিক্ষাকে সহজ করে।

(২) ভাষামূলক বিকাশ (Language Development) :—ভাষা নানা প্রকারের। জীবজন্তুরও ভাষা আছে; তারাও বিভিন্ন গলায় বিভিন্ন স্বর সৃষ্টি করে; তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন একে অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। কিন্তু মানুষের মত মৌখিক ভাষা কোন জীবেরই নেই। এখন আমরা জন্মের পর থেকে শিশুর ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এক বছর বয়সের পূর্ব্বে শিশু যদিও কথা বলতে পারে না, কিন্তু তার মধ্যে দুই-এক মাস বয়েসেই ভাষা প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। জন্মলগ্নে শিশুর একমাত্র ভাষা কান্না অথবা ঘোঁত ঘোঁত (grunting) করা। দ্বিতীয় মাসে শিশুর কান্নার মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কান্না শুনে বোঝা যায় তার কোন কিছু আরামের অভাব হয়েছে। আর গলার ঘড় ঘড় আওয়াজ প্রভৃতি শুনলে বোঝা যায় সে আরাম ও আনন্দে আছে।

এরপর শিশু ধ্বনির পুনরাবৃত্তি (babling) করে। আ-আ, অগ, গ, ...এ্যাগো...ইত্যাদি। ধ্বনির আবৃত্তি শিশুর ভাষা শিক্ষার জন্ম খুবই প্রয়োজন। ছমাস বয়েসে শিশু প্রায় সব স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে। এই ধ্বনিগুলি বারবার সে আবৃত্তি করে, ধ্বনির মধ্যে কোন অর্থ না বুঝেই। ন-দশমাসে অন্যের অনুকরনে শিশু শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

বহু পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে শিশু ভাষা প্রকাশ করবার বহু পূর্ব্বেই ভাষা বুঝতে পারে। চারমাসে মানুষের গলার স্বর অনুসরণ করে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। ছ-মাস বয়েসে সে গলার সুরের বিভিন্নতা স্পষ্ট ধরতে পারে। কড়া সুর শুনলে সে কাঁদে আবার কোমল সুর শুনলে বুঝতে পারে তাকে আদর করা হচ্ছে। দশ মাসে শিশু প্রায় প্রত্যেকটি আদেশই বুঝতে পারে; বিশেষ করে আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করলে। যেমন কোন নিষিদ্ধ বস্তু খাবার উদ্যোগ করলে' মা-এর নিষেধ বুঝতে পারে।

আকার ইঙ্গিতেও শিশু নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে। যেমন বিস্কুটের টিনটি মাকে দেখিয়ে দিয়ে বিস্কুটটি চায়। মা খাইয়ে দিচ্ছে; আর খাবার ইচ্ছে নেই, মুখ বন্ধ করে খাবারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

কিন্তু কোন্ বয়েসে শিশু তার প্রথম কথাটি বলতে শেখে? কথা বলতে অবশ্য একটি বা দুটি শব্দকেই বোঝায়। কারণ শিশু প্রথমে শুধু শব্দই উচ্চারণ করে। সাধারণতঃ দশমাস থেকে তের মাস বয়েসের মধ্যে শিশু প্রথম শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। শব্দ এখন তার কাছে অর্থপূর্ণ, অর্থহীন ধ্বনি নয়। দাদা, বাবা প্রভৃতির দ্বারা সে একজন বিশেষ ব্যক্তি দাদাকে বা বাবাকেই বোঝায়। শব্দের প্রথম অক্ষরটি দিয়েও সে নিজের প্রয়োজন জানাতে চেষ্টা করে। যেমন চিনি খাবার ইচ্ছে হলে চি—বলে কাঁদে। প্রথম শব্দটি বলার পরই শিশুর শব্দ জগত দ্রুত বাড়তে থাকে। সাধারণত শিশু তার পরিচিত পরিবেশের জিনিষগুলির নাম প্রথমে বলতে পারে। এখন ক্রিয়ার ব্যবহার করে না। যেমন পাখী শব্দটির দ্বারা সে বোঝাতে চায় পাখীটি তার চাই অথবা মাকে পাখী দেখতে বলে। 'বাইরে' শব্দের দ্বারা সে হয়ত বোঝাতে চায় সে বাইরে যাবে। বিশেষ্যের পর শিশু ক্রিয়ার ব্যবহার করে। যেমন বলে 'খাব'। খাব বলতে হয়ত সে বলতে চায় 'আমায় খেতে দাও।' কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্য সে বলতে পারে না; একটি মাত্র শব্দের দ্বারা নিজের কথা

বলতে চায়। ক্রিয়ার পর বিশেষণ ও সবশেষে শিশু সর্বনাম ব্যবহার করতে পারে।

বুদ্ধি ও ভাষার বিকাশ (Intelligence and Language Development) :—ভাষার বিকাশে শিক্ষার প্রয়োজন আছে এ কথা সত্য। পরিবেশ থেকে শিশু তার মাতৃভাষাটি শেখে। শিশুর এই ভাষার ক্ষমতা তার বুদ্ধির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যে শিশু যত বেশী বুদ্ধিমান সে তত তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০-এর বেশী সে সাধারণ শিশুর থেকে চার মাস আগে কথা বলতে পারে। আবার অল্পধী ছেলেমেয়েরা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেদের চাইতে অনেক দেরীতে কথা বলে। খুব বোকা ছেলেমেয়েরা অনেক সময় একেবারেই কথা বলতে পারে না। অবশ্য শুধু বুদ্ধির অভাব নয় অন্য কারণেও শিশু দেরীতে কথা বলতে পারে।

মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে তাড়াতাড়ি ভাষা শেখে। নানা পরীক্ষা করে দেখা গেছে সমবয়সী ছেলে মেয়ের মধ্যে মেয়েদের শব্দ ভাণ্ডার অনেক বেশী; তারা বলতেও পারে অনেক ভালো করে, শেখে তাতাতাড়ি। বড়দের মধ্যেও তাই বোধ হয় দেখা যায় মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশী কথা বলে।

পরিবেশ (Environment) :—পরিবেশ শিশুর ভাষার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। স্বরযন্ত্রের ক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করার পর শিশুর ভাষা শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হয়। কিন্তু এর জন্য সুপরিবেশ দরকার। দেখা গেছে ধনীর সন্তান যত বেশী কথা শেখে, যত সুন্দর ভাষা বলে, দরিদ্রের সন্তান তা পারে না। যে শিশুর অনেক খেলনা আছে ; যে শিশু বাবা মার সঙ্গে বহু যায়গায় বেড়াতে যায়, সে অনেক বেশী শব্দ আয়ত্ত করে ও বলিষ্ট ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। ধনী গৃহে শিশু মাতাপিতা পরিজনদের মনোযোগও বেশী পায়। মা ছড়া শেখায়, অনর্গল শিশুর সঙ্গে কথা বলে। দরিদ্র গৃহে মায়ের অত সময় নেই, তাই শিশুর ভাষার বিকাশ ঠিক মত হয় না।

এক সঙ্গে অনেকগুলি ভাষা শুনলে শিশুর ভাষা শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত হয়। কোন ভাষাই শিশু সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে না।

শিশু যদি ভুল উচ্চারণ করে, বা কোন শক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে না পারে, তাহলেও তার কাছে ঠিক শব্দটি বলা উচিত। যেমন অধিকাংশ শিশু

ঠাকুমা বলতে পরে না—বলে থামা, থাতু প্রভৃতি। সে না বলতে পারলেও তার সামনে ঠিক কথাটি বলতে হবে। দেরীতে হলেও সে সেটি উচ্চারণ করতে পারবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় দু বছর বয়েসে শিশু প্রয়োজনীয় সব কথাগুলিই বলতে পারে। চার বছর বয়েসে শিশুর কথার অন্ত থাকে না। পাঁচ-ছ বছর থেকে সে লিখতে পারে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি শিশুর অভিজ্ঞতা যত বেশী হবে এবং তার ভাষা শিক্ষার প্রতি যত মনোযোগ দেওয়া যাবে শিশুর ভাষা ততই বিকশিত হবে। শিশুর পরিবেশের ভাষা যদি মার্জ্জিত হয় তবে শিশুর ভাষাও মার্জ্জিত হবে।

(৩) সামাজিক বিকাশ (Social Development)

মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব ; শিশু এই সমাজেরই একজন। কিন্তু জন্মের সময়ে শিশুকে সামাজিক বলা যায় না। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সে সামাজিকতা আয়ত্ত করে। পুরস্কার, শাস্তির দ্বারা এবং আদর্শ ও উদাহরণ স্থাপনের দ্বারা শিশুকে সামাজিক করে তোলা হয়। শিশুর পরিবেশ শিশুকে সামাজিক করে তোলার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে শিশুকে তার পরিবেশ জোর করে সামাজিক করে তোলে। শিশুই সমাজে বাস করার সময় সামাজিকতার পথে অর্দ্ধেক এগিয়ে যায়। প্রত্যক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জ্জন করা মাত্রই শিশু মানুষকে প্রত্যক্ষণ করে। ছ মাস বয়েসেই পরিচিত ব্যক্তিকে দেখলে শিশু হাসে। এই সময় পরিচিত ব্যক্তি নিয়েই শিশুর সমাজ গড়ে ওঠে। প্রথম বছরে শিশুর সমাজে থাকে তার গুরুজন, বাবা, মা প্রভৃতি। সমবয়সীদের প্রতি তার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। আঠার মাস বয়েসে শিশুকে তার সমবয়সীদের মধ্যে মিশতে দিলে দেখা যায় প্রথমে সে অন্য শিশুদের প্রতি খুবই কম মনোযোগ দেয়। ৩ বছর বয়েসে কয়েকজন শিশু একই জিনিষ নিয়ে খেলা করতে পারে। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে দেখা যায় তার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

খুব শৈশবেই শিশুর মধ্যে সহানুভূতি দেখা যায়, যদিও এই সময় প্রকৃত সাহায্য করার ক্ষমতা তার থাকে না।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিশু দলবদ্ধভাবে কাজ করে। কিন্তু এখন তাদের দলগুলি হয় ছোট ; বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে শিশু কাজ করতে পারে না। তার সমবয়সী, এবং তার সঙ্গে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল যাদের আছে তাদেরই মধ্যে থেকে সে দু-একজনকে বেছে নেয়। শিশুর পরিবার হল তার প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবারের বাইরে বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিশুর সমাজ বৃহত্তর হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে সে বিদ্যালয়কালীন জীবনযাপন করে। ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর সামাজিক জগত বৃদ্ধি পায়। নিজ দল ছাড়া ও অন্যান্য দলের সহিত সে সম্পর্ক স্থাপন করে।

সামাজিকীকরণ (Socialisation)

দল বা গোষ্ঠীর জন্য ব্যক্তি যেমন কাজ করে, দল বা গোষ্ঠীও সেইরূপ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। পরিবার হ'ল শিশুর প্রাথমিক গোষ্ঠী শিশুর প্রথম প্রয়োজন এই পরিবারের দ্বারাই সাধিত হয়। তারপর এই পরিবারই তাকে নির্দেশ দেয় এটি কর, ওটি কোর না। পরিবারের কাছ থেকেই শিশু শেখে কেমন করে সমাজে বাস করতে হয় পরিবারের পরেই শিশুর দলগত জীবন আরম্ভ হয়।

অনুকরণের (Imitation) দ্বারা শিশু সামাজিকতা শিক্ষা করে। একটি পরিবারে লক্ষ্য করলে দেখবে দু বছরের শিশু তার চার বছরের ভাইকে কতখানি অনুকরণ করে। সাধারণতঃ দুতিন বছরের শিশু অন্যান্য ছেলেদের অনুকরণ করেও শিশু সামাজিক হতে শেখে।

সহজীকরণ (Facilitation)

এক সঙ্গে একদলকে একটি কাজ দিয়ে এবং একটি শিশুকে পৃথকভাবে কাজ দিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে একসঙ্গে যারা কাজ করছে, তারা একে অন্যের উপস্থিতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহিত হচ্ছে, এবং তাদের কাজই দ্রুত হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু অন্যের উপস্থিতিতেই কয়েজনের কাজ দ্রুত ও সহজ হচ্ছে।

সহযোগিতা (Co-operation) ও প্রতিযোগিতা (Competition) : এক সঙ্গে অনেকে কাজ করলে, সকলের মনেই একটি প্রতিযোগিতার ভাব

আসে। ফলে দলের প্রত্যেকেই অন্যের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ করার চেষ্টা করে। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা পরস্পরের বিপরীত গুণ নয়; বরং পরস্পরের পরিপূরক। যেমন দুইটি দলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা হয় তখন তারা নিজের দলের ছেলেদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। আত্মপ্রতিষ্ঠা, গৌরব প্রভৃতি অর্জ্জনের জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাবটি আসে। আমার সমবয়সীদের মধ্যে আমি সব থেকে ভাল ফল করব, এই ইচ্ছার থেকে প্রতিযোগিতার উদ্ভব।

সহযোগিতা হল অপরের ইচ্ছায় ও সাহায্যে। আর প্রতিযোগিতার সময় আমরা অন্যের সাহায্য নিই কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনেক সময় জোর করে। অবশ্য বিশুদ্ধ সহযোগিতা বা বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। যে ছাত্র, শ্রেণীতে প্রথম হবার জন্য প্রতিযোগিতা করে সেই ছাত্রই আবার ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, নোট করে।

আজকের দিনে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সমস্যা একটি বড় সমস্যা। আমাদের খেলাধুলায়, বিদ্যালয়ে, চাকুরীর ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এর প্রয়োজন হয়। কেহ কেহ বলেন শিশুর প্রতিযোগিতা জন্মসূত্রে লব্ধ। মনোবিজ্ঞানীরা এ মত গ্রহণ করেন না। তাঁরা প্রতিযোগিতার ভাব বিলোপ করার নির্দ্দেশও দেননি তাঁরা বলেন প্রতিযোগিতা জন্মগত প্রবৃত্তি নয় এবং কৃষ্টি প্রতিযোগিতামূলক হবেই তাও নয় এবং প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতা শেখান যেতে পারে। জন্ম সময়ে শিশু আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তখন তার মধ্যে সহযোগিতার ভাব থাকে না, ক্রমে শিশুর জগত যতই বৃদ্ধি পায়, শিশু ততই অন্যের প্রতি মনোযোগী হয় এবং সহযোগিতা করতে শেখে।

বন্ধুত্ব (friendship)—দু'তিন বছর বয়েস থেকেই শিশুর মধ্যে বন্ধুত্ব দেখা যায়। সমবয়সী শিশুদের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। দৈহিক উচ্চতা, বুদ্ধি প্রভৃতিতে সমকক্ষ শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাধারণত শিশু যার মধ্যে নিজের আদর্শ প্রভৃতি দেখতে পায় তার প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়। তবে সব সময়ই যে একই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বা সমবুদ্ধিমান শিশুর মধ্যেই বন্ধুত্ব হবে তা নয়। কোন কোন শিশু অন্যের উপর প্রভুত্ব (leadership) করতে চায়, এবং সেইজন্য কর্ত্তৃত্ব করা যায় ঐরূপ শিশুর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করে থাকে।

সহানুভূতি (sympathy)—সহানুভূতি পরকেন্দ্রিক অনুভূতি। অন্যের

দুঃখে দুঃখিত হওয়া এবং সেই দুঃখ দূর করার ইচ্ছাকেই সহানুভূতি বলব। অতি শৈশবেই শিশুর এই অনুভূতি আসে। মাতার চোখের জলে শিশু বিচলিত হয়, এবং নানাভাবে মায়ের দুঃখ মুছে ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়। পরে বন্ধুর দুঃখে সে ব্যথিত হয়; বন্ধুর বিপদ দেখলে সাহায্য করার জন্য ছুটে যায়। কিন্তু ছোট শিশু সহানুভূতি দেখানোর জন্য আত্ম ত্যাগ করতে পারে না বা কষ্ট স্বীকার করে না। নিজের প্রয়োজন ভুলে অপরের জন্য সহানুভূতি অনুভব করে কাজ করা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে ও পরিবারের শিক্ষার উপর এই সহানুভূতির বিকাশ নির্ভর করে।

সামাজিক বিকাশ শিশুর অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জন্মমুহূর্তে শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক তার মধ্যে সামাজিকতাবোধ থাকে না। ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার দৈহিক বিকাশ হয়। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে মানসিক বিকাশ হয়; তার বুদ্ধি বাড়ে; ভাষা আয়ত্ত করে সে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। ভাষার সাহায্যে সে চিন্তা করে অন্যান্য মানুষের সম্পর্কে আসার ফলে সামাজিক রীতিনীতিগুলি সে আয়ত্ত করে। এবং কোন্‌টি শ্রেয় কোন্‌টা ন্যায় বুঝতে শেখে। শিশুর আবেগের প্রকাশও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সমাজে বাস করার ফলে শিশু বুঝতে পারে এ সমাজে চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না, অতএব বাসনার অপূর্তি জনিত ক্রোধ বা দুঃখকে সে দমন করতে শেখে। শৈশবে শিশু অল্প কারণেই বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে; সামান্য মত বিরোধেই ক্ষিপ্ত হয়। পরে দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজ থেকে শেখে আত্মদমন করতে।

তবে একথা ঠিক নয় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর সামাজিক বিকাশ হবে। পরিবেশ এবং শিশুর নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক সময় তাকে অসামাজিক করে তুলতে পারে। সব শিশু সব সমাজে মিশতে পারে না; কেহ কেহ শুধু পরিচিতদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। অপরিচিতকে দেখলে সরে যায়। আবার অনেকে প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে মিশতে পারে কিন্তু সমবয়সী-দের সঙ্গে মিশতে পারে না।

সামাজিক বিকাশের সহায়ক (Factors influencing social Development) শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে কতগুলি উপায়ের উপর। খেলাধুলার মধ্যে শিশুর সামাজিকীকরণ হয়। খেলাধুলার মধ্যে

অন্যের সঙ্গে শিশু সহযোগিতা করে খেলতে শেখে। শিশুর খেলায় বয়স্ক জীবনের অনুকরণ থাকে, খেলার মধ্যে দিয়ে সে সামাজিক রীতি-নীতিগুলি অনুকরণ করে ও সামাজিক হয়।

পরিবারের পরই শিশুর দলগত জীবন আরম্ভ হয়। দলপতির প্রভাব তার সামাজিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রন করে। দলপতি তার অনুসরণকারীদের মনে প্রেরনা জাগায়, তাদের সকলকে উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করে। দলের নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তি দেয় এবং দলের সুষ্ঠু কার্য্য পরিচালনার জন্য পুরস্কৃতও করে। অনুবর্ত্তীরা ব্যর্থ হলে দলপতি তাদের সাহায্য করে; তাদের অসন্তোষ বা ক্রোধের সম্মুখীন হয় এবং প্রশমিত করে। দলপতির কাজ প্রধানতঃ দুটি উৎসাহ প্রদান (inspiration) ও কার্য্যকরী করা (executions)। দলপতি তার অনুবর্ত্তীদের লক্ষ্য পথে পরিচালিত করে, তাদের কার্য্যে উৎসাহ দেয়, ঠিকমত কাজ করায়। অপর দিকে দলপতি লক্ষ্যস্থির করে, পরিকল্পনা করে, দল গঠন করে, অনুবর্ত্তীদের কাজের শ্রেণীবিভাগ করে। দলপতির ব্যক্তিত্ব, গুন, দায়িত্ববোধ, প্রভৃতির উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে।

শিশুর পরিবারের কৃষ্টির উপরও শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। অশিক্ষিত পরিবারের শিশুর সামাজিকতা শিক্ষিত পরিবারের মত হয় না। পরিবারের রুচির দ্বারা প্রতিটি শিশুই প্রভাবিত হয়। ধনী ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যেও শিশুর সামাজিকতা বোধের বিভিন্নতা দেখা যায়। ধনীর সন্তান সাধারণতঃ দাম্ভিক, উদ্ধত হয়। দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা উদার, বিনয়ী ও শ্রমশীল হয়। ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব এই জন্য সহজ নয়। দারিদ্র্য সামাজিকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নিজের পরিবারের শিক্ষাহীনতা বা দারিদ্র্য প্রভৃতির জন্য শিশুর হীনমন্যতা আসে এবং ধনী সম্প্রদায়ের শিশুর সঙ্গে মিশতে পারে না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি শিশুর পরিবার, দল, দলপতি : শিশুর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রভৃতির উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে।

বয়োসন্ধিকাল (Adolescence)

বয়োসন্ধিকাল শিশুজীবনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিপর্য্যয়মূলক কাল। সাধারণতঃ বার থেকে আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত সময়কে বয়োসন্ধির কাল বলা হয়। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পনের কালই হল বয়োসন্ধির কাল। এই সময় শিশুর দেহে ও মনে বিরাট পরিবর্ত্তন আসে, এবং এই অভাবিত পরিবর্ত্তন তার জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্য তার জীবনে নব নব আকাঙ্খার উন্মেষ হয়; নূতন, অভূতপূর্ব কিছু করার জন্য তার প্রাণে আসে ব্যাকুলতা। কিন্তু সমাজে তার এই নূতন স্ফূর্ত্তি স্থান পায় না। তখন আশাহত নবযৌবন প্রাপ্ত মানুষটি মনে মনে পীড়িত হয়। অভিমান, ক্ষোভ প্রভৃতি তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে এবং তার জীবনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে।

বয়োসন্ধিকালে শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন আসে। আমরা প্রথমে দৈহিক ও পরে মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

(১) **দৈহিক পরিবর্ত্তন** (Physical change):—বয়োসন্ধিকালে শিশুর দেহে বহু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে দেহের ওজন ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। শরীরের বিভিন্ন সুপ্ত গ্রন্থিগুলি রসক্ষরন করে ও যৌন হরমোন নিঃসৃত হয় এবং শরীরের যৌন অঙ্গের বিকাশ ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। শিশুর সর্ব্ব অঙ্গ অস্থি, পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি পরিপুষ্ট হয় এবং এই পরিপুষ্টির জন্য এই সময় শিশুর খাদ্যের অধিক প্রয়োজন হয়। শিশুর মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তন হয়। চোখে মুখের ভাব প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময় কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন। ছেলেদের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয় এবং মেয়েদের কণ্ঠস্বরেও তীক্ষ্ণতা আসে। ছেলেদের আকৃতিতে এই সময় কাঠিন্য আসে এবং মেয়েদের শরীরে লালিত্য দেখা দেয়। বয়োসন্ধিকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হল শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে রোমোদ্গম। ছেলেদের গোঁফ দাঁড়ি গজায়, শুক্রপাত হয়; মেয়েদের রজঃস্রাব হয়।

মানসিক পরিবর্ত্তন (Mental change)

বয়োসন্ধিকালে শিশুর অভূতপূর্ব্ব মানসিক পরিবর্ত্তন আসে। তার বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলি পূর্ণতা লাভ করে। তার বিচার

শক্তি, বোধ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে নানা সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসে। তার অনুভূতি ও আবেগের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তবে শৈশবের অনুভূতি ও আবেগপূর্ণ মনটির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

এই সময় শিশু অত্যন্ত বেশী আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। তার পোষাক পরিচ্ছদে, চলায় বলায় সর্বত্র সে আত্মসচেতনতার পরিচয় দেয়। এই সময় হাস্যাস্পদ হতে বা সমালোচনার পাত্র হতে সে রাজি নয়। আত্মসচেতনতা থেকে তার মনে জন্মায় আত্মমর্য্যাদাবোধ। তার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগলে সে এখন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

সদ্য যৌবন প্রাপ্ত মানুষটি এখন সাবলম্বী হতে চায়; তার মনে পিতামাতা অভিভাবকের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব জাগে। স্বাধীনচেতা মানুষটি এখন অভিভাবকতার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে চায়।

নবীন যুবকটি এখন নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ। সমাজ সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার করে পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করে সে নবীন নূতন ভাবধারায় জগত গড়তে চায়। তার এই নব-উন্মেষ প্রবীনদের কাছে বাধা প্রাপ্ত হলে সে বিদ্রোহী হয়।

শুধু সমাজ সংস্কার ভেঙ্গে ফেলা নয়, নব যুবকের মনে তখন যৌন চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। যৌন প্রয়োজন এই সময় তার কাছে স্পষ্ট না হলেও তার মধ্যে প্রণয়-বাসনা জাগ্রত হয়। যৌন রহস্য জানবার জন্য এই সময় সে অপরিসীম কৌতূহল অনুভব করে।

এই বয়সে শিশু দিবাস্বপ্নের মধ্যে তার আকাশ-চুম্বী বাসনার চরিতার্থতা খোঁজে। দিবাস্বপ্নে সে একদিকে অসাধারণ কিছু করে এবং গৌরবের সর্ব্বোচ্চ আসনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে অপর দিকে সে প্রেমিকের ভূমিকার মানস কল্পনা করে। প্রিয়ার জন্য কত অসাধ্য সাধন করে।

বয়োসন্ধিকালের সমস্যা ও প্রয়োজন (Problems and needs of Adolescence) :—

বয়োসন্ধিকালে নব যৌবনপ্রাপ্ত শিশুর মানসিক বিপর্যয় বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। তার নব উন্মেষ বয়স্কদের সহানুভূতির রসে সিক্ত না হয়ে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। তার স্বাধীনচেতা মন এখন প্রাপ্ত বয়স্কদের মত কাজ

করতে চায়। কিন্তু বয়স্কদের রূঢ় আঘাতে হয় সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে নয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত অনুশাসন ভেঙ্গে চুরমার করে স্বাধীনভাবে সে কাজ করতে চায় কিন্তু তার সে ইচ্ছা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে অনেক সময় সে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং অপরাধ-প্রবণতা প্রভৃতি মানসিক দুষ্কৃতিগুলির আবির্ভাব হয়।

মনোবিজ্ঞানী জেম্‌স বলেছেন শিশুর বয়োসন্ধিকালে শৈশবের পুনরাবৃত্তি হয়। শৈশবে জন্মগ্রহণের পর শিশুকে একবার সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করতে হয়েছিল, এখনও আবার সেইরূপ তাকে নূতন করে সঙ্গতি স্থাপন করতে হয়।

শৈশবে পরিবেশ তার বর্দ্ধনে সাহায্য করে। কিন্তু এই সময় পরিবেশ থেকে শিশু আঘাত পায়। তার দেহ মনের বিপর্যয়টি পরিণত বয়স্কের কাছে যথেষ্ট মর্যাদা এবং মনোযোগলাভে অসমর্থ হয়। ফলে শিশুজীবনে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়; তার দুর্ব্বার আবেগ যখন প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দুকূল ভেঙ্গে অগ্রসর হতে চায়, তখনই বয়স্কদের অনুশাসন ও অবিচার তাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তোলে; ফল হয় বিদ্রোহ নয় আত্ম-নিপীড়ন, মানসিক বিকৃতি। এইজন্যই মনোবিজ্ঞানীরা এই সময়কে 'ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল' বলে বর্ণনা করেছেন।

স্ট্যানলিহল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা নব যৌবনপ্রাপ্ত শিশুর বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের পরীক্ষানুযায়ী বয়োসন্ধি-কালের কয়েকটি চাহিদা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) **স্বাধীনতার চাহিদা** (need for Freedom) :—শৈশবের পর নির্ভর শিশু এই সময় স্বাধীন হতে চায়। তার মানসিক শক্তির পূর্ণতা থেকে মনে আসে আত্মবিশ্বাস এই সময় সে সব কাজে এগিয়ে আসে, মতামত দেয়; স্বাধীনভাবে কাজটি করতে চায়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকায় সে আর পর নির্ভর নয়। নিজের চিন্তানুযায়ী কাজ করবার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে।

বয়স্করা ছেলেদের এই মনোভাবকে অকালপক্কতা বলেন এবং তাদের মতামতের মূল্য দেন না, এমন কি তাদের মনোভাবে বিরক্ত হ'ন।

(২) **সামাজিক চাহিদা** (social need) :—এই সময় শিশুর সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পিতামাতা, পরিচিত বন্ধুর মধ্যে তার আত্মস্ফূর্ত্তি হয় না। বৃহত্তর সমাজ, বৃহত্তর পৃথিবীর ডাক সে অনুভব করে। নূতন বন্ধুর জন্য সে আকর্ষণ অনুভব করে।

শৈশবের মত এখন সে আর আত্মকেন্দ্রিক নয়। পরের জন্য সে এখন আত্মোৎসর্গ করতে চায়। বিদ্যালয়ে, ক্লাবে, সভায়, সমিতিতে তার এই প্রয়োজন চরিতার্থ হয়।

(৩) **জীবন দর্শনের চাহিদা** (need for ideas) :—এই সময় শিশু জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে চায়। জীবনের রহস্য কোথায়, তার সার্থকতা কি ; অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র মানুষের জীবনের অর্থ কি তা সে উপলব্ধি করতে চায়। তার প্রশ্ন ব্যাকুল মন এখন নিজের জীবনের একটি দর্শন গড়ে নেয় এবং জীবনাদর্শ স্থির করে ফেলে। পার্থিব জগতের মানুষের কাছে তার এই প্রশ্নের উত্তর মেলে না তাই সে এখন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফেরে এবং একটি অপরিপক্ক জীবন-দর্শন গড়ে তোলে।

(৪) **নৈতিকতার চাহিদা** (need for morality) :—এই সময় নবযুবকের মনে নীতিবোধ স্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। নৈতিক মানদণ্ডে সে ব্যক্তির ব্যবহারের বিচার করে। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ভক্ত হয়ে ওঠে। নিজেও কোন নীতি বর্হিভূত কাজ করে ফেললে অপরাধ ভারে কষ্ট পায়।

(৫) **যৌন চাহিদা** (sexual need) :—এই সময় শিশুর যৌন প্রবৃত্তি পূর্ণতা লাভ করে ; ফলে এখন সে যৌন প্রয়োজন অনুভব করে। তবে এই প্রয়োজন তার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। ছেলেরা এই সময় মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করে এবং মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। এই সময় যৌন কৌতূহল জাগ্রত হয়, যৌন রহস্য জানবার জন্য সে ব্যগ্র কৌতূহল অনুভব করে।

(৬) **আত্মনির্ভরতার চাহিদা** (need for self dependence). এই সময় শিশু সর্ব্বপ্রকারে আত্মনির্ভর হতে চায়। সংসারের অভাব-অনটন দেখে সে চায় অর্থ উপার্জ্জন করতে। নিজের উপার্জ্জিত অর্থ শুধু নিজের প্রয়োজন নয়, অপরকে সাহায্য করার প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে চায়। বেকার সমস্যা প্রভৃতি তাদের মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। বিবাহিত জীবন ও নিজের গৃহস্থালী গঠন নির্ভর করে বৃত্তি নির্ব্বাচন ও আর্থিক উন্নতির উপর। এই সময় ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং বিভিন্ন বৃত্তি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৭) **আত্মপ্রকাশের চাহিদা (need for self expression)**—নব যৌবনের উন্মেষে ব্যক্তি এখন নিজেকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়। সমাজের পাঁচজনের কাছে নিজের বুদ্ধি, কলাকৌশল প্রভৃতির মাহাত্ম্য দেখিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চায়। তার চলায়, বলায় এই আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is meant by growth and development? Describe a child's motor development after birth.

১। বর্দ্ধন ও বিকাশ বলতে কি বোঝায়। জন্মের পর থেকে শিশুর গতিমূলক বিকাশের বর্ণনা দাও।

2, Explain how language development of a child proceeds.

২। শিশুর ভাষার বিকাশের অগ্রগতি কিরূপে হয় ব্যাখ্যা কর।

3. What is social development? Explain how a child develops into a social being.

৩। সামাজিক বিকাশ কাহাকে বলে। কিরূপে একটি শিশু একজন সামাজিক ব্যক্তিতে বিকাশ লাভ করে ব্যাখ্যা কর।

4. What is adolescence? What changes take place in the body and mind of the child in his adolesence period?

৪। বয়োসন্ধি কাহাকে বলে। বয়োসন্ধিকালে শিশুর দেহ ও মনে কি কি পরিবর্ত্তন আসে?

5, What are the problems and needs of a child in adolesence period?

৫। বয়োসন্ধিকালে শিশুর সমস্যা ও প্রয়োজন কি কি?

6. Write short notes on :—

Physical changes in adolescence ; co-operation, competition, facilitation and prehension.

৬। দৈহিক পরিবর্ত্তন, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহজীকরণ ও ধারণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health)

নীরোগ, সুস্থ, বলশালী এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিকে আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী বলতে পারি। সেইরূপ সুস্থ মন, মানসিক রোগ বা বিকৃতি শূন্য, বলিষ্ঠ মনের অধিকারীকে বলব মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি। যেহেতু মনকে পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন (adjustment) করতে হয় সেইজন্য মানসিক স্বাস্থ্য বলতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিযোজন ক্ষমতাকে বোঝায়। মানসিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি অতি সহজে বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে সমাজ; সংসারের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজনে সক্ষম হয়। অতএব মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝব রোগহীন, বিকৃতিহীন মন এবং সুস্থ মন যে মন সহজে বাস্তবের সম্মুখীন হতে পারে; বাস্তব থেকে দূরে পলায়ন করে না এবং পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজন করতে পারে।

মানুষকে প্রতিনিয়ত মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তার আচরণ স্বাভাবিক এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। 'এইজন্য মানসিক স্বাস্থ্য' কখনও নির্দ্দিষ্ট অবস্থা বোঝায় না। ব্যক্তির আচরণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজের আচরণের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা নিদর্শন করা যেতে পারে এইভাবে। মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি সবচেয়ে সন্তোষজনক, আনন্দপূর্ণ ও সমাজের উপযুক্ত ব্যবহার এবং বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হওয়া ও তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা।

সম্পূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য সহজে লাভ করা যায় না, তাকে অর্জ্জন করতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই প্রগতিশীল। ইহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহারের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক আহবান।

নিজেকে বোঝা এবং সমাজের যাদের সংস্পর্শে ব্যক্তি আসে তাদেরকে বোঝার প্রয়োজন আছে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব এর অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের আবেগময় জীবনই সবচেয়ে বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে। মানসিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা থাকে।

একজন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সুস্থ ও স্বাভাবিক আচরণ করবে। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখবে, নূতন কিছু করার জন্য তার আগ্রহ থাকবে, নিজের কাজে আনন্দ থাকবে। সে সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত থাকবে। সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি সমাজের সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে; এবং অন্যের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারে। তার মধ্যে মানসিক সাম্য থাকবে; চিন্তাশক্তির মধ্যে তার স্থিতিশীলতা থাকবে। এক কথায় যে ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিযোজন করতে পারে সেই মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

অপপ্রতিযোজন (Maladjustment)

শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ব্যক্তি ব্যর্থতা, হতাশা প্রভৃতি অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। বাস্তবের সহিত শিশুর অতৃপ্ত বাসনার দ্বন্দ্ব (Conflict) উপস্থিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর বাসনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে সব বাসনা পূর্ণ হয় না অতএব ব্যক্তিকে হয় বাসনার অপূর্ণতাকে স্বীকার করে নিতে হয়; নতুবা অন্য কোন বাসনা চরিতার্থতার জন্য চেষ্টা করতে হয়। অপূর্ণ বাসনার জন্যে ব্যক্তির মনে দ্বন্দ্ব আসে।

বাল্যকালেই শিশুর মনে নীতিবোধ আসে এবং নীতি-বোধ থেকে তার মনে আদর্শ চরিত্রের একটি ধারণা হয় এবং এর জন্য স্বাভাবিক মনের বাসনার সঙ্গে তার নৈতিক আদর্শের বিরোধ আসে। এর জন্য সে মানসিক দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ক্ষতিকর নয়, কারণ সামাজিক নীতির অনুসরণ করে দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং উত্তেজনার প্রশমন হয়। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তি দ্বন্দ্বকে অবদমিত করবার চেষ্টা করে। অবদমন মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে মনে উত্তেজনা (tension) আসে এবং উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ব্যক্তি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে এবং অনভিপ্রেত ব্যবহারের সৃষ্টি করে।

দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য ব্যক্তি বিবিধ উপায়ে প্রতিযোজনের (Adjustment) চেষ্টা করে। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাস্তব জীবন

থেকে পলায়ন প্রভৃতির থেকে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিযোজনের এই উপায়গুলি শ্রেয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোজনের উল্লেখ করা হল।

ক্ষতিপূরণ (Compensation) :—ব্যক্তি নিজের দৈহিক বা মানসিক অপূর্ণতা বা অভাব স্বীকার করতে চায় না। অত্যন্ত দুর্বল লোক নিজেকে শক্তিমান প্রতিপন্ন করার জন্যও দেহ-গঠনের জন্য প্রাণপনে পরিশ্রম করে এবং হয়ত একজন শক্তিমান পুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

তোতলা অনেক যত্নসহকারে চেষ্টা করে তার তোতলামি দূর করতে এবং কালে নিজ চেষ্টায় হয়ত একজন শ্রেষ্ট বক্তা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিপূরণ করে।

(১) **যৌক্তিকরণ** (Rationalisation) :—অনেক সময় ব্যক্তি নিজের কোন আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করে কিন্তু কারণটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। ব্যক্তি নিজে কিন্তু জানে না যে সে মিথ্যা বলেছে। যেমন যে মেয়ে বলে সে নাচঘরে যাবে না কারণ সে নাচতে ভালবাসে না, বাস্তবে তার মনে ভয় থাকে যদি তাকে কেউ নাচবার জন্য না ডাকে।

(২) **দিবাস্বপ্ন** (Day Dreaming) :—অনেক সময় সাধারণ মানুষ কল্পনায় সার্থকতার আনন্দ উপভোগ করে। দিবাস্বপ্ন ব্যক্তির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়, কারণ ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে বাস্তব জগত থেকে পলায়ন করে। যে ব্যক্তি বাস্তবে বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে সে দিবাস্বপ্নে সার্থকতার কল্পনা করে আনন্দ পায়।

অক্ষমতার মধ্যে প্রতিযোজন (Adjustment through disability) হিষ্টিরিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি প্রতিযোজন করে। কোন দৈহিক অক্ষমতা নেই তবুও ব্যক্তি হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় এবং বাস্তব জগত থেকে পলায়ন করে। অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, প্রভৃতি দেখা যায়। আক্রান্ত ব্যক্তি সত্যই রোগের যন্ত্রণায় ভোগে, যদিও সে জানে না তার অক্ষমতা মানসিক, দৈহিক নয়। শিশু যদি দেখে অসুস্থ হলে বিদ্যালয় অথবা গৃহের অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান হবে তাহলে সে রোগের আশ্রয় নেবে।

বিকল্প আচরণ (Displacement) :—ব্যক্তি উদ্দেশ্য বা লক্ষ পরিবর্ত্তিত করে যেমন অফিসের উপরওয়ালার ওপর রাগ হয়েছে, বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বকলাম।

(৪) প্রক্ষেপ (Projection) :—নিজের দোষ অনেক সময় আমরা অন্যের প্রতি আরোপ করি। যেমন কাঁচের বাসন ভেঙে ফেলে যে রেখেছে তার ওপর দোষ চাপাই।

(৫) অভেদীকরণ (Identification) :—অন্যের অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা বলে অনেক সময় ব্যক্তি বর্ণনা করে।

(৬) প্রত্যাবর্তন :— (Regression) :—বয়স্ক ব্যক্তি অনেক সময় শিশুসুলভ আচরণ করে।

(৭) নেতিবাচক (Negativism) :—ব্যক্তি আদেশ বা অনুরোধের বিরুদ্ধে যায় এবং নিষিদ্ধ কাজ করে।

(৮) অবদমন (Repression) :—ব্যক্তি অবদমনের দ্বারা অতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হয় এবং এইভাবে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়।

(৯) উদ্বেগ ও ভয় (Anxiety and phobia) :—বাস্তবে ভয়ের কারণ বা উদ্বেগের কারণ না থাকলেও ব্যক্তি বা আতঙ্কে আক্রান্ত হয় এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অধীর হয়।

অপপ্রতিযোজন তিন প্রকারে সাধিত হয় (Aggressive Behaviour)

(১) আক্রমণাত্মক আচরণ :—ঝগড়া, চুরি করা, বিদ্যালয় থেকে পলায়ন, অবাধ্যতা, অগ্রাহ্য করা, ঔদ্ধত্য, প্রভৃতি আক্রমণাত্মক অপপ্রতি-যোজন।

(২) প্রত্যাহার (Withdrawal) :—লজ্জা, ভয়, দিবাস্বপ্ন, অসামাজিকতা, গোপনতা প্রিয়তা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তি বাস্তব জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

(৩) স্নায়ুদৌর্বল্য (Nervous habits) :—নখ কামড়ান, আঙুল চোষা, অস্থিরভাবে গমন, পেশীর আক্ষেপ (Tics) প্রভৃতি স্নায়ুদুর্বলতাজনিত আচরণ।

অপ্রতিযোজনের কারণ (The cause of maladjustment) :—সমস্যামূলক আচরণ বহু প্রকার। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমস্যামূলক আচরণের পার্থক্য দেখা যায়। শিশু ছোট ভাইএর প্রতি ঈর্ষাবশতঃ নানাভাবে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। শিশু দেখে মা তাকে খাওয়াতে ভালবাসেন

অতএব শিশু খাওয়ার সময় নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। সে হয়ত দেখে ভয় পেলে মা আদর করে। এরপর থেকে সে নানা আতঙ্কে ভোগে। সমস্যামূলক আচরণ হল অপপ্রতিযোজনের লক্ষণ। সমস্যামূলক আচরণের বিভিন্নতার জন্য অপপ্রতিযোজনের কারণও বহু। গৃহের অবস্থা, প্রতিবেশীর গুণাগুণ, পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ, বিদ্যালয়ের সহিত শিশুর সম্বন্ধ শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য, তার মানসিক প্রকৃতি,প্রতিযোজনে শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যক্তির অপপ্রতিযোজন নির্ভর করে। নানা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভগ্ন সংসার, দারিদ্র্য প্রভৃতির কোনটাই অপপ্রতিযোজনের কারণ নয়। ফ্রান্সিস্ ও ফিলমোর দেখিয়েছেন যে শিশুর প্রতি পিতামাতার ব্যবহার এবং পিতামাতার নিজের প্রতিযোজন শিশুর প্রতিযোজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশ তার অপযোজনের জন্য দায়ী।

অতৃপ্ত বাসনা, ব্যর্থতা নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতির জন্য শিশু অপপ্রতিযোজন করে। অপরাধবোধ, লজ্জা প্রভৃতির জন্যও শিশু মনে অপপ্রতিযোজনতা দেখা দিতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দান (Contributions of Mental Hygiene) ১৯০৮ সালে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। অপপ্রতিযোজনের প্রথমের দিকের লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মানসিক বিকৃতির হাত থেকে বহু ব্যক্তিকে রক্ষা করেছে। শিশুদের সুস্থ শিক্ষাদনের দ্বারা পিতামাতা ও শিক্ষক কিভাবে অপপ্রতিযোজনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তা বলে দেয় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে যে সমস্যামূলক আচরণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জেনে নিতে হবে এবং অপপ্রতিযোজনশীল ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে; তাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সর্বদিক থেকে জানতে হবে। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের আবেগ মূলক প্রয়োজনগুলিকে জানতে হবে। ব্যক্তির দুটি আবেগমূলক আচরণ হল নিরাপত্তার প্রয়োজন ও কার্য্যসাধনের প্রয়োজন।

নিরাপত্তার প্রয়োজন (Need for security):—শিশু ভাবতে চায় যে তার প্রয়োজন আছে। সে অনুভব করতে চায় যে এ পৃথিবীতে সে কোন একটি স্থান-অধিকার করে আছে, কোন ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজন আছে।

পিতামাতার ভালবাসায় শিশুর এই প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হয়। যে শিশু পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা পায় না তারা বেশীর ভাগই সমাজের সঙ্গে আবেগজ প্রতিযোজনে অক্ষম হয়। পিতামাতার মধ্যে সঙ্গতি থাকলে শিশুর আবেগ শান্ত ও স্বাভাবিক থাকে। অনেক পরিবারে শিশুর সম্পর্কে পিতামাতার মধ্যে মতের অনৈক্য দেখা যায়, এবং সন্তানের স্নেহের ব্যাপারেও তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিশু নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। পিতামাতার মৃত্যু, পিতামাতার কলহ-পরায়ণতা প্রভৃতি শিশু মনে নিরাপত্তার অভাবের সৃষ্টি করে। সৎমায়ের অনুশাসন, আত্মীয় স্বজন অথবা অপরিচিত স্থানে লালিত হলে শিশু নিরাপত্তা হীনতা অনুভব করে।

ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন হলেও শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। খেলার সাথী, বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের বন্ধু, প্রতিবেশীর ঘন ঘন পরিবর্তনে শিশু প্রতিযোজনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

ছোট ভাই বোনের জন্ম হলে শিশু নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। প্রথম সন্তানের প্রতি মাতা যে সময় ও মনোযোগ দিতেন, নবজাত শিশুর জন্য এখন তার অনেকখানি দিতে হয়। প্রথম সন্তান নিজেকে অপ্রার্থিত মনে করে, সে মনে করে মা তাকে আর ভালবাসে না। হারানো ভালোবাসা ফিরে পাওয়ার জন্য সে বহু প্রকারে চেষ্টা করে এবং অপপ্রতিযোজনের সৃষ্টি হয়। পিতামাতার উচিত প্রথম সন্তানকে নানাভাবে তার ছোট ভাইয়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখা, ছোট ভাইটিকে ভালবাসতে শেখানো এবং নিজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন থাকা।

একদিকে শিশু মনে যেমন নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, অপরদিকে সেইরূপ পিতামাতাকে দেখতে হবে সন্তানকে যেন অত্যধিক স্নেহ-যত্নে না লালন করা হয়। যে মাতা শিশুর জন্য অত্যধিক উদ্বেগ পোষণ করে এবং শিশুকে অত্যধিক যত্নে রাখতে চায় সে তার সন্তানের আরো বেশী ক্ষতি করে। কোন কোন ব্যক্তির আবেগজ বিকাশ হয় না এবং শিশুসুলভ আচরণ করে। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হবার পর নানারকম মেজাজ দেখায়, অপরে সমস্যা সমাধান করে দেবে সেইজন্য অপেক্ষা করে।

এই সব ব্যক্তির মধ্যে আত্মনির্ভরতা আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির অভাব দেখা

দেয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের জগতে এই সময় মানুষ প্রতিযোজনে অক্ষম হয়। তারা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিশুকে যেমন স্তন্য থেকে বোতল ধরান হয়, পরে বোতল থেকে কাপে শিশুকে দুধ খাওয়ানো হয়; পরে সে নিজেই খেতে শেখে। সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই শিশুকে আত্মনির্ভরতা শেখাতে হবে। তার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী তাকে প্রত্যেকটি কাজ করতে দিতে হবে। তাকে নিজে নিজে স্নান করার চেষ্টা করতে দিতে হবে, পোষাক পরতে চেষ্টা করতে দিতে হবে। এরপর সাহায্য ছাড়াই সে পোষাক পরতে পারবে। একটি ঘরে তাকে একা থাকতে শেখাতে হবে; তারপর তাকে রাত্রে আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে দিতে হবে। ক্যাম্প, বোর্ডিং প্রভৃতিতে শিশুকে রাখলে এই শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশু যখন বোর্ডিং-এ থাকার সময় বাড়ীর জন্য মন খারাপ করে, তখন বুঝতে হবে সে তার পিতামাতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করে। টাকা খরচ করার ব্যাপারেও শিশুকে আত্মনির্ভর হতে শেখানো দরকার। যে শিশুর নিজস্ব কোন টাকা-পয়সা নেই, সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। শৈশবে দুএক পয়সা খরচ করতে না শিখলে ভবিষ্যতে সে গোলযোগে পড়বে। যে শিশু মায়ের পছন্দমত সব সময় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে পরে তার নিজের রুচি বা পছন্দ বলতে কিছু থাকে না।

অতএব শিশুর অপপ্রতিযোজনের জন্য সব থেকে দায়ী কে? শিশু যে প্রতিযোজনে অক্ষম হয় তার কারণ সে নিজে নয়, তার পিতামাতা।

কার্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা (Need for achievement):—শিশুর আর একটি প্রধান প্রয়োজন হ'ল কার্য্যসাধনের প্রয়োজন। সে অনুভব করতে চায় যে সে কিছু করতে পারে এবং সেই কাজের কিছু দাম আছে—শিশু তার ক্ষমতানুযায়ী কাজ করতে পারে তার মধ্যে থেকে তাকে সন্তুষ্ট হতে হবে; কাজটি করার পর সে মনে আনন্দ লাভ করবে। জড়ধী বা অল্পধী শিশুরা এইরূপ আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। সে সমবয়সীদের সঙ্গে কাজ করে কখনও জয়লাভ করতে পারে না। সে কঠোর পরিশ্রম করে, তবুও দেখে অন্যে তার চেয়ে ভালো করতে পারে। সে নিরুৎসাহ হয় এবং আর চেষ্টা করে না, এমনকি বিরক্তিজনক ব্যবহার করতে শুরু করে। মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে এই সমস্ত ছেলেদের তুলনা বর্জ্জন করে তাকে তার কাজের জন্য

উৎসাহ দেওয়া দরকার। অনেক ছেলেমেয়ে হয়ত পড়াশোনা ভালো পারে না কিন্তু গান, কলা, সাহিত্যে বিশেষ দক্ষতা রাখে। কিন্তু দেখা যায় সমাজে তারা তাদের কাজের জন্য খুব বেশী প্রশংসা পায় না। অথচ যে ছেলে খেলাধূলায় ভাল সে যশলাভ করে। সমাজে সব কাজের সমান মূল্য না থাকার জন্য কোন কোন ব্যক্তি তাদের কাজে অন্যের থেকে বেশী আনন্দলাভ করে।

চিকিৎসা (Clinical procedure)

যখন প্রতিযোজনে অক্ষম কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়, তখন দুভাবে চিকিৎসা চলে। একদিকে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়, তার পরিবেশও সমাজের খবর নেওয়া হয় অপরদিকে ব্যক্তিকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়।

(১) **সামাজিক ইতিহাস** (Social case history) :—মনোচিকিৎসকের দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। এর জন্য ব্যক্তির পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-বন্ধু, ক্লাবের নেতা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মনোচিকিৎসক সাক্ষাৎ (interview) করেন। শিশুর স্বাস্থ্য, বিদ্যালয় এবং কার্য্য সম্পাদনের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। তার বাড়ী, পরিবারের খবর সংগ্রহ করতে হয়।

(২) **দৈহিক পরীক্ষা** (Physical Examination) :—একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এরপর ব্যক্তির দৈহিক পরীক্ষা করেন। তার দেহ নীরোগ অথবা কোন রোগ আছে কিনা দেখা হয়।

(৩) **মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা** (Psychological Examination) :—মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিগত অভিক্ষা প্রয়োগ করে ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা হয়। মনোবিজ্ঞানীরা একটিমাত্র অভিক্ষা কখনও প্রয়োগ করেন না। তাঁরা ভাষা-মূলক অভিক্ষার সঙ্গে কৃতি অভিক্ষাও প্রয়োগ করেন। ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করে দেখা হয় তার অপপ্রতিযোজন বুদ্ধির অভাবের জন্য কিনা!

(৪) **সাক্ষাৎকার** (Interview) :—রোগীর সঙ্গে এরপর মনোচিকিৎসক (Psychiatrist) সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য (rapport) স্থাপন করেন। তারপর তিনি আস্তে আস্তে রোগীর মনের খবর জেনে নিতে চেষ্টা করেন। একবারের সাক্ষাতে ইহা সম্ভব হয় না, বহু সাক্ষাৎকারের পর

রোগী যখন বুঝতে পারে—একজন তার কথা শুনতে আগ্রহী, এবং তার কথার মূল্য আছে তখনই সে মন খুলে কথা বলে।

(৫) **বিশেষজ্ঞদের সভা** (Staff conference) :—চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রোগীকে পরীক্ষা করেন, ইতিহাস সংগ্রহ করেন। এইজন্য বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রোগ নির্ণয় করেন। তাঁরা এইভাবে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করেন।

(Theraputic Procedure) :—অপপ্রতিযোজন দূর করার জন্য পরিবেশের পরিবর্ত্তন করা দরকার। পরিবেশের মধ্যে পিতামাতা ও শিক্ষকেরই মনোভাবের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বেশী। পিতার অপপ্রতিযোজন সন্তানে বর্ত্তিত হয়ে থাকলে পিতারও চিকিৎসার দরকার। শিশুর মানসিক শক্তিকে পিতার মেনে নেওয়া উচিত। যে শিশু বুদ্ধির অভাবে অপপ্রতিযোজন করে, পিতার উচিত নয় তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা।

শুধু পিতামাতা নয় সন্তানের নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্ত্তন দরকার।

সমস্যামূলক আচরণ (Behaviour Problems) :—বিদ্যালয়ে শিক্ষককে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সব শিশু সেখানে স্বাভাবিক আচরণ করে না। বিভিন্ন শিশুর ব্যবহারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা মূলক এই সব শিশুকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) অনগ্রসর শিশু (Backward children), (২) সমস্যামূলক শিশু (Problem children) (৩) অপরাধপ্রবণ শিশু (Delinquent children)।

অনগ্রসর শিশু (Backward children) :—অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যালয়ে অনেক শিশু লেখাপড়া আদৌ করে না; এবং পড়াশোনায় মন না থাকায় ক্লাসে গোলমাল ইত্যাদি নানারূপ অবাঞ্ছিত আচরণ করে। সাধারণতঃ দেখা যায় বুদ্ধির অভাব এই অনগ্রসরতার কারণ। কিন্তু বুদ্ধির অভাব ছাড়াও অনগ্রসরতা দেখা যায়। পারিবারিক কারণ, দৈহিক অসুস্থতা ইত্যাদি নানা কারণে শিশু পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকতে পারে।

সমস্যামূলক শিশু (Problem children) :—এই সব শিশু যে সব সময় পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে তা নয়। কিন্তু এদের আচরণের মধ্যে

অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়। শিশু বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায়, সহপাঠীদের খাতা, বই পয়সা চুরি করে, অথবা মিথ্যা কথা বলে, শিক্ষকের মুখে মুখে উত্তর দেয়; অবাধ্য হয়; একগুঁয়েমি দেখায়; ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে ইত্যাদি।

নিম্নশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণী থেকে এক হাজার শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মধ্যে ১০ জন মানসিক অভাবগ্রস্থ, ২০ থেকে ৩০ জন স্বাভাবিক বুদ্ধির কাছাকাছি, ১৫০—২০০ কিছুটা অনগ্রসর, পড়াশোনায় পেছিয়ে আছে। দশ থেকে তিরিশ জনের আচরণে সমস্যা দেখা দেয়, যেমন প্রবঞ্চনা, আবেগমূলক অস্থিরতা, নির্ভরতা শূন্যতা বা স্বাধীনচেতা, অমনোযোগ, বিদ্রোহ, একগুঁয়েমি, ফিসফিস করে গল্প করা, ঈর্ষা, সন্দেহ প্রবণতা, ভীতি, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা ভাষণ, কলহপ্রবণতা, বিদ্যালয় থেকে পলায়ন, অশিষ্টতা প্রভৃতি। ১০ থেকে ২০ জন স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত: পঞ্চাশ বা আরও কিছু বেশী জনের বাচনভঙ্গীতে ত্রুটি দেখা যায়। তিনশ থেকে পাঁচশ ছেলেমেয়ের মধ্যে আবেগমূলক ও ব্যক্তিত্বমূলক সমস্যা দেখা যায় যেমন ভয়, আতঙ্ক, ভীরুতা, নিরাপত্তাবোধহীনতা, আবেগমূলকদ্বন্দ্ব, সন্দেহ, অপরাধ বোধ, অযোগ্যতা, ব্যর্থতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অবদমন, পশ্চাদমুখীতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি।

আবার দেহগত দুর্ব্বলতার জন্যও অনেক সময় শিশু অস্বাভাবিক আচরণ করে। উপরের এক হাজার শিশুর মধ্যে ৩০—৪০ জন রক্তহীনতা এবং স্বাভাবিক পুষ্টির অভাবজনিত দুর্ব্বলতারোগে ভোগে, পনর জন বধির এবং বহু শিশুর দৃষ্টি শক্তির ত্রুটি দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

কিন্তু শুধু মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতা নয়, প্রতিভাবান শিশুরাও সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমস্যামূলক আচরণের কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।—(১) দৈহিক ত্রুটি, (২) মানসিক ত্রুটি আবেগগত ত্রুটি (৩) পরিবেশ বা সমাজের ত্রুটি।

বিদ্যালয় ও পরিবারকে নিয়েই শিশুর বৃহত্তম সমাজ। বিদ্যালয়ে শিশু ঠিক মত উপযোজন করতে পারে না, শিক্ষকের পড়া শুনতে ভালো লাগে না। পরীক্ষা, পুরস্কার, শাস্তি সমালোচনা, ক্লাসে উঠতে না পারা প্রভৃতি নানাকারণে শিশু সমস্যামূলক আচরণ করে। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে ব্যর্থ শিশু, পুরস্কার

প্রশংসা বঞ্চিত শিশু সব সময় শিক্ষক অথবা ভালো ছেলেদের সমালোচনা ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হন। এই সব কারণে শিশুমন পীড়িত হয় এবং অনুভূতি প্রবণ হয়। তাদের মনে অসন্তোষ, নৈরাশ্য, ভীরুতা, হীনমন্যতা, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব, নিরুৎসাহ, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি দেখা দেয়। এইসব মানসিক নৈরাশ্য, অসন্তোষ প্রভৃতির পীড়া থেকে মুক্তি লাভের জন্য শিশুও অনেক সময় নানাভাবে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিযোজনের চেষ্টা করে। যেমন চতুর ছলনাপূর্ণ ব্যবহার (Evasiveness), প্রবঞ্চনা, যুক্তীকরণ, অন্যের ওপর দোষারোপ, অপরের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি।

অতএব দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ে প্রতিযোজনে অক্ষম শিশু শিক্ষকের কাছে পিতামাতার কাছে এবং শেষে সমাজের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সব শিশুই বড হলে চোর, ডাকাত প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং নানা ভাবে সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়।

শিশুর সমস্যামূলক আচরণের প্রতিকার (Remedies of Problem behaviour of children) :—(১) সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার :—বিদ্যামন্দিরে এবং গৃহে সর্ব্বত্রই শিশুর অধিকার আছে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার লাভ করবার। প্রত্যেক শিশুকে বুঝে, তার ক্ষমতা জেনে নিয়ে শিক্ষকের অগ্রসর হওয়া উচিত।

(২) **অস্বাভাবিক শিশুদেরও স্বাভাবিক শিশুদের ন্যায় সমান অধিকার আছে** ঃ—অস্বাভাবিক শিশুদের অধিকার হয়ত আরো বেশী, কারণ স্বাভাবিক শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিলেও তাদের সুস্থ পরিবর্দ্ধন সম্ভব। কিন্তু অস্বাভাবিক শিশুদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অধিক।

(৩) শিক্ষকের যোগ্যতা :—শিক্ষককে এই সব শিশুর সুস্থ পরিবর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। শুধু বিষয় শিক্ষাদান করলেই হবে না, শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হবে। বিষয় শিক্ষাদান অপেক্ষাও শিক্ষকের বেশী প্রয়োজন শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। প্রত্যেক শিক্ষককে জানতে হবে শিশু কেন অপপ্রতিযোজন করে, মানসিক স্বাস্থ্য কি, শিশুর বর্দ্ধন হয় কিভাবে। অক্ষম শিশুদের মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি তার জানা থাকবে।

(৪) অত্যধিক অস্বাভাবিক শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা :—শুধু সহরে নয়, দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অস্বাভাবিক শিশুরা এই সব বিদ্যালয়ে পড়বে :

(১) মানসিক অভাবগ্রস্থ—যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৩৫—৬৫ এর মধ্যে তাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং হাতে কলমে শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে।

(২) অনগ্রসর শিশু যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৬৫—৮৫। এদেরও পাঠ্য বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকবে এদের ভাষার ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকে বেশী নজর দিতে হবে।

(৩) **কঠিন সমস্যামূলক শিশু** (Difficult Behaviour cases) :—অপপ্রতিযোজনের কারণ আবিষ্কার ও অপসারণ করলে দেখা যায় বেশীর ভাগ শিশুই সন্তোষজনক ব্যবহার করে।

(৪) **বচনভঙ্গির ত্রুটিযুক্ত শিশু** (Children with speech defects) :—তোতলামি, অস্ফুটকথন, ব্যঞ্জনবর্ণের অপরিস্ফূট উচ্চারণ, উচ্চারনের জড়তা, যান্ত্রিক গোলযোগ, কণ্ঠস্বরের সমস্যা যেমন কর্কশস্বর, অনুনাসিক স্বর প্রভৃতির জন্য বিশেষ বাক্ চিকিৎসার দরকার।

(৫) **শ্রবণের ত্রুটিযুক্ত ও বধির শিশুঃ**—বধির শিশুর জন্য অডিওমিটার স্ক্রীনিং টেষ্টিং (audiometer screening testing) করে নিয়ে চিকিৎসকের সাহায্যে বধিরতা চিকিৎসা করতে হবে।

(৬) **দৃষ্টির ত্রুটিঃ**—যে সমস্ত শিশুর দৃষ্টির ত্রুটি চশমাতেও সারেনা বা যারা চোখের নানা অসুখে ভুগছে তাদের উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে বসতে দিতে হয়। বাইরের থেকে আলো যেন তাদের চোখে না পড়ে; ধূসর সবুজ বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। বড় অক্ষরে ছাপা বই; ঘি রং এর কাগজ এবং খুব কালো পেন্সিল তারা ব্যবহার করবে।

(৭) **অন্ধ শিশু** (Blind children) :—অন্ধ শিশুদের জন্য পৃথক বিদ্যায়তন আছে। সেখানে বিশেষ উপায়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রেল স্লেটের (Braille) সাহায্যে তাদের লেখাপড়া শেখানো হয়।

(orthopedic cases) :—যে সমস্ত শিশুর পেশী, অস্থি ও অস্থি-গ্রন্থি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে না তাদের জন্য বিশেষ ক্লাস আছে যেখানে তাদের

চিকিৎসা করা হয় যেমন পেশীর ব্যায়াম, মর্দন (masage) অতি বেগুনি রশ্মি (ultra-violet Ray) প্রভৃতি প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে।

(৭) যে সমস্ত শিশু রুগ্ন, রক্তহীনতা-রোগে ভুগছে বা সদ্য অসুখ থেকে উঠে স্কুলে এসেছে তাদের জন্য এমন কক্ষ বেছে নিতে হবে যেখানে যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করে। মাঝে মাঝে তাদের পুষ্টির জন্য খাদ্যও বিশ্রাম দিতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাসগুলি শেখাতে হবে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হবে।

এইভাবে আমাদের সমাজে যে সব শিশু কোন না কোনদিক থেকে অসুস্থ তাদের সাহায্য করতে হবে। যথেষ্ট যত্ন ও সাহায্য পেলে তারা বুঝবে বিদ্যালয় বা সমাজ কোথাও তারা অবহেলিত নয়, তখনই তাদের মন সুস্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

পিতামাতার সহিত শিশুর সম্পর্ক ও শিশু মানসিক স্বাস্থ্যে তার প্রভাব (Parent child relationship and its effects on Mental Health of the child.

পিতামাতার স্নেহে ভালবাসায়, যত্নে শিশু পালিত হয়। মা বাবার যত্ন আদর প্রায় সব শিশুই লাভ করে। তাই পিতামাতার প্রভাব শিশুর জীবনে অপরিসীম। এইজন্য অস্বাভাবিক শিশু চিকিৎসায় মনোচিকিৎসক পিতামাতাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

শিশুকে লালন করার সময়ে পিতামাতা জ্ঞাতসারে ভুল শিক্ষা দেন না কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁদের অজ্ঞাতসারেই শিশুকে প্রভাবিত করে। মানসিক বিকারগ্রস্থ বা স্নায়ু দৌর্ব্বল্যগ্রস্থ পিতামাতার সন্তানও স্নায়ু দৌর্ব্বল্যে ভোগে। বাবা মার ভয়, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বাবা মার পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতি সব কিছুই তাঁদের অজ্ঞাতসারে শিশু গ্রহণ করে। তাঁদের ব্যবহার অনুকরণ করে। পিতামাতার মনে দ্বন্দ্ব থাকলে শিশুর মনেও সেই দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়। মনে কর কোন পিতামাতার মনে সামাজিক হীনমন্যতা আছে, শিশুর মনে সেই হীনমন্যতা সঞ্চারিত হবে। শিশু সাধারণত পিতামাতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে। পিতামাতার ক্ষতিপূরণ (compensatien) জনিত ব্যবহারগুলিরও অনুকরণ করে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। শিশুর মনের এই দ্বন্দ্ব থেকে সে সমাজবিরোধী আচরণ করতে পারে।

পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত শিশু নিরাপত্তার অভাব (insecurity) বোধ করে। পূর্ব্বে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সে যদি মনে করে যে সে অবাঞ্ছিত বা অবহেলিত তাহলে তার মনে নিরাপত্তার অভাবের বোধ জন্মায়। এবং শিশু নিজেকে অসহায় মনে করে। এই বোধ থেকে তার মনে মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; তার কাজে আগ্রহ, উৎসাহ চলে যায়। ভয়ে, লজ্জায় সে নিজের সঙ্গে নিজে মিশে থাকে; সমাজে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও স্বাভাবিক আচরণ করে না। হীনমন্যতা বোধ করে।

এই-সব শিশু হয় ভীরু, সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে পিতামাতার আদর ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার শিশুর জীবনে একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু অতিরিক্ত আদর আবার ক্ষতিও করে। অনেক সময় দেখা যায় অতিরিক্ত আদরে শিশু একগুঁয়ে, জেদী হয়ে পড়ে এবং যখন তখন অহেতুক বায়না করে। প্রার্থিত বস্তু না পেলে শিশু ক্রুদ্ধ হয়, হাত পা ছুঁড়ে, জিনিষপত্র ছুঁড়ে ক্রোধ প্রকাশ করে, এমন কি অনেক সময় অহেতুক বায়না করে কাঁদে। এইসব শিশু সাধারণতঃ হিষ্টিরিয়া (Hysieria) প্রভৃতি রোগ ভোগে। অনেক সময় অতিরিক্ত আদরের ফলে শিশু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজনে অক্ষম হয় এবং সমস্যামূলক আচরণ করে। অতএব পিতামাতার অতিরিক্ত আদরও শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর।

অনেক পিতামাতা শিশুকে অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেন। শিশুর স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না, তার চলায় বলায় প্রত্যেকটি আচরণের পেছনে থাকে বাবা মার চোখ। তাঁরা শিশুকে কিছুতেই বড় বলে ভাবতে পারেন না এবং তারা যে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারে স্বীকার করেন না। এই সব শিশু কোনদিনই আত্মনির্ভর হতে পারে না; বয়সকালে তারা সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না। কোনরূপ দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা তাদের থাকে না; সারা জীবন অন্যের উপর নির্ভর করে থাকে। শৈশব থেকে পিতামাতার শিশুকে যথাসম্ভব তার নিজের কাজ নিজে করতে দেওয়া ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতা অনুযায়ী ছোটখাট দায়িত্বপূর্ণ দু-একটি কাজ দেওয়া দরকার। এই সব কাজ করতে সক্ষম হলে শিশু মনে আত্মবিশ্বাস আসবে এবং ভবিষ্যতে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

পিতামাতার কড়া শাসনও শিশুর পক্ষে শুভ নয়। শিশুকে দোষ-ত্রুটির জন্য অতিরিক্ত শাসন করলে শিশুর মধ্যে দুরকম আচরণ দেখা যায়। হয় এই সব শিশু অপপ্রতিযোজন করবে নতুবা বিদ্রোহ করবে। বিশেষ করে বয়োঃসন্ধিকালে পিতামাতার অনুশাসন, বকুনি প্রভৃতি শিশুকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। এই সব বিদ্রোহী শিশু তখন সমাজবিরোধী আচরণ করে। যে শিশু পিতামাতার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে না, সে নিজের মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পরে হীনমন্যতা প্রভৃতি রোগে ভোগে।

শিশুর নিরাপত্তা বোধের জন্য পিতামাতার মধ্যে সদ্ভাব থাকা দরকার। পিতামাতার মধ্যে কলহ লেগে থাকলে সাধারণতঃ শিশু একপাশে সরে যায় এবং অসহায় বোধ করে।

শিশু অত্যন্ত বেশী অনুকরণ প্রিয়। পিতামাতার আচরণ পিতামাতার নিজেরও অজ্ঞাতসারে সে অনুকরণ করে থাকে। পিতামাতা যদি পরস্পর বিরোধী আচরণ করেন, তাহলে সেগুলি শিশুর মনেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। পিতামাতা শিক্ষা দিচ্ছেন মিথ্যা কথা বোল না অথচ শিশু দেখে তাঁরা নিজেরা মিথ্যা আচরণ করছেন। পিতামাতার জীবনযাত্রা প্রণালী, তাঁদের অভ্যাস, আচরণ প্রত্যেকটি শিশু অনুসরণ করে। পিতামাতার সু-অভ্যাস না থাকলে শিশু সু-অভ্যাস গঠন করতে পারে না।

শিশুর মনে বহু প্রকার চাহিদা থাকে। সম্ভাব্য প্রার্থিত বস্তু তাকে না দিলে তার মনে অপূর্ণতার ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়। অনেক মা শিশুর খেলনাটি পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে আলমারীতে সাজিয়ে রাখেন। এরূপ বঞ্চনা শিশুকে আঘাত করে। অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ শিশু নিজের মধ্যে সহ্য করে এবং অন্যভাবে বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। দিবাস্বপ্নে, স্বপ্নে, ভাববিলাসে কল্পনায় শিশু এইসব প্রার্থিত বস্তু লাভ করে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করে এবং পরে দেখা যায় তারা স্বাভাবিক ও সুস্থ আচরণ করতে পারে না।

পিতামাতার মনে কোন অহেতুক ভয় বা আতঙ্ক থাকলে শিশুর মনেও তা সঞ্চারিত হয়। পিতামাতার স্নায়ু-দৌর্বল্য, মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রভৃতি থাকলে শিশুরও ঐ সমস্ত রোগ হয়।

গৃহের শৃঙ্খলা শিশুর চরিত্র গঠনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। গৃহের

শৃঙ্খলা যদি কঠোর হয় তাহলে শিশুর আচরণে অপসঙ্গতি দেখা যায় আবার যে গৃহে শৃঙ্খলা আদৌ নেই, সে গৃহের শিশুও সুস্থ স্বাভাবিক আচরণ করে না। অতিরিক্ত স্বাধীনতা তাদের সুপথে পরিচালিত করতে পারে না, তাদের ব্যবহার এইজন্য অস্বাভাবিক হয়।

আবার অনিয়মিত শৃঙ্খলা (Erratic discipline) শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। অনেক সময় পিতামাতা কঠোর মনোভাব নিয়ে শিশুকে শাসন করেন, পরে আবার তারাই শিশুর শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী আচরণের প্রতি উদাসীন থাকেন। ফলে শিশুর মানসিক স্থিরতা নষ্ট হয় এবং তার আবেগে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একই ব্যবহারে কখনও শাসন আবার কখনও আদর শিশু ঠিক বুঝতে পারে না, এবং তার মানসিক চিন্তা বিপর্য্যস্ত হয়।

প্রাক্ বিদ্যালয়ের শিশুদের আচরণের সমস্যা (Behaviour Problems of the Pre-school child)

বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সব সমস্যামূলক আচরণ করে সেগুলি নিয়ে দেওয়া হ'ল।

(১) খাদ্য সমস্যা (food probiem) :—খাদ্য পছন্দ ও অপছন্দ নিয়ে শিশুদের আচরণে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। খাদ্য গ্রহণ না করলে শিশু দেখে পিতামাতাকে জব্দ করা যায় এবং মা নানাভাবে তাকে খাওয়াতে চেষ্টা করে। সাধারণত খাবার না খাওয়া এবং আস্তে খাওয়া শিশুর আচরণে এই দুটি সমস্যাই বেশী দেখা যায়। এ ছাড়া আছে খাবার পর বমন-করা; মুখে খাবার নিয়ে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। শিশুর এই আচরণের কারণ কি? শিশু দেখে খাদ্য গ্রহণ না করলে একদিকে পিতামাতা যেমন বিরক্ত হ'ন, অপরদিকে তাঁরা আবার খাওয়াবার চেষ্টাও করেন। কারণ শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁরা সর্ব্বদা সচেতন। শিশু পিতামাতার এই উদ্বেগ্‌টি ধরে ফেলে, এবং একদিকে পিতামাতাকে জব্দ করা এবং অপরদিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে অনুরূপ আচরণ করে থাকে।

(২) **অহেতুক মেজাজ ও নঞর্থক আচরণ** (Temper Tantrum and Negativism) :—শিশু যখন বোঝে যে সে ক্রুদ্ধ হলে প্রার্থিত বস্তু পাবে, তখন সে নানারূপ মেজাজ দেখায়; কখনও চীৎকার করে, মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, লাথি মারে ইত্যাদি। শিশু লক্ষ্য করে পিতামাতা তার আচরণে

অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং শিশুর প্রার্থনা পূরণ করেন। একবার জয়লাভ করার পর শিশু বারবার অনুরূপ-আচরণ করে। বড় হলে যদিও শিশু অনুরূপ আচরণ আর করে না কিন্তু তার শৈশবের এই আচরণ তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত হতে দেয় না।

(৩) **যৌন অভ্যাস** (sex habits) :—পিতামাতার অসতর্কতা বশতঃ অথবা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখে শিশু নানারূপ অশ্লীল আচরণ করে, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

(৪) বুড়ো আঙ্গুল চোষা অথবা দাঁত দিয়ে নখ কাটা (phermb sucking or nail biting) :—এই অভ্যাস সাধারণতঃ বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে চলে যায়।

(৫) **কলহপরায়ণতা** (Pugnacious) :—পিতামাতার অত্যধিক আদর থেকে শিশুর এরূপ অভ্যাস হয়। অতিরিক্ত আদরে মানুষ হওয়ার জন্য শিশু বুঝতে পারে না কেন তার কাজে বাধা দেওয়া হবে বা কেন সে যা চাইবে তা পাবে না। এর ফলে সে বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের দমন করতে চায় এবং তাদের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে পারে না।

বুদ্ধি ও সমস্যামূলক আচরণ (Intelligence and Behaviour problems) :—অতীতে বিদ্যালয়ে ব্যর্থতা অথবা শিশুর অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের মূলে বুদ্ধিহীনতা আছে বলে ধরে নেওয়া হত। ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধ প্রবণতার প্রধান কারণ বলে মনে করা হত। ১৯২১ সালে বলা হয়েছিল যে শতকরা ৯৩ ভাগ শিশুর অপসঙ্গতির কারণ হ'ল ক্ষীণবুদ্ধি।

সিরিল বার্ট (Cyril Burt) বিশ্বাস করেন যে শতকরা মাত্র ৮ জন শিশু ক্ষীণ বুদ্ধির জন্য অপপ্রতিযোজন করে থাকে। তিনি বললেন যারা জড়ধী তারা বুদ্ধির অভাবের জন্যই সমস্যার সৃষ্টি করে না। একজন ভাল মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যও যথেষ্ট বুদ্ধির দরকার হয়। অন্যান্য সমস্যামূলক আচরণের জন্যও বুদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। বাড়ী থেকে অথবা বিদ্যালয় থেকে পলায়ন করা এবং এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান প্রভৃতি আচরণ করে সাধারণতঃ ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেরা। অপর দিকে যে সমস্ত ছেলের সমস্যামূলক আচরণের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে তাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক থাকে। সমস্যামূলক আচরণের মূলে বুদ্ধির অংশ খুব সামান্যই।

ক্ষীণবুদ্ধি সমস্যামূলক আচরণের মূল কারণ বলে যে ধারণা ছিল তারও কারণ ছিল। স্লসন (slawson) দেখিয়ে দিলেন যে বুদ্ধির উপাদানকে অনেক সময় আমরা শিশুর সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। সমাজের নিম্নশ্রেণীতে বেশীর ভাগ ক্ষীণবুদ্ধি শিশুর জন্ম হয়; এবং যেহেতু নিম্নশ্রেণীতেই বেশীর ভাগ অপরাধপ্রবণ শিশু জন্মায়; সেইজন্য ধরে নেওয়া হয় যে ক্ষীণবুদ্ধিই অপরাধ প্রবণতার কারণ।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is meant by the concept of Mental health ?

মানসিক স্বাস্থ্য বলিতে কি বোঝায় ?

2. What is Maladjustment ? What are the causes of Maladjustment of children ?

অপপ্রতিযোজন কাহাকে বলে ? শিশুর অপপ্রতিযোজনের কারণগুলি কি ?

3. What are the Compensatory Behaviour of children ?

শিশুর ক্ষতিপূরণ জনিত ব্যবহার গুলি কি ?

4. What are the Behaviour Problems of children what are the causes Behind them ?

শিশুর সমস্যামূলক আচরণ বলতে কি বোঝায় ? সমস্যামূলক আচরণের কারণ কি ?

5. What are the Remedies of problem Behaviour of children ?

সমস্যামূলক আচরণের প্রতিকার কি ?

6. Explain the role of influences of parents upon their children.

শিশুর উপর পিতামাতার প্রভাব কতখানি বর্ণনা কর।

7. Write short notes on :—

Rationalisation, Projection, Temper Tantrum, Intelligence and Behaviour problem, need for security, clinical procedure.

যুক্তিকরণ, অন্যের ওপর দোষারোপ, অহেতুকী মেজাজ, বুদ্ধি ও সমস্যামূলক আচরণ, নিরাপত্তার চাহিদা, চিকিৎসা-পদ্ধতি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বুদ্ধির অভিজ্ঞা

বুদ্ধির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and nature of Intelligence) :—বুদ্ধি একটি মৌলিক গুণ এর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন। কোন কার্য্য সম্পাদন করার সময় আমরা যে শক্তিকে প্রয়োগ করি তাকেই আমরা বলব বুদ্ধি।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। উডওয়ার্থ, ওয়েল্‌স প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ বলেছেন—বর্হিপ্রকৃতিতে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধানে বুদ্ধি কাজে লাগে। আর একদল মনবিদ বললেন বুদ্ধি হল জ্ঞান লাভের ক্ষমতা বা শিক্ষালাভের ক্ষমতা। টারম্যান প্রভৃতির মতে বুদ্ধি হল অমূর্ত্ত (abstract) চিন্তা করবার ক্ষমতা। আবার আর একদল বললেন আমাদের কাজের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই বুদ্ধি। বহু মনোবিজ্ঞানী এইভাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন, কিন্তু কোন সংজ্ঞাই ত্রুটিপূর্ণ নয় এক কথায় বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় না। সেইজন্য বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্টাগুলি আলোচনা করে আমরা বুদ্ধির প্রকৃতি নির্ণয় করব।

(১) বাহ্য প্রকৃতির নূতন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। অতীতে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধি নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করে।

(২) বুদ্ধি হল একটি মৌলিক শক্তি যা আমাদের কার্য সম্পাদনের সময় দরকার হয়।

(৩) বুদ্ধির দ্বারাই আমরা অমূর্ত্ত বস্তুর চিন্তা করতে পারি। বুদ্ধি কাজে লাগাবার সময় আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে।

(৪) বুদ্ধি হল বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা চিন্তার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা। কোন সমস্যা সমাধানের সময় সেই সমস্যার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করা প্রয়োজন। বুদ্ধি এই সম্বন্ধ নিরূপণ করে।

(৫) বুদ্ধি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

অতীতে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতাই হ'ল বুদ্ধি।

(৬) বুদ্ধির সঙ্গে দ্রুত কাজ করার বা চিন্তা করার সম্বন্ধ আছে। যে ব্যক্তি যত দ্রুত কার্য সম্পাদন করতে পারে বা মানসিক চিন্তা করতে পারে তার বুদ্ধি তত বেশী।

(৭) বুদ্ধি স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভর করে এবং নিউরোণের পারস্পরিক সামঞ্জস্য সাধন ও সংযোগ সাধনের উপরই ইহা নির্ভরশীল।

বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of Intelligence)

(১) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's Two factor Theory):—স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির সাধারণ সংজ্ঞা না দিয়ে বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণে মন দিলেন। স্পীয়ারম্যান বললেন বুদ্ধির উপাদান দুইটি—একটি হল সাধারণ উপাদান (general ability) বা (G), অপরটি হল বিশেষ উপাদান (spacial ability) বা (S)। স্পীয়ারম্যান বুদ্ধির দুইটি উপাদানের কথা বলেছেন বলে তাঁর তত্ত্বকে বলা হয় দ্বি-উপাদান তত্ত্ব। সাধারণ বুদ্ধি সব কাজের জন্য প্রয়োজন হয়, আর বিশেষ বুদ্ধি বিশেষ কাজের জন্য দরকার হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে আমাদের সব কাজ করার সময়ই সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং বিশেষ কাজ করার সময় সেই কাজ করার জন্য বিশেষ বুদ্ধির দরকার হয়। যেমন একটি সূচি শিল্প করার সময় সাধারণ বুদ্ধি বলে ব্যক্তি স্থির করে কোন সেলাই দিয়ে, কি সুতো দিয়ে করলে কাজটি ভাল হবে, বিশেষ বুদ্ধি হ'ল সূচী শিল্পের বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগানো। অঙ্ক করার সময় সাধারণ বুদ্ধি হ'ল সমস্যাটি বুঝে কিভাবে করতে হবে চিন্তা করা ও উপায় আবিষ্কার করার ক্ষমতা, বিশেষ বুদ্ধি বলে ব্যক্তি অঙ্কটি কষবে।

স্পীয়ারম্যানের মতবাদের বহু সমালোচনা হয়েছে। তিনি নিজেও পরে স্বীকার করেছিলেন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার সময় সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ বুদ্ধি ছাড়াও প্রয়োগ করার জন্য বুদ্ধির দরকার হয় (Practical factor)। যে সব ক্ষেত্রে ভাবার দরকার হয়, সেই সব ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমতা, বিশেষ

ক্ষমতা ছাড়াও ভাষার ক্ষমতার দরকার হয়। এই প্রসঙ্গে থার্স্টোনের মতবাদ উল্লেখযোগ্য।

থার্স্টোনের মতবাদ (Theory of Thurstone)

অভিক্ষার উপাদান বিশ্লেষণ (Factor analysis) করে বললেন বুদ্ধির সাতটি উপাদান আছে। কিন্তু উপাদান বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায় তা আগে বলা দরকার। মনে কর ৬টি অভিক্ষা নিয়ে একদল ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা করা হ'ল। পরীক্ষার স্কোরগুলির মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের মান নির্ণয় করে দেখা গেল তিনটি অভিক্ষার মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের মান খুব বেশী, এই তিনটিও অন্ত তিনটির মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের মান খুব কম কিন্তু শেষের তিনটির মধ্যে আবার সহপরিবর্ত্তন খুব বেশী। এখন আমরা সহপরিবর্ত্তনের মান নির্ণয় করে ৬টি অভিক্ষাকে দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একে বলে উপাদান বিশ্লেষণ। উপাদান বিশ্লেষণ করে এইভাবে অনেকগুলি অভিক্ষাকে কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়।

বহু মনীষী অভিক্ষার উপাদান বিশ্লেষণে মন দিলেন। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রে থার্স্টোন এ বিষয়ে বহু গবেষণা করলেন। তিনি প্রায় বারটি অভিক্ষা বিত্থালয়ের ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করে সাতটি উপাদান (factor) পেলেন প্রত্যেকটি উপাদান দ্বারা অনেকগুলি সহপরিবর্ত্তনকে বোঝান হল। তাঁর সাতটি উপাদানের কথা নীচে বলা হল :—

(১) ভাষার বোধ (Verbal Comprehension—V)—শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা ও বোঝার ক্ষমতা।

(২) অবাধ ভাষণ (Word fluency—W)—দ্রুত অবাধ ভাষণ বুঝতে পারা অথবা ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল সমাধান করা (Crossword Puzzles)।

(৩) সংখ্যা (Number—N) গাণিতিক সমাস্যার সমাধানের ক্ষমতা।

(৪) স্থান (Space—S)—স্মৃতির থেকে একটি নক্সা আঁকা অথবা পারস্পরিক সম্বন্ধ দর্শনের ক্ষমতা।

(৫) স্মৃতি (Memory—M)—মুখস্থ করা ও পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা।

(৬) উপলব্ধির ক্ষমতা (Perceptual—P)—বস্তুর সমস্তটিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করার ক্ষমতা।

(৭) . বিচার করা (Reasoning—R) :—সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করার ক্ষমতা।

এই উপাদানগুলি আবিষ্কারের সময় থার্ষ্টোন প্রত্যেকটি উপাদানের উপঅভিক্ষাগুলি চিনে রাখলেন, কারণ তিনি জানতেন কোন অভিক্ষাগুলির মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের মান বেশী এবং কোনগুলির মধ্যে কম। এর জন্য তিনি স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য অভিক্ষা প্রস্তুত করতে সমর্থ হলেন। তিনি তাঁর উপঅভিক্ষাগুলিকে আবার সাজালেন, এবং প্রত্যেকটি উপাদানের অভিক্ষাগুলিকে একসঙ্গে রাখলেন। এখন তিনি নূতন কতগুলি অভিক্ষা নিলেন—এগুলিকে বললেন মৌলিক মানসিক ক্ষমতা অভিক্ষা (Primary mental abilities)। থার্স্টোন সাতটি উপাদান আবিষ্কার করার পর বললেন বুদ্ধি অংশত কতগুলি পৃথক ক্ষমতা দিয়ে তৈরী। কিন্তু এই সাতটি উপাদানের মধ্যে সাধারণ ক্ষমতা কিছু আছে কি ?

থার্স্টোন মৌলিক মানসিক ক্ষমতা অভিক্ষা প্রয়োগ করলেন অনেকগুলি ছেলেমেয়ের ওপর। এবং সেগুলির সহপরিবর্ত্তন (Correlation) বার করলেন। যদি এই উপাদানের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি কিছু না থাকত তাহলে নিশ্চয়ই উপাদানগুলির মধ্যে সহপরিবর্ত্তন থাকত না কিন্তু দেখা গেল সহপরিবর্ত্তন আছে। কোথাও কোথাও খুব বেশী। কোথাও বা মাঝামাঝি। এর থেকে বোঝা গেল সাধারণ ক্ষমতা বলে কিছু আছে এবং থার্স্টোন বললেন মৌলিক বুদ্ধির উপাদান হ'ল কতগুলি স্বাধীন মৌলিক উপাদান এবং কতগুলি সাধারণ উপাদানের সমষ্টি।

অতএব বুদ্ধি কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় বুদ্ধি হল কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা ও কিছু সাধারণ ক্ষমতার সমন্বয়।

বুদ্ধি অভিক্ষা (Intelligence Tests)

প্রাত্যাহিক জীবনে আমরা সাধারণভাবে ব্যক্তির বুদ্ধির সম্বন্ধে ধারণা করে থাকি বাবা ছেলেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াতে চান, তার কারণ তাঁর ধারণা ছেলের বুদ্ধি আছে। জনতা রাজনীতিবিদকে ভোট দেয়, কারণ তার ধারণা অমুক রাজনীতিবিদ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু বুদ্ধি বা বিশেষ ক্ষমতার এ পরিমাপ হল স্থূল পরিমাপ।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে মনোবিদগণ বুদ্ধি পরিমাপের উপায় আবিষ্কারে মন দেন। শিক্ষাবিদ, সৈনিক নেতা এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁরা একাজে হাত দেন। অধুনা বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিমাপের অভিক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বুদ্ধির ব্যক্তিগত অভিক্ষা (Individual test of Intelligence).

বিদ্যালয়ে ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রথম বুদ্ধির অভিক্ষা আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৫ খৃঃ ফরাসী মনোবিদ **আলফ্রেড বিনে কর্ত্তৃক** (Alfred Binet) এই অভিক্ষা প্রকাশিত হয়। প্যারিসের বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে বিনে এই অভিক্ষা প্রস্তুত করেন। জড়ধী ছাত্র যারা স্কুলে গেলে কিছু ফললাভ করতে পারবে না তাদের বাছাই করার জন্যই বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বিনেকে অনুরোধ করেন। বহু গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপক অভিক্ষা প্রস্তুত করলেন। বিনের সহকারী সাইমন (Simon) তাহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই অভিক্ষাটি বর্ত্তমানে বিনে-সাইমন স্কেল নামে প্রসিদ্ধ।

বিনের অভিক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে তৈরী। অভিক্ষার্থীকে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় বা সমস্যার সমাধান করতে হয়।

প্রশ্নগুলি সহজ থেকে ক্রমে ক্রমে দুরূহ হয়েছে। প্রশ্নগুলি কতগুলি এককে সাজানো থাকে ; যেমন ৩ বছর বয়সের অভিক্ষাক্ষার্থীর জন্য কতগুলি প্রশ্ন নির্দিষ্ট আছে। সেইরূপ চার বছর, পাঁচ বছর থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত প্রশ্ন সাজানো থাকে ; এইজন্য এই অভিক্ষাকে বিনে-সাইমন স্কেল বলা হয়।

এই অভিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মানসিক বয়সের ব্যবহার। শিশু যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তার মানসিক বয়স হবে সেই বয়েস। ধর একটি শিশু সাত বৎসর বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নগুলি পারল, তখন তার মানসিক বয়স হবে সাত। তার আসল বয়স যদি আট হয়, তবে বুঝতে হবে তার বুদ্ধি বয়সোপযোগী নয়। আবার তার আসল বয়েস যদি ৬ হয় তাহলে বুঝতে হবে বয়েসের তুলনায় তার বুদ্ধি বেশী। এইজন্য বিনে মানসিক বয়সকে আসল বয়স দিয়ে ভাগ করে তাদের অনুপাত বার করে, সেই অনুপাতকেই বুদ্ধির পরিমাপ বলে ধরে নিলেন।

বিনে অভিক্ষার সংস্করণ (Revision of Binet Scale) :—

বিনে নিজেই তাঁর স্কেলের সংস্কার সাধন করেন। ১৯১৬ সালে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টারম্যান এই অভীক্ষার সংস্করণ করেন। স্টানফোর্ড বিনে অভীক্ষা হল ব্যক্তিগত অভীক্ষা। দুবছর থেকে ষোল বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্য এই অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। শিশুকে একের পর এক বিভিন্ন বয়সের অভীক্ষাগুলি দেওয়া হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে অভীক্ষাগুলির সমাধান করতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত যখন সে কোন একটি মানসিক বয়সের অভীক্ষার একটিও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, তখন ধরে নেওয়া হয় তার মানসিক বয়স ঐ বয়সের চেয়ে কম। সে যদি ৯ বছরের উপযোগী কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে এবং ৮ বছরের সব প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে তার মানসিক বয়য় হবে ৮। যদি ৯ বছরের অভীক্ষার অর্দ্ধেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহলে তার মানসিক বয়স হবে সাড়ে আট।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার মানসিক বয়সও বৃদ্ধি পায়। খুব বুদ্ধিমান ছেলের মানসিক বয়স আসল বয়সের চেয়ে বেশী। আবার জড়ধী ছেলের মানসিক বয়স আসল বয়সের তুলনায় কম। টারম্যান বুদ্ধি পরিমাপের জন্য তাই বুদ্ধাঙ্কের (Intelligence quotient) পরিকল্পনা করলেন।

$$\text{বুদ্ধাঙ্ক (I. Q)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{আসল বয়স}} \times ১০০$$

যদি ৮ বছরের ছেলের মানসিক বয়স ৯ হয় তাহলে তার বুদ্ধাঙ্ক হবে $\frac{৯}{৮} \times ১০০ = ১১২.৫$।

এই অভীক্ষার কিন্তু কয়েকটি ত্রুটি রয়ে গেল। প্রথমতঃ এই অভীক্ষায় ভাষার ক্ষমতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তির ভাষার জ্ঞানের অভাব এই অভীক্ষার দ্বারা তার মানসিক বয়স নির্ণয় করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই অভীক্ষায় একবারে একজনকে মাত্র পরীক্ষা করা যায়, এবং অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়া এই অভীক্ষা প্রয়োগ করতে পারে না। তৃতীয়তঃ এই অভীক্ষার দ্বারা সাধারণ মানসিক ক্ষমতা জানা যায়। বিভিন্ন বুদ্ধিমূলক ক্ষমতা জানা যায় না। চতুর্থতঃ বিনের অভীক্ষার সাহায্যে প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় না। ষোল বছরের ওপরের বয়সের জন্য কোন অভীক্ষা এতে নেই। বিনের অভীক্ষায় ষোল বছর বয়স

পর্য্যন্ত অভিক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে যোলর বেশী যাদের বয়স তাদের যোল বছর বয়েস ধরে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে ওয়েসলার বেলভিউ (Wesehsler Bellevue) এর নাম করা যেতে পারে। তিনি বয়স্কদের জন্য অভিক্ষা প্রস্তুত করেন। স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষার মত এটিও ব্যক্তিগত অভিক্ষা এবং এর ব্যবহার করতে পারে একমাত্র অভিজ্ঞ পরীক্ষক। এতে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে তার জন্য ভাষার প্রয়োজন আছে আবার কতগুলি কৃতিপরীক্ষাও (performance) এতে আছে যেগুলি ভাষার ক্ষমতার উপর নির্ভর করেনা। ওয়েসলার বেলভিউ পরীক্ষায় ভাষামূলক ও কৃতিপরীক্ষার বুদ্ধ্যঙ্ক পৃথক ভাবে নির্ণয় করা যায়। এইজন্য বিদেশী এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়। মানসিক রোগগ্রস্তদের বুদ্ধিও এই অভিক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

বুদ্ধির দলগত পরীক্ষা (Group test of Intelligence) :— হাসপাতালে ও বিদ্যালয়ে যেখানে ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়, সেখানে ব্যক্তিগত অভিক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করা সম্ভব কিন্তু এমন কতগুলি অবস্থা আছে, যেখানে দলগত অভিক্ষা দ্বারা বুদ্ধির পরীক্ষা করা দরকার হয়। সৈন্যবিভাগে যেখানে শত শত হাজার হাজার সৈন্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয় সেখানে দলগত অভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। কলেজে ভর্ত্তির সময়ও দলগত অভিক্ষার দরকার হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শত সহস্র ব্যক্তিকে চাকুরিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাদের বুদ্ধি পরিমাপের প্রয়োজনে মনোবিদগণ দলগত অভিক্ষা প্রস্তুত করেন। এর জন্য প্রথমে আর্মি অল্‌ফা টেষ্ট (Army Alpha test) তৈরী হল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আর্মি আল্‌ফা অভিক্ষার বহুবার সংশোধন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর্মি আলফা টেস্টের পুনরায় সংশোধন করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেশন টেস্ট (Army general classification test) বা সংক্ষেপে এ. জি. সি. টি (A. G. C. T)। এই অভিক্ষার চারটি আকার ছিল এবং একটি অন্যটির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলত। প্রত্যেকটি আকারের অভিক্ষার জন্য এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর সঙ্গে আরোও কয়েকটি প্রশ্ন যোগ করা হল ব্যক্তির চারপ্রকার কৃতিত্ব পরীক্ষার জন্য। সেগুলি হল—(১) ভাষাগত ক্ষমতা (Verbal ability)। (২) স্থানের বোধ (Spatial compre-

hension)। (৩) (Arithmetic computation) ও (৪) গণিতিক বিচার (Arithmetic Reasoning)। এ. জি. সি. টি. অভিক্ষাতেও স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষার মত সাধারণ বুদ্ধির গড় ধরা হত ১০০।

আর্মি আলফা ছাড়া অপর একটি দলগত অভিক্ষা তৈরী হয়েছিল। এটির নাম আর্মি বিটা টেস্ট (Army Beta test) এই অভিক্ষায় ভাষার প্রয়োজন হয় না। আর্মি আল্‌ফা অভিক্ষার প্রশ্নগুলির জন্য ভাষার দরকার হয়। আর্মি বিটা অভিক্ষায় অসম্পূর্ণ ছবি আঁকা, গোলক ধাঁধার পথ বার করা প্রভৃতি ভাষাবর্জ্জিত প্রশ্ন দেওয়া হয়।

বিনে সাইমন অভিক্ষার নমুনা নীচে দেওয়া হল।

(১) তিন বছরের শিশুর জন্য প্রশ্ন :

(ক) নাক চোখ মুখ প্রভৃতি দেখতে বলা।

(খ) দুই অঙ্কের সংখ্যা শুনে পুনরাবৃত্তি করতে বলা।

(গ) একটি ছবি দেখিয়ে তার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিতে বলা।

(ঘ) শিশুর নিজের পদবী কি বলতে বলা।

(ঙ) ছয়টি পদযুক্ত বাক্যশুনে পুনরাবৃত্তি করতে বলা।

(২) ছয় বৎসরের শিশুর জন্য প্রশ্ন :

(ক) সকাল সন্ধ্যার পার্থক্য বলতে বলা।

(খ) পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে কোন কিছুর বর্ণনা করতে বলা।

(গ) হীরকের আকৃতি নকল করতে বলা।

(ঙ) সুন্দর ও কুৎসিব ছবি পৃথক করতে বলা।

স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষার নমুনা (Stanford Binet Test) :—

পাঁচ বৎসরের শিশুর জন্য প্রশ্ন :

(থ) রঙের নাম বলতে বলা।

(গ) কতকগুলি জিনিষের মধ্যে কোনটি বেশী সুন্দর বলতে বলা।

(ঘ) কতকগুলি বস্তুর ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে সংজ্ঞা দিতে বলা।

(ঙ) দুটি ত্রিভুজ দিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে বলা।

(চ) তিনটি কাজ করতে বলা।

ভাষা বর্জ্জিত অভিক্ষা (Performance test) :—এতক্ষণ আমরা যে বুদ্ধির কথা বললাম সেগুলি দ্বারা সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব নয়; যারা নিরক্ষর বা যারা ঐ ভাষা বোঝেনা তাদের জন্য অন্য ধরণের অভীক্ষা আছে। কতগুলি মূর্ত্ত বস্তু এই অভীক্ষাগুলিতে নাড়াচাড়া করিয়ে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। সেগুলির সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল :—

(১) **আলেকজাণ্ডারের সম্পাদনী অভীক্ষা** (Alexander's Pass along test) :—এতে তিনটি কাঠের ট্রে থাকে আর কতকগুলি লাল ও নীল রংএর কাঠের টুকরো থাকে। কাঠের টুকরোর একদিকে লাল দাগ এবং অপর দিকে নীল দাগ দেওয়া থাকে। কতগুলি কার্ড থাকে, এই কার্ডে বিভিন্ন ভাবে কাঠের টুকরো সাজানোর নক্সা থাকে। নক্সার যে দিকে লাল দাগ থাকে, সে দিকে পরীক্ষক নীল কাঠের টুকরোগুলি নক্সার মত করে সাজায়; এক কথায় নক্সার মতই কাঠের ট্রেতে সব কাঠের টুকরো সাজানো হয় কেবল নক্সার নীল টুকরোগুলি ট্রের লাল দিকে থাকবে এবং লালগুলি ট্রের নীল দিকে থাকবে। অভীক্ষার্থীকে বলা হয় সে যেন নক্সার অনুরূপ ভাবে এই কাঠের টুকরো সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই অভীক্ষায় ৯টি নক্সা সমন্বিত কার্ড থাকে অভীক্ষার্থী প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করতে কত সময় নেয়, লক্ষ্য করা হয়। এবং স্কোর তালিকা দেখে তার স্কোর ঠিক করা হয়।

(২) **ফর্ম বোর্ড অভীক্ষা** (Form Boad test :—ডিয়ারবর্ণ, গডার্ড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফর্ম বোর্ড অভীক্ষার উদ্ভাবন করেন। একটা কাঠের বোর্ডে বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো রাখবার জন্য খোপ কাটা থাকে। আর ঐ সব খোপে রাখা যায় এরকম কাঠের টুকরোও থাকে। বিভিন্ন ধরণের নক্সা-সমন্বিত কার্ড থাকে। এই নক্সা অনুযায়ী অভীক্ষক বোর্ডটি সাজিয়ে নেয় এবং অভীক্ষার্থীকে বলে বোর্ডের বাইরে রাখা কাঠের টুকরোগুলি বোর্ডের কাঠ সরিয়ে স্থান করে নিয়ে যেন সে বোর্ডে রাখে। এতে লক্ষ্য করা হয় অভীক্ষার্থী নির্দ্দিষ্ট নক্সা অনুযায়ী সাজাবার জন্য কতবার কাঠের টুকরো সরিয়েছে এবং কত সময় নিয়েছে। পরে স্কোর তালিকা দেখে অভীক্ষার্থীর স্কোর ঠিক করা হয়।

এ ছাড়াও বুদ্ধি পরিমাপের জন্য অনেক অভীক্ষা আছে, যেমন কোহ'এর ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা; হিলির পাজল (Healey Puzzle), ওয়েক্সলার

বেলভিউ অভীক্ষা (Weschler Bellevus test) প্রভৃতি। ওয়েস্‌লার বেলভিউ অভীক্ষার দ্বারা ৭ বৎসর থেকে ৬০ বৎসর বয়স্কদের পর্যন্ত বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়।

(৩) **চিত্রাঙ্কন অভীক্ষা** (Picture Completion test) :—মনোবিজ্ঞানী গুডএনাফ এই অভিক্ষাটির আবিষ্কার করেন। চার থেকে দশ বছরের শিশুদের জন্য এই অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এতে অভিক্ষার্থীকে মন থেকে মানুষের একটি ছবি আঁকতে বলা হয়। ছবিটা কত সুন্দর হয়েছে তার মধ্যে কতখানি শিল্প নৈপুণ্য ফুটে ওঠেছে তা দেখা হয় না। অভিক্ষার্থী মানুষের কতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকতে পেরেছে বা ছবির মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছে দেখে নম্বর দেওয়া হয়।

(৪) **গোলক ধাঁধা** অভিক্ষা (Maze exploration test) :—এই অভিক্ষা নানা রকমের হয়ে থাকে। একটি কাগজের ওপর ধাঁধা এঁকে আভিক্ষার্থীকে বলা হয় পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম ধাঁধা পথটি এঁকে দিতে। খোলা পথ দিয়ে অভিক্ষার্থী পেন্সিল চালাবে। বন্ধ পথে যাবে না। অভিক্ষার্থী কত বার ভুল করে, এবং কত অল্প সময়ে পথটি আবিষ্কার করতে পারে দেখে নম্বর দেওয়া হয়। পোর্টিয়াস এই অভিক্ষাটি আবিষ্কার করেন ; বার থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেদের জন্য এই অভিক্ষাটি ব্যবহার করা হয়।

(৫) 'কোহ' এর ব্লক ডিজাইন অভিক্ষা (Koh's blok design) :

বুদ্ধি ও অর্জ্জিত জ্ঞানের অভিক্ষা (Intelligence and Achievement test) :—বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য যে পরীক্ষা করা হয় তাকে বলে অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Achivement test) এই পরীক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন জানা যায় ছেলেরা তাদের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান অর্জ্জন করল, অপরদিকে সেইরূপ তাদের বুদ্ধিরও পরিমাপ করা হয়।

তবে এই সব পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ ঠিক মত হয় না। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই এই পরীক্ষার প্রশ্ন সীমিত থাকে, পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত বৃহত্তর প্রকৃতির জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। মুখস্থ করে এই সব পরীক্ষায় বেশ ভাল করা যায়, অতএব যারা খুব বেশী পড়ে তারাই এতে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে কিন্তু যারা পড়ে না তাদের বুদ্ধি এর দ্বারা বুঝবার উপায় নেই।

এইরূপ পরীক্ষা দুই প্রকার :—রচনা মূলক পরীক্ষা (essay type) ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (objective type)।

রচনামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর রচনাভঙ্গি, ভাষা, বিষয়ের জ্ঞান, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করা হয়। কিন্তু এই পরীক্ষার ত্রুটিও কম নয়। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব এতে খুব বেশী। একই খাতা দেখে বিভিন্ন পরীক্ষককে বিভিন্ন নম্বর দিতে দেখা গেছে। তাছাড়া মুখস্থ করে পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বেশ ভাল ফলই করতে পারে। এসব পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতাও (Reliability) নেই।

আধুনিককালে এইজন্য নৈব্যক্তিক পরীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। নানাপ্রকারের নৈব্যক্তিক পরীক্ষা আছে। কয়েকটির নমুনা দেওয়া হল :—

(১) সত্য অথবা মিথ্যা পরীক্ষা (True or false test) :—এতে অভিক্ষার্থীকে বলা হয় ঠিক হলে হাঁ এবং ভুল হলে না এর নীচে দাগ দাও।

(ক) ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উপরে উঠা যায়, বায়ুর চাপ তত কমে। হাঁ/না।

(খ) সাইফনের কার্য্য বায়ুচাপের উপর নির্ভর করে না। হাঁ/না।

(গ) চুম্বক সকল পদার্থকেই আকর্ষন করে। হাঁ/না।

(২) উপমা অভিক্ষা (Analogy test) :—এতে প্রথম দুটি বস্তুর সাদৃশ্য দেখে পরীক্ষার্থী তৃতীয়টির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত চতুর্থ বস্তুটি লেখে।

(ক) বিড়ালের সঙ্গে ইঁদুরেব যে সম্বন্ধ বেজীর সঙ্গে——সে সম্বন্ধ।

(খ) মাটির সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ জলের সঙ্গে——সে সম্বন্ধ।

(গ) সাধুর সঙ্গে ভগবানের যে সম্বন্ধ চোরের সঙ্গে——সে সম্বন্ধ।

(৩) সমাপ্তীকরণ (Completion) অভিক্ষা :—এতে প্রশ্নটি দেওয়া থাকে, দু'একটি শব্দ যোগ করে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়।

(ক) জলের ধর্ম—

(খ) মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন—

(গ) উত্তর আমেরিকার অবিষ্কারক—

(৪) নির্ব্বাচনী অভিক্ষা (Choice test) :—এই অভিক্ষায় প্রশ্নের অনেকগুলি উত্তর দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থী ঠিক উত্তরটি খুঁজে নেয়।

(ক) বাষ্পের শক্তি আছে তা প্রথম আবিষ্কার করেন—জর্জ ষ্টিফেনসন/ জেম্‌স ওয়াট/সার উইলিয়াম ডেভি।

(খ) অগ্নি নির্বানের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। ইহা দাহ্য নয় এবং দহনেরও সহায়ক নয়। ইহা সহজে উৎপন্ন করা যায়।

(৫) উপযোগীকরন (Matching test) :—এখানে প্রশ্নের উত্তরগুলি ডানদিকে লেখা থাকে কিন্তু এলোমেলোভাবে অন্য প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে মিশে থাকে। প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি খুঁজে লিখতে বলা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার একটি প্রধান সুবিধা হল এই যে এতে প্রশ্নের উত্তর ঠিক করা থাকে। পরীক্ষকের খেয়ালখুসীর উপর নম্বর দেওয়া নির্ভর করে না। যে পরীক্ষকই খাতা দেখুকনা কেন নম্বর এক হবে। তবে এতে ভাষার পরীক্ষা করা যায় না। পরীক্ষার্থী অনেক সময় আন্দাজে একটি উত্তর বেছে নেয় এবং হয়ত ঠিকও হয়ে যায়।

বুদ্ধির অভীক্ষার আদর্শী করণ
(Standardisation of intelligence tests)

বুদ্ধি পরিমাপের জন্য যখন অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয় তখন দেখতে হয়, সেই অভীক্ষাগুলি উক্ত পরীক্ষার উপোযোগী কি না।

মনোবিজ্ঞানে অভীক্ষা প্রস্তুত করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে অভীক্ষাটি যেন যথা সম্ভব নিভুর্ল ও বিজ্ঞান সম্মত হয়। অভীক্ষাটি যথা সম্ভব নিভুর্ল ও বিজ্ঞান সম্মত কিনা যাচাই করতে হলে দেখতে হবে যে অভীক্ষাটির নিম্নলিখিত তিনটি গুণ আছে কিনা—

(১) নির্ভর যোগ্যতা (২) যাথার্থ্য (৩) নৈর্ব্যক্তিকতা

(১) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) :—একটি অভীক্ষার নির্ভর যোগ্যতা ওই অভীক্ষালব্ধ ফলগুলির সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। কোন অভীক্ষা যদি কোন ব্যক্তির উপর একবারমাত্র প্রয়োগ না করে কয়েকবার করা যায় এবং বিভিন্ন সময়ের অভীক্ষালব্ধ ফল হতে যদি আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌছুই তাহলে আমরা বলব যে অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষালব্ধ ফলের সিদ্ধান্তগুলি যদি পরস্পর অসংলগ্ন হয় তবে বলব অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য নয়।

(২) যাথার্থ্য (Validity) :—অভীক্ষাটির যাথার্থ্য নির্ভর করে অভীক্ষাটি কত বিশ্বস্ততার (Fidelity) সঙ্গে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে তার ওপর।

ধর তোমার একটি খুব ভাল হাত ঘড়ি আছে। এবং তুমি ওর মিনিটের কাঁটাটাকে ২০ মিনিট এগিয়ে দিলে। স্কুলে যাবার সময় তুমি ঘড়িটিকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে। যখন স্কুলে দশটার ঘণ্টা পড়ল তখন তুমি দেখলে তোমার হাত ঘড়িতে ১০টা বেজে ২০ মিনিট। যখন এগারটার ঘণ্টা পড়ল, তুমি দেখলে তোমার ঘড়িতে ১১টা বেজে ২০ মিনিট। অতএব তোমার ঘড়ি নির্ভরযোগ্য (Reliable) কারণ তার কাঁটার গতি স্কুলের ঘড়ির কাঁটার গতির সঙ্গে সমতালে দৌড়াচ্ছে। ১১টার ঘণ্টায় স্কুলের ঘড়ি জানায় স্কুল বসবার পর ১ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে, তোমার ঘড়িও তাই জানাচ্ছে কিন্তু তোমার ঘড়ি যে সময় দিচ্ছে তা যথার্থ (Valid) নয়, বেলা দশটার সময় তোমার ঘড়ি জানাচ্ছে যে এখন বেলা ১০টা বেজে ২০ মিনিট।

(৩) নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) :—অভীক্ষাগুলি নৈর্বক্তিক হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষকের দৃষ্টি যেন নিরপেক্ষ হয়। যেমন ধর পরীক্ষকের যদি ধারণা থাকে যে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের বুদ্ধি কম হবে তাহলে সে অবহেলা ভরে একজন নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির বুদ্ধি পরীক্ষা করবে। ফলে তার পরীক্ষা তার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হবে। অতএব আদর্শ অভীক্ষায়ও অভীক্ষক সব সময় নৈর্বক্তিক হবেন।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে ব্যক্তির শ্রেণী বিভাগ (classification of individuals according to I. Q.) বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে ব্যক্তির শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলি দেওয়া হল।

১। **ক্ষীণবুদ্ধি** (Feeble minded) :—যাদের স্টানফোর্ড বিনে অভিক্ষা অনুসারে বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ এর নীচে তাদের বলা হয় মানসিক অভাববিশিষ্ট (mentally deficient)। লোক সংখ্যার শতকরা প্রায় ৩ জন এই দলের অন্তর্ভুক্ত। মানসিক অভাববিশিষ্টদের আবার তিন দলে ভাগ করা যায়।

(১) স্বল্পবুদ্ধি (Moron) বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০-৭০।

(২) মন্দধী (Imbecile) বুদ্ধ্যঙ্ক ২০-৫০।

(৩) জড়ধী (Idiot) „ ২০ এর নীচে।

স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির মানসিক বয়স ৮-১২ বৎসর।

মন্দধীদের ৩-৭ বৎসর ও জড়ধীদের ৩ বৎসরের নীচে।

মানসিক বয়স জানলেও আমরা বুঝতে পারব এদের কাজ করবার শক্তি কতটা। জড়ধী তার সারাজীবনকাল ৩ বৎসরের শিশুর মত ব্যবহার করবে। সে কখনও ভাল করে কথা বলতে পারবে না, এমন কি সে জামার বোতাম পরাতে বা জুতোর ফিতে বাঁধতেও অক্ষম হতে পারে। সে কখনও নিজেকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে পারবে না। যেমন পারে না তিন বছরের ছোট শিশু। বিদ্যালয়ের সহজতম কাজও সে করতে পারবে না।

মন্দধী বয়সকালেও শিশুর মত থাকে এবং সে কিছু ভালো করে কথা বলতে পারে, পোষাক পরিধান করতে পারে এবং সহজ কাজ শিখতে পারে কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা কিছু করতে পারে না। এরা বিপদকে এড়িয়ে চলতে পারে।

স্বল্পধী ব্যক্তি আরো কিছু উন্নতি করতে পারে। সে কষ্টে লিখতে পড়তে পারে, সহজ কাজ শিখতে পারে এবং নিজের কাজ করতে পারে।

ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি দুই প্রকার :—

(১) **প্রাথমিক বা পারিবারিক ক্ষীণবুদ্ধি** (Primary or familial feable-mindedness)। এই সব ব্যক্তির দেহে যান্ত্রিক গোলযোগ থাকে না, আঘাতপ্রাপ্তি বা অসুস্থতার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সব দিক থেকে ব্যক্তিকে সুস্থ মনে হবে, কেবল বুদ্ধির অভাব থাকে। এসব ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যেও ঐরূপ ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় এই প্রকার ক্ষীণবুদ্ধি জন্মসূত্রে পাওয়া এবং একে সারানো সম্ভব নয় অথবা বুদ্ধির উন্নতিও সম্ভব নয়। তবে খুব বেশী অধ্যবসায় ও মনোযোগ সহকারে শেখালে এরা সামাজিক কাজ যেমন নিজে নিজে স্নান করা, পোষাক পরা, বাড়ীর ছোটখাট ফরমাস শোনা প্রভৃতি পারে; দু একটা কাজে সাধারণ দক্ষতা আনাও সম্ভব হয় যেমন ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ, ছাপাখানার কাজ প্রভৃতি।

(২) মাধ্যমিক ক্ষীণবুদ্ধি (secondary feeble mindedness) :— গর্ভবাসকালে অনেক সময় শিশুর মস্তিষ্কে যথেষ্ট অক্সিজেন চলাচল করে না, এরজন্য শিশু ক্ষীণবুদ্ধি হতে পারে। প্রসবের সময় শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত

লাগতে পারে অথবা কঠিন অসুখে ভুগলে মস্তিষ্কের রাসায়নিক গোলযোগ হয়। এরূপ ক্ষীণবুদ্ধি জন্মগত নয়; তবে এরও চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

২। **প্রতিভাবান** (gifted) ট্যারম্যান হাজার হাজার প্রতিভাবান শিশুদের নিয়ে ২৫ বছর ধরে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দেখলেন এই সমস্ত প্রতিভাবান শিশুদের জন্ম উচ্চ বংশে, ধনী ও কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে। এই সব পরিবারের শিশু উন্নত পরিবেশে মানুষ হয় এবং তাদের বুদ্ধির সুষ্ঠু বিকাশ হয়।

ট্যারম্যান বহু পরীক্ষার পর পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণার প্রতিবাদ করে বললেন প্রতিভাবান ব্যক্তি অদ্ভুত নয় বা অপপ্রতিযোজন করে না বা সমাজে পশ্চাদবর্ত্তীও নয়। সাধারণভাবে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজন ভালই করে, তারা সামাজিকও হয়।

প্রতিভাবান শিশুদের সমস্যাও (problems of the gifted) কম নয়। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বলে সে তার সমবয়সীদের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারে না, তারচেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চায়। তাছাড়া যে শিক্ষক তাকে শিক্ষা দান করেন তিনি নিজেও প্রতিভাবান নন এবং শিক্ষক এই শিশুর প্রশ্ন বা আচরণে বিরক্ত হ'ন, তাকে পাকা, জ্যেঠা ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করেন। অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু তার ক্লাসের পড়া খুব সহজেই শিখে ফেলে এবং পরে এই সব পড়া তার কাছে এক ঘেয়ে মনে হয় অবশেষে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। আজকাল কোথাও কোথাও প্রতিভাবান শিশুদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে; এই সব জায়গায় এই সব শিশুদের যথার্থ বিকাশ হয়।

যে সমস্ত ব্যক্তি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন (Bright) তাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক হল ১১০-১২০। বিশেষ উন্নত বুদ্ধিসম্পন্নদের (very bright) বুদ্ধ্যাঙ্ক হল ১২০-১৪০। ১৪০-১৬০ যাঁদের বুদ্ধ্যাঙ্ক তাদের আমরা বলি প্রতিভাবান (genius); ১৬০ এর উপরে হল অতি মানব (super man)। এদের সংখ্যা খুবই কম।

শিক্ষায় বুদ্ধি অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (uses of intelligence tests in education) :—

আজকের দিনে বুদ্ধি অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানসিক রোগ চিকিৎসায়, বৃত্তি নির্ব্বাচনে, শিল্পে সর্ব্বত্র বুদ্ধি অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ছাত্রদের শ্রেণীকরণের জন্য বুদ্ধি অভিক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়। বিদেশে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুদ্ধি পরিমাপ করে বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এই শ্রেণীকরণ তিন প্রকারে হয়ে থাকে। (ক) উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণী, (খ) মধ্যম প্রকারের বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণী, (গ) এবং অল্পধীদের শ্রেণী। এদের পাঠ্যবিষয়গুলিও যথাক্রমে উন্নতধরণের, সাধারণ এবং সরল হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ শ্রেণীকরণ করা দরকার। শ্রেণীকরণের সময় বয়েসের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সবচেয়ে ভালো উপায় হল বুদ্ধির পরীক্ষা করে শ্রেণীকরণ করতে হবে তারপর তাদেয় বয়স অনুসারে ভাগ করতে হবে।

বুদ্ধি অনুসারে এইরূপ শ্রেণীকরণের দ্বারা উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ররাই লাভবান হয় শ্রেণী। সাধারণ শ্রেণীতে তাদের আগ্রহ কমে যায়, জানা বিষয়ে মন দিতে পারে না, পড়াশোনা তাদের কাছে একঘেয়ে মনে হয়।

অসম বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের শ্রেণীতে শুধু উজ্জ্বলধী ছাত্র নয়, অল্পধী ছাত্রবাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ আমরা সবাই জানি যার বুদ্ধি নেই, যে দুরূহ বিষয়টি বুঝতে না পারে তাকে ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে, লজ্জা দিয়ে কোন লাভ নেই। শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় এরা পেছিয়ে থাকে এবং শিক্ষকের অবহেলা, তিরস্কার, অন্যান্য ছাত্রদের বিদ্রূপে তারা হীনমন্যতা প্রভৃতি রোগে ভোগে এবং বাস্তবের সঙ্গে প্রতিযোজনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময়ও বুদ্ধির পরীক্ষা করে নিলে ভালো হয়। শুধু অর্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করে নিলে যে ছেলেরা শুধু মুখস্থ করে পাশ করে তারা যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবে এখানে খারাপ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ও ট্রেনিং কলেজে প্রবেশের সময়ও ছাত্রদের বুদ্ধি পরীক্ষা করা হয়, এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে বুদ্ধির পরীক্ষা করে নিলে কতগুলি জীবন ভুল পথে চলার হাত থেকে কিভাবে বাঁচতে পারে। একজন প্রফেসরের মেয়ে কয়েকবার চেষ্টার পর আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করল। বাবা প্রফেসর গুণী এবং জ্ঞানী অতএব তিনি ধরে নিলেন মেয়েও উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বুদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ভাবলেন বুদ্ধির অভাব নয় হয়ত অধ্যাপনার ত্রুটির জন্য মেয়ে পড়াশোনা ভালো করছে না। অতএব তিনি মেয়েকে শেখাতে লাগলেন। দুবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যর্থ হবার পর তার

বুদ্ধির পরীক্ষা করা হল, দেখা গেল তার বুদ্ধি কম, দেখা গেল তার বুদ্ধি সাধারণের থেকেও কম।

শিশুকে ঠিকমত মানুষ করার জন্য বুদ্ধির পরিমাপ করা দরকার। যে শিশু সমস্যামূলক আচরণ করে তাদের সুস্থ করার এবং সমাজের সঙ্গে ঠিকমত উপযোজনের জন্য বুদ্ধি অভিক্ষা প্রয়োগ করা দরকার। বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ণয় করে যদি দেখা যায় যে শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাহলে বোঝা যাবে তার সমস্যামূলক আচরণের মূলে আছে তার বুদ্ধির অভাব এবং পিতামাতা বা শিক্ষকের শিক্ষার দোষে সে অপপ্রতিযোজন করেনি। কিন্তু যদি দেখা যায় প্রতিযোজনে অক্ষম শিশুটির বুদ্ধি স্বাভাবিক, তাহলে বুঝতে পারা যাবে পরিবেশ, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির শিক্ষায় কোথাও ত্রুটি আছে এবং তাঁরা তাঁদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারেন।

বুদ্ধি অভিক্ষা প্রয়োগ করে দেখা গেছে প্রতিভাবান শিশুরাও সমস্যামূলক আচরণ করে। ক্লাসের পড়া এদের কাছে খুব সহজ, তাই একঘেয়ে। স্কুলের বাইরে এইসব ছেলেরা অবাঞ্ছিত আচরণ করে কারণ বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে তাদের যোগ্যতার উপযুক্ত কাজ তারা পায় না। বার্ট বলেছেন মহৎ প্রতিভা কখনই অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ নয়। শিশুর প্রতিভা স্ফুরণের স্বাভাবিক পথ তার নির্ব্বোধ পিতামাতার জন্য খোলা থাকে না বলেই তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে। শিশুর প্রতিভা তার বিদ্যালয়ের অতি সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বিকাশের পথ পায় না কিম্বা তার বৃত্তির মধ্যে বিকাশের সুযোগ পায় না অথবা তার দারিদ্র্য এবং বন্ধুদের প্রাচুর্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। বুদ্ধি অপরাধীদের পথ বলে দেয় কিন্তু অপরাধ করতে কখনও বলে না।

বৃত্তি নির্ব্বাচনে বুদ্ধি পরীক্ষার দান কম নয়। বৃত্তি সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেবার সময় শিশুর মানসিক ক্ষমতা, ও দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং কোন বৃত্তির সে উপযুক্ত তাও বলে দেওয়া হয়। এর জন্য তার বুদ্ধির পরিমাপ করতে হয়। অবশ্য শুধু বুদ্ধি দেখে বৃত্তি নির্ব্বাচন করা হয় না। স্বাস্থ্য, চরিত্র, জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি অনেক কিছুর ওপর ব্যক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। আবার বুদ্ধি থাকলেই যে ব্যক্তি সার্থক হবে তাও নয়। কিন্তু আমরা জানি সমস্ত কাজের জন্যই বুদ্ধির দরকার হয়। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তার খুব বেশী যোগ্যতা আছে বলা মনে করা হয় নি এবং এইজন্য তাকে একটি খুব সাধারণ কাজ দেওয়া হয়েছিল। সে তার কাজে খুবই বিরক্তি বোধ করত কিছুদিন পর তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা গেল। মনোবিদগণ তার বুদ্ধি পরিমাপ করে দেখলেন ছেলেটি খুবই মেধাবী। তার মেধা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের মেধার সঙ্গে তুলনীয়। মনোবিদ

মন্তব্য করলেন তার জন্য আরও উচ্চদরের কাজ দিতে হবে এবং তাতে সে সেরে উঠবে। এরপর দেখা গেল ছেলেটি ভালো হয়ে গেল—এবং পড়াশোনা করে যথেষ্ট উন্নতি করল।

বৃত্তি নির্ব্বাচনে মানসিক ও দৈহিক অভিক্ষা প্রয়োগ করে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করা হয়। এখানেও বুদ্ধির দরকার খুবই। বহু কারখানায় ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধি পরীক্ষার দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা হয়।

সিভিল সার্ভিস কমিশনে বুদ্ধির পরীক্ষা করে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়।

কিন্তু বোধ হয় বুদ্ধি পরীক্ষার সবচেয়ে বড় দান হল সৈন্য বিভাগে যোগ্য ব্যক্তির প্রবেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাজার সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল বুদ্ধির পরীক্ষা করে।

Questions (প্রশ্নাবলী)

1. What is intelligence? What is the nature of intelligence.

বুদ্ধি কাহাকে বলে? বুদ্ধির প্রকৃতি কি?

2. What are the theories of intelligence Explain them

বুদ্ধির তত্ত্বগুলি কি ব্যাখ্যা কর।

3. Describe some intelligenoe tests, what is the conceptien of mental age.

কয়েকটি বুদ্ধি অভিক্ষার বর্ণনা দাও। মানসিক বয়েস বলতে কি বোঝ?

4. What is performance test. Describe some performance tests ?

কৃতি পরীক্ষা কি? কয়েকটি কৃতি পরীক্ষার বর্ণনা দাও।

5. What is achievements tests ? What are its merits ? can intelligence be measured with the help of the tests ?

অর্জ্জিত জ্ঞানের অভিক্ষা কি? এর সুবিধা কি? এগুলির সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায় কি?

6. How will you standardise intelligence tests ?

বুদ্ধি অভিক্ষার আদর্শীকরণ করিবে কিরূপে?

7, What is intelligence quotient ?

Classify individuals according to I. Q.

বুদ্ধ্যঙ্ক কি? বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ কর।

8. What are the uses of intelligence tests in Education,

শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কি বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান

ত্বক জাত সংবেদন (Cutaneous sensations)

১। **সমস্যা** :—স্পর্শ কেন্দ্রবিন্দুর আবিষ্কার (to explore the touch spots)

মৌলিক তত্ত্ব :—ত্বকের সর্বত্র সমান স্পর্শ সংবেদন হয় না। স্পর্শ সংবেদন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে।

সাধারণ বিবরণ

অভীক্ষার্থীর নাম—

বয়স—

অবস্থা—

সময়—

তারিখ—

উপকরণ :—ঘোড়ার চুল, হেয়ার হোল্ডার, লাল এবং কালো কালি, টিস্যুপেপার, কাঁচি, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস, স্ক্রীন।

পরীক্ষণ প্রণালী :—অভীক্ষার্থীর বাম হাতটি চিৎ করে; কব্জির থেকে ১০ সেন্টিমিটার দূরে ১বর্গ সেঃ মিঃ স্থান কালোকালি দিয়ে দাগ দেওয়া হল। তারপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখে লোমকূপগুলি সব কালো কালি চিহ্নিত করা হল। এর পর হেয়ার হোল্ডারে ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি ঘোড়ার চুল লাগিয়ে রাখা হল। অভীক্ষার্থী ও অভীক্ষকের মধ্যে একটি কাঠের স্ক্রীন থাকবে। স্ক্রীনের তলা দিয়ে অভীক্ষার্থী হাত বাড়িয়ে দেবে। হেয়ার হোল্ডারটি ধরে কালো কালি চিহ্নিত প্রতিটি দাগে আস্তে আস্তে স্পর্শ করাতে হবে। অভীক্ষার্থী যে স্থানে চুলটির স্পর্শ পাবে, সেইস্থানে হ্যাঁ বলবে এবং সেইস্থানটিতে অভীক্ষার্থী লাল কালির চিহ্ন দেবে। সমস্ত কালো চিহ্নিত বিন্দু স্পর্শ করা হলে; টিস্যু পেপারে ঐ চিহ্নগুলি অঙ্কন করতে হবে। হাতের উল্টো পিঠে এবং পাশে অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :—তোমার হাতটি স্ক্রীনের তলা দিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার হাতে চুলটি স্পর্শ করাব।

যখনই তুমি স্পর্শানুভূতি লাভ করবে; হ্যাঁ বলবে। মনে রেখো, পরে অন্তর্দর্শন লিখতে হবে।

চিত্র ১—পেন পয়েন্ট ও হেয়ার হোল্ডার
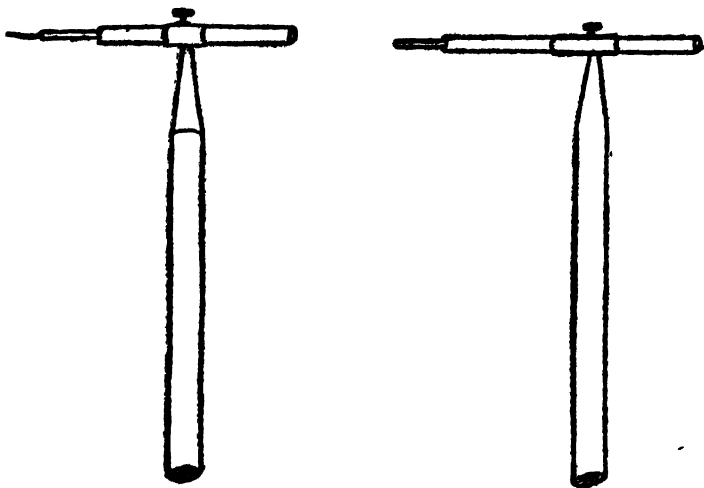
পরীক্ষকের সতর্কতা ঃ—ঘেরা দেওয়া স্থানটির প্রত্যেকটি বিন্দুতে চুলটি স্পর্শ করাতে হবে। স্পর্শ করার সময় যেন বেশী চাপ না দেওয়া হয়। চুলটি খাড়া ভাবে স্পর্শ করাতে হবে। স্পর্শ করানর সময় পরীক্ষকের হাতের আঙুল বা কোন অঙ্গ যেন পরীক্ষার্থীর হাতে না লাগে।

ফলাফল ঃ—

পরীক্ষণ নং	উত্তেজক	উত্তেজিত বিন্দুর সংখ্যা	মতামত	মোট স্পর্শ বিন্দু
১	ঘোড়ার চুল	১৬	হ্যাঁ	মোট ১০টী স্পর্শ বিন্দু
২			না	
৩			হ্যাঁ	
৪			না	

তালিকা নং—১

অন্তর্দর্শন :—আমি যখন স্পর্শবোধ করছিলাম হ্যাঁ বলেছি। মাঝে মাঝে অভীক্ষক যখন লাল কালির দাগ দিচ্ছিল তখনও ভুল করে হ্যাঁ বলেছি।

সিদ্ধান্ত (Conclusion) :—অভিকার্থীর বামহাতের সোজা পিঠে মোট ১০টি স্পর্শ বিন্দু পাওয়া গেছে।

২। **সমস্যা:**—যন্ত্রণা কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কার—(To explore Pain spots)

মৌলিক তত্ত্ব :—ত্বকের উপর আমরা যে যন্ত্রনার অনুভূতি পাই তাহা সর্ব্বত্র সমান নয়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—পেনপয়েন্ট (Pain Point), টিস্যুপেপার, সেন্টিমিটার স্কেল, লাল ও কালো কালি, স্ক্রীন ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

পেনপয়েন্টের বর্ণনা :—এর একদিকে সরু সূচের মত পিন লাগানো আছে। অপর দিকে একটি হাতল আছে। ঐ সূচের মত অগ্রভাগ ত্বকের উপর রাখলে যন্ত্রণার সংবেদন হয়।

পরীক্ষণ প্রণালী:—পরীক্ষার্থীর বামহাতের সোজা পিঠের একবর্গ সে.মি পরিমাণ স্থান চিহ্নিত করে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্য লোমকূপগুলি দেখে কালো কালি দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। এর পর পেনপয়েন্টের সরু অগ্রভাগ ঐ কালো কালি চিহ্নিত প্রত্যেকটি স্থানে ঠেকাতে হবে। পেনপয়েন্টের ছুঁচলো অগ্রভাগ যেন হাতে না বিঁধে যায় লক্ষ্য করতে হবে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থী কাঠের স্ক্রীনের তলা দিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দেবে। হাতের সোজা পিঠ ও পাশে ও অনুরূপভাবে পরীক্ষা করা হবে। টিস্যুপেপারে ছাপ তুলে নিতে হবে।

ফলাফল :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ

অন্তর্দর্শন :—(Introspection)

সিদ্ধান্ত (Conclusion) :—পূর্ব্বের ন্যায়।

৩। **সমস্যা :**—উষ্ণ কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কার (To explore warm spot)

মৌলিক তত্ত্ব :—ত্বকের উপর আমরা গরম বোধ করি। ত্বকের সর্ব্বত্র এই উষ্ণ বিন্দুগুলি সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। তাই প্রতি লোমকূপে উষ্ণতার অনুভূতি পাওয়া যায় না।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—থার্মোমিটার, ২টি সিলিণ্ডার, গরম জল, মিলিমিটার স্কেল, লাল ও কালো কালি, তুলো, টিস্যুপেপার, স্ক্রীন।

সিলিণ্ডারযন্ত্রের বর্ণনা :—ইহা একটি ধাতু নির্মিত যন্ত্র, এর হাতলটা কাঠের, সামনের দিকটা ছুঁচলো।

পরীক্ষণপ্রণালী :—অভীক্ষার্থীর বাম হাতের কব্জি থেকে ১০ সেঃ মিঃ দূরে এক সে মি পরিমিত স্থান বেছে নেওয়া হল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে লোমকূপগুলি দেখে কালো কালি দিয়ে দাগ দিতে হবে। অভীক্ষক ও অভীক্ষার্থীর মাঝের স্ক্রীনের তলা দিয়ে অভীক্ষার্থী হাত বাড়িয়ে দেবে। অভীক্ষক সিলিণ্ডার দুটি গরম জলের পাত্রে ডুবিয়ে রাখবে এবং একটি সিলিণ্ডারের জল তুলো দিয়ে, মুছে, কালো, কালি চিহ্নিত বিন্দুতে ঠেকাতে হবে। অভীক্ষার্থী হ্যাঁ বললে অভীক্ষক সেই বিন্দুতে লাল কালির দাগ দেবে।
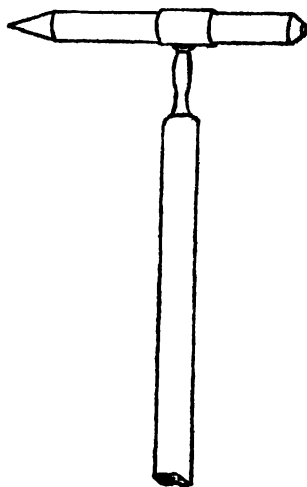
চিত্র ২—সিলিণ্ডার

মাঝে মাঝে সিলিণ্ডার বদলে নিতে হবে। অভীক্ষার্থীর হাতের উল্টো পিঠ, ও পাশে এইরূপ পরীক্ষা করা হবে। প্রত্যেকবার টিস্যু পেপারে লাল কালি চিহ্নিত দাগগুলি অঙ্কন করতে হবে।

পরীক্ষকের সতর্কতা :—জলের তাপমাত্রা যেন ৪৫°—৫০ সেঃ র মধ্যে সিলিণ্ডারটি সোজা করে ধরে লম্বভাবে হাতে ঠেকাতে হবে।

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :—প্রস্তুত বলার পর তোমার হাতে যখন গরম লাগবে, তখন হ্যাঁ বলবে। মনে রেখো গরম লাগলে তবে বলবে। গরম না লেগে যদি কেবল স্পর্শ পাও তাহলে হ্যাঁ বলবে না।

ফলাফল :—

পরীক্ষন নং	উত্তেজক	উত্তেজিত বিন্দু	মতামত	মোট উষ্ণবিন্দু
	৫০ সে জল	১৮	হ্যাঁ না	১২

তালিকা সং—৩

অন্তর্দর্শন :—পূর্ব্বের ন্যায়।

সিদ্ধান্ত (Conclusion)—মোট বারটি উষ্ণ বিন্দু পাওয়া গেছে।

৪। **সমস্যা :**—শৈত্য কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কার (To explore cold spot)

মৌলিক তত্ত্ব :—ত্বকের সর্ব্বত্র শৈত্যের অনুভূতি পাওয়া যায় না। শৈত্য বিন্দুগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

সাধারণ বিবরণঃ—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—থার্মোমিটার, বরফ জলের পাত্র, দুটি সিলিণ্ডার, টিস্যুপেপার, লাল ও কাল কালি, স্কেল, স্ক্রীন, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও তুলো।

প্রণালীঃ—পূর্ব্ব পরীক্ষার অনুরূপ।

পরীক্ষার্থির সতর্কতাঃ—জলের তাপ হবে ২৫° সেঃ। সিলিণ্ডারটি খাড়া ভাবে ধরতে হবে। আলগাভাবে সিলিণ্ডারটি স্পর্শ করাবে, যেন কোথাও চাপ না পড়ে।

ফলাফল—পূর্ব্বের ন্যায়

অন্তর্দর্শন :—

সিদ্ধান্ত :—

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদন (Sensation of taste and smell)

১। **সমস্যা** :—বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর স্বাদ নির্ণয় (To demonstrate different tastes)।

মৌলিক তত্ত্ব :—স্বাদ ও গন্ধ একত্রে মিশ্রিত থাকে। আমরা খাদ্য বস্তুর বিভিন্ন স্বাদ পাই তার গন্ধের জন্য। গন্ধ ছাড়া অনেক খাদ্যই স্বাদ হীন।

সাধারণ বিবরণ :—অভীক্ষার্থীর নাম, বয়স অবস্থা, সময় তারিখ।

উপকরণ :—চার প্রকার খাদ্য (১) মিষ্ট দ্রব্য—চিনি ও মধু ; (২) টক দ্রব্য—লেবু ও তেঁতুল ; (৩) লবনাক্ত দ্রব্য—লবণ ও নিমকি, (৪) তিক্তদ্রব্য—উচ্ছে ও নিমপাতা।

প্রণালী :—অভীক্ষার্থী জিভ বের করে, চোখ বন্ধ করে বসবে। পরীক্ষক একটি চামচে করে তার জিহ্বায় খাবার দেবে। পরীক্ষার্থী কিরূপ স্বাদ অনুভব করছে বলে মুখ ধুয়ে ফেলবে। এরপর আবার একটি খাদ্য মুখে দেওয়া হবে। একে একে সব খাবার জিনিষ এই ভাবে মুখে নিয়ে অভীক্ষার্থী স্বাদ নিরূপণ করবে। খাবার জিনিষগুলি জোড়া জোড়া করে আস্বাদন করবে যেমন প্রথমে চিনি, তারপর মধু জিভে দেওয়া হবে।

এর পর অভীক্ষার্থী নাক টিপে চোখ বন্ধ করে বসবে। এবংপূর্ব্বের ন্যায় আর একবার মিষ্টি, তেতো, লবণাক্ত প্রভৃতি খাবারগুলি অভীক্ষার্থীর মুখে দেবে। অভীক্ষার্থী জিহ্বার কোন স্থানে কিরূপ স্বাদ অনুভব করছে বলবে।

ফলাফল :—

খাদ্যবস্তু	চোখ বন্ধ করে ও নাক খুলে		চোখ বন্ধ করে ও নাক টিপে	
	স্বাদ	স্বাদের স্থান	স্বাদ	স্বাদের স্থান
১। চিনি	মিষ্ট	জিভের ডগা	বোঝা যায় না	—
২। মধু	ঐ	ঐ	মিষ্ট	জিভের ডগা
৩। নিমপাতা	তিক্ত	জিভের গোড়া	তিক্ত	জিভের গোড়া
৪। উচ্ছে	তিক্ত	ঐ	বোঝা যায় না	—

তালিকা নং—৩

অন্তর্দর্শন :—নাক যখন খোলা ছিল তখন চোখ বন্ধ করা থাকলেও কোন খাবার মুখে নেওয়া হয়েছে, বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু নাক বন্ধ করে খাদ্যের তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। টকের স্বাদ পাশেও পেয়েছি, জিভের ডগাতেও পেয়েছি। স্বাদের স্থান তাই সব ঠিক মত বলতে পারিনি। সময় সময় আন্দাজে বলে দিয়েছি।

২। সমস্যা :—নানা প্রকার গন্ধের পরীক্ষা (Experiment on smell)

মৌলিক তত্ত্ব :—বিভিন্ন গন্ধ মিশ্রিত হলে একে অপরকে বিলুপ্ত করে।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণঃ—ডবল অলফ্যাক্টোমিটার, কাঠের ফাঁপা সিলিণ্ডার এবং বিবিধ গন্ধ দ্রব্য।
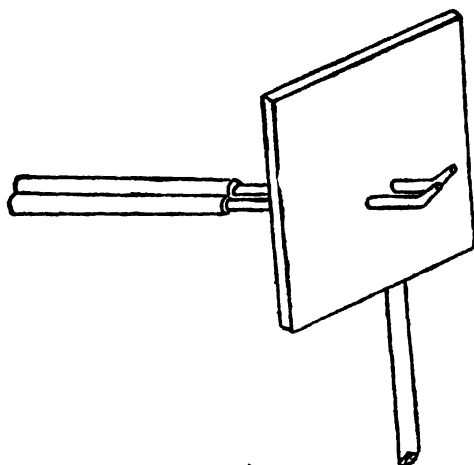
চিত্র ৩—অল ফ্যাক্টোমিটার

পরীক্ষণ প্রণালী :—অলফ্যাক্টোমিটারের টিউব দুটি প্রথমে নাকের মধ্যে ৫ মিলিমিটার পর্য্যন্ত প্রবেশ করাতে হবে। টিউবের মধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে না। কেবল প্রশ্বাস গ্রহণ করবে। প্রথমে গন্ধযুক্ত সিলিণ্ডার গুলির গন্ধ পৃথক ভাবে আঘ্রাণ করবে। তারপর দুই প্রকার গন্ধযুক্ত সিলিণ্ডার কাঠের টিউবে লাগিয়ে ঘ্রাণ নেবে। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় গন্ধ আঘ্রান করে অভীক্ষক মতামত দেবে।

ফলাফল :—

পরীক্ষণ নং	গন্ধ দ্রব্য	অনুভূত গন্ধ
১।	লেবু গন্ধ ও আনারস গন্ধ	লেবু গন্ধ
২।	আম ও পেয়ারার গন্ধ	আমের গন্ধ

অন্তর্দর্শন :— তালিকা নং—৪

সিদ্ধান্ত :—

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রবণ সংবেদন (Auditory sensation)

সমস্যাঃ—শব্দকম্পনের পরীক্ষা (To demonstrate sound vibrations)।

চিত্র ৪—টিউনিং ফর্ক
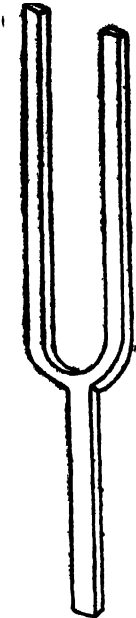
মৌলিক তত্ত্ব :—শব্দ বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং এই শব্দ তরঙ্গ কানে লাগলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও তার কম্পনের উপর স্বরগ্রাম (Pitch) নির্ভর করে।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

অভীক্ষার্থী নাম—

উপকরণ :—টিউনিংফর্ক, রেসোনান্স বক্স, ফেল্ট যুক্ত হাতুড়ি।

প্রণালী :—রেসোনান্স বক্সের উপরে টিউনিং ফর্ক বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিলে স্বর শোনা যাবে। টিউনিং ফর্কের গায়ে কম্পন সংখ্যা (Vibration) লেখা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন টিউনিং ফর্ক রেসোনান্স আধারে বসালে স্বর চড়া না, গম্ভীর, সরু অথবা মোটা বোঝা যায়। দুটো বিভিন্ন vibration এর টিউনিং ফর্ক একসঙ্গে হাতুড়ি দিয়ে পিটলে স্বরের ওঠা নামা এবং কম্পন বোঝা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

দর্শন সংবেদন (Visual sensation)

(১) **সমস্যা:** ষ্টেরিও স্কোপের সাহায্যে ত্রি আয়তন দর্শন (To demonstrate stereoscopic vision by stereoscope)।

মৌলিক তত্ত্ব: আমরা যখন বাম চোখ দিয়ে কোন বস্তুকে দেখি তখন বস্তুর বাম দিকটি বেশী করে দেখি এবং ডান চোখ দিয়ে যখন দেখি তখন বস্তুর ডান দিকটা বেশী করে দেখি। দুই অক্ষিপটের ছবির এই বৈষম্যকে বলে অক্ষিপটের বৈষম্য (Ratinal disparity)। কোন বস্তুকে বাম চোখ দিয়ে যেমন দেখতে, সেইরূপ একটি ছবি এবং এর থেকে আড়াই ইঞ্চি দূরে ডান চোখ দিয়ে যেমন দেখায় সেইরূপ একটি ছবি স্টেরিও স্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দুটি ছবি দেখিনা, দেখি বস্তুর ঘনত্ব অর্থাৎ গভীরতা ও দূরত্ব।

উপকরণ: স্টেরিও স্কোপের জন্য তোলা ৪ জোড়া ছবি।

প্রণালী: স্টেরিও স্কোপে এক জোড়া ছবি লাগিয়ে নিয়ে যন্ত্রের মধ্যে তাকালে একটি ছবি দেখা যাবে, দুটি নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা যাবে
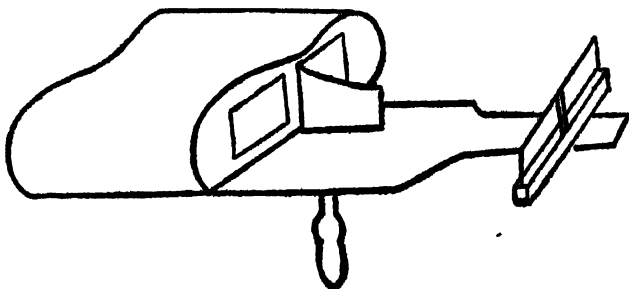
চিত্র—৫

গভীরতা। এইভাবে একে একে ৪ জোড়া ছবি স্টেরিওস্কোপে লাগিয়ে গভীরতা, উচ্চতা, দূরত্ব প্রভৃতি দেখতে পাবে। এই দূরত্ব প্রভৃতি দেখাকে বলে ত্রি-আয়তন দর্শন।

অধ্যাস (Illusion)

আকৃতিগত অধ্যাস (To demonstrate size illusion)।

২। **সমস্যা:** মূলার লায়ার চিত্রের অধ্যাস।

মৌলিক তত্ত্ব : অধ্যাস ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুকে যখন ভুল করে অন্যরূপে প্রত্যক্ষণ করি, তখনই হয় অধ্যাস।

সাধারণ বিবরণ : পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ : মূলার লায়ার ইলিউসন বোর্ড, মিলিমিটার স্কেল, পর্দা, থুতনির বিশ্রাম স্থল।

মুলার লায়ার ইলিউসন বোর্ডের বর্ণনা : একটি কার্ডবোর্ড দিয়ে তোমরা নিজেরাই এই যন্ত্রটি প্রস্তুত করতে পার। প্রথমে একটি চওড়া কার্ডবোর্ডে সাদা কাগজ সেঁটে দাও এবং তার ওপর A.B. অংশ কেটে নাও। A.B = ৩০ মিলিমিটার করে কেটে নাও। এবার আর একটি কম চওড়া কার্ডবোর্ড কেটে তার উপরও সাদা কাগজ সেঁটে নাও।
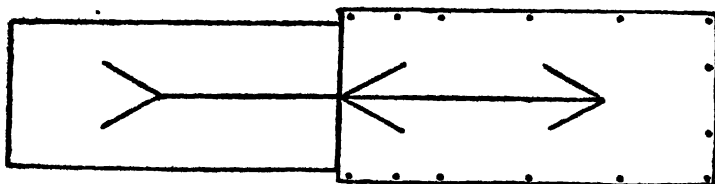
চিত্র—৬

এই সরু কার্ডবোর্ড চওড়া কার্ডবোর্ড A B রেখার নীচ দিয়ে এমনভাবে বাঁধ যেন সরু কার্ডবোর্ডটিকে ডানদিক অথবা বাম দিকে টানা যায়। এবার সরু কার্ডবোর্ডের উল্টো পিঠে, C বিন্দুকে শূন্য ধরে শেষ পর্য্যন্ত একটি মিলিমিটার স্কেল তৈরী করে নাও। A B অংশকে বলে এ্যারো হেড (Arrow Head) এবং B C-কে বলে ফেদার হেড (Feather Head)।

পরীক্ষণ প্রণালী : পরীক্ষার্থীকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেবার পর, পরীক্ষার্থী C অংশ টেনে AB = BC করবে। পরীক্ষক ৩০ বার রেখা দুটি কমবেশী করে দেবে, এবং পরীক্ষার্থীও AB = BC করবে। পরীক্ষকও প্রতিবার BC অংশ মেপে রাখবে।

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ : "আমি AB অপেক্ষা BC ছোট করেছি তুমি ডান হাত দিয়ে C অংশ টেনে AB = BC করে দাও। আমি যতবার এমনি ছোট করে দেব, ততবার তুমি ঠিক করে দেবে।"

পনবার পরীক্ষা করার পর পরীক্ষক আবার নিম্নরূপ নির্দেশ দেবে।

"আমি এবার AB-র চেয়ে BC বড় করে দিলাম। তুমি D অংশ টেনে AB = BC করে দেবে। আমি যতবার বড় করে দেব, তুমি ততবার সমান করে দেবে।"

ফলাফল :—

		ছোট থেকে সমান করার সময়			বড় থেকে সমান করার সময়		
পরীক্ষণ সংখ্যা	প্রকৃত দৈর্ঘ্য	অনুমিত দৈর্ঘ্য	ভুল	গড় ভুল	অনুমিত দৈর্ঘ্য	ভুল	গড় ভুল
১	৩০ মিঃমিঃ	২৭ মিঃমিঃ	৩ মিঃমিঃ		২৫ মিঃমিঃ	৫ মিঃমিঃ	
২	ঐ	২৮ ,, ,,	২ ,, ,,	৩ মিঃমিঃ	২৭ ,, ,,	৩ ,, ,,	৪ মিঃমিঃ
৩	ঐ	২৬ ,, ,,	৪ ,, ,,		২৬ ,, ,,	৪ ,, ,,	

তালিকা নং—৫

পরীক্ষকের সতর্কতা : পরীক্ষার্থী মাত্র একবার টেনে AB = BC করবে বার-বার চেষ্টা করবে না। আর পরীক্ষার্থীকে কোন মতেই পেছনের স্কেলটি দেখানো চলবে না।

ভ্রান্ত ওজন Weight illusion

৩। **সমস্যা :** ওজনে অধ্যাসের প্রভাব নিরূপণ (To demonstrate weight illusion)

মৌলিক তত্ত্ব : চোখে দেখে আমরা অনেক সময় ভুল অনুমান করি। একে বলে অধ্যাস।
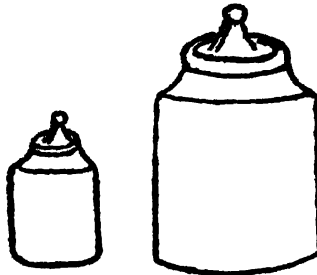
বোতল চিত্র—৭

সাধারণ বিবরণঃ—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ ঃ জোড়া বোতল ও তুলা দণ্ড।

প্রণালী ঃ জোড়া বোতল নাও। ১জোড়া বোতলের ওজন অন্য জোড়া বোতলের ওজন থেকে পৃথক হবে। প্রত্যেক জোড়ার দুটি বোতল এক ওজন বিশিষ্ট কিন্তু বিভিন্ন আকৃতির অর্থাৎ একটি বড় এবং অপরটি ছোট। এইরূপ সমান ওজনের এক এক জোড়া বোতল পরীক্ষার্থীর সামনে রাখ। পরীক্ষার্থী বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার সাহায্যে বোতল দুটি একে একে তুলে বলবে, কোন বোতলটি ভারী। এইরূপে চার জোড়া বোতল নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

ফলাফল ঃ—

পরীক্ষণ নং	বোতলের ওজন	বোতলে আকার	কোনটা ভারী
১	১০০ গ্রাঃ	ছোট	ছোট
	১০০ গ্রাঃ	বড়	
২	৭৫ গ্রাঃ	ছোট	ছোট

তালিকা নং—৬

উপসংহার ঃ—দেখা যাচ্ছে একই ওজন বিশিষ্ট বিভিন্ন আকৃতির বোতলের মধ্যে ছোটটি অপেক্ষাকৃত ভারী মনে হয়। এর কারন হল, বড় ও ছোট দুটি বোতল পাশাপাশি থাকায় আমরা বড় জিনিষটি তোলার সময়, অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি প্রয়োগ করি, কারন আমরা ধরে নিই বড়টি ভারী। ছোটটি তোলার সময় সেই অনুমানের বশেই আবার কম শক্তি প্রয়োগ করি ফলে বোতলটি অপরটির থেকে ভারী মনে হয়।

অন্তর্দর্শন ঃ—বোতলগুলি একে একে তুলে প্রতিবারেই নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি যে ছোটটি বেশী ভারী।

পঞ্চম অধ্যায়

পরাভব মূর্ত্তি (After Image)

৪। **সমস্যা :—**নঞর্থক পরাভব মূর্ত্তি গঠন (To Demonstrate negative After Image)।

মৌলিক তত্ত্ব :—বস্তুর অনুপস্থিতিতে বস্তুকে দর্শন করার নাম পরাভব মূর্ত্তি। পরাভব মূর্ত্তি দুই প্রকার :—(১) সদর্থক পরাভব মূর্ত্তি ও (২) নঞর্থক পরাভব মূর্ত্তি। কোন রং-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকানর পর যদি সাদা দেওয়ালে চোখ রাখা হয় তাহলে সেখানে ঐ রং-এর অনুপূরক রং দেখা যাবে। একে বলে নঞর্থক পরাভব মূর্ত্তি।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—সাদা, লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ রং-এর কাগজ ; আঠা, কাঁচি, স্কেল ও স্টপ ওয়াচ।

প্রণালী :—লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙিন কাগজগুলির থেকে ১ বর্গ ইঞ্চি পরিমান একটি করে টুকরো কেটে নাও। এবার ৪টে বড় কাগজের টুকরো নিয়ে প্রত্যেকটির কোনে রঙের টুকরা ৪টি সেঁটে নাও। ঐ রঙিন কাগজের মাঝখানে একটি কালো কালির বিন্দু দাও, সাদা কাগজের মাঝেও অনুরূপ বিন্দু দিতে হবে।

পরীক্ষার্থীকে বলা হল লাল কাগজের কালো বিন্দুর দিকে তাকাও। "আমি যতক্ষণ না, হ্যাঁ বলি ততক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। হ্যাঁ বলা মাত্র, লাল কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে সাদা কাগজের কালো বিন্দুর দিকে চাইবে। এখন কি দেখছ বল। যে জিনিষটি দেখছ তার রং কি এবং আকার কিরূপ? ও ছবিটা যখন আর দেখতে পাবে না, তখন আমার টেবিলে টোকা দিয়ে জানিয়ে দেবে। চোখ কিন্তু ঐ সাদা কাগজেই রাখবে। আবার যদি ঐ ছবিটী দেখ তাহলে আবার টোকা দেবে, চোখ থেকে সরে গেলে আবার টোকা দেবে। যখন আর একেবারেই দেখছ না, তখন চোখ তুলবে।"

এবার স্টপ ওয়াচ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করবে। ১ মিনিট লাল কাগজের দিকে পরীক্ষার্থী চেয়ে থাকবে তারপর পরীক্ষক হ্যাঁ বলবে। পরীক্ষার্থী কতক্ষণ ভাবমূর্ত্তিটি দেখছে তার সময় নিতে হবে; পুনরায় ভাবমূর্ত্তির স্থায়িত্বের সময় ও

নিতে হবে। উত্তেজক থেকে পরীক্ষার্থীর চোখের দূরত্ব হবে ৪০ সেন্টিমিটার। প্রত্যেকটি কাগজ নিয়ে তিনবার পরীক্ষা করতে হবে।

ফলাফল :—

উত্তেজক	দেখানর সময়	পরাভব মূর্ত্তির রং	আকার	স্থায়িত্ব	পুনরাবির্ভাব	স্থায়িত্ব
লাল কাগজ	১ মি.	সবুজ	চৌকো	১০ সে.	১	৭ সে.
" "		"		১২ সে.		
" "		"		১৫ সে.		
সবুজ কাগজ	১ মি.	লাল	চৌকো	১৫ সে.	১	৬ সে.
" "		"		১০ সে.	১	৪ সে.
" "		"		১২ সে.		
নীল কাগজ	১ মি.	হলুদ	চৌকো	১৫ সে.	১	৫ সে.
" "		"		১০ সে.	১	৬ সে.
" "		"		১৪ সে.		
হলুদ কাগজ	১ মি.	নীল	চৌকো	২০ সে.	১	১০ সে.
" "		"		১৫ সে.	১	৮ সে.
" "		"		১২ সে.	১	৬ সে.

তালিকা নং—৭

৫। **সমস্যা :** সদর্থক পরাভব মূর্ত্তি (To demonstrate positive after image)।

মৌলিক তত্ত্ব : কোন রং বা আলোর দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অনেক সময় অনুপূরক রং না দেখে আমরা সেই রংটিই দেখি। একে বলে সদর্থক পরাভব মূর্ত্তি।

সাধারণ বিবরণ : পূর্ব্বের ন্যায়।

প্রণালী: অন্ধকার ঘরে আলো জেলেই নিভিয়ে দিয়ে পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কি দেখছে।

ফলাফল: পরীক্ষার্থীর উত্তর: শুধু আলোটি সাদা দেওয়ালের গায়ে মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্মরণ ক্রিয়া (Memorising)

১। **সমস্যা:** সংখ্যা তালিকার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর শ্রবণ গত স্মৃতি বিস্তার নির্ণয় (To determine the memory span of the subject by means of digits)।

মৌলিক তত্ত্ব: কোন বিষয় একবার মাত্র শুনে বা দেখে যতটি মনে থাকে, তাকে স্মৃতির বিস্তার (memory span) বলে।

সাধারণ বিবরণ: পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ: ৩টি সংখ্যা তালিকা, কাগজ ও পেন্সিল।

প্রস্তুতি: তিনটি সংখ্যা তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সংখ্যা তালিকা প্রস্তুতের নিয়ম নীচে দেওয়া হল।

(১) তিনটি সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে, প্রত্যেক সারিতে একটি করে সংখ্যা বাড়বে। দশম সারিটি হবে ১২ সংখ্যার। (২) একই সংখ্যা পর পর থাকবে না। (৩) সংখ্যাগুলি ক্রম অনুযায়ী বসানো চলবে না। (৪) একই অঙ্ক কোন সারির প্রথমে বা শেষে বসবে না।

নির্দ্দেশ—

"আমি তোমাকে কয়েকটি সংখ্যা বলব, শোনামাত্র সেই সংখ্যাগুলি আমি যে অনুক্রমে বলেছি, সেই অনুক্রমে তুমি লিখবে। এইভাবে আমি যতক্ষণ বলে যাব, ততক্ষণ তুমি শুনে যাবে এবং প্রতিবার লিখবে।"

পরীক্ষণ প্রণালি: অভীক্ষক ১ম তালিকাটি নিয়ে পরীক্ষা সুরু করবে। প্রথম সারিটি শোনার পর, অভীক্ষার্থী, সেটি লিখবে। এইভাবে সমস্ত তালিকাটি বলা হয়ে গেলে অভীক্ষার্থীকে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দিয়ে দ্বিতীয়

তালিকাটি বলা হবে। আবার পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর তৃতীয় তালিকাটি বলা হবে।

অভীক্ষক খুব তাড়াতাড়ি বা ধীরে সংখ্যাগুলি বলবে না। এক সেকেণ্ডে একটি মাত্র সংখ্যা বলবে। সময় দেখার জন্য অভীক্ষকের কাছে স্টপ ওয়াচ থাকলে ভাল হয়। পরপর দুবার ব্যর্থ হলে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে।

ফলাফল :

১ম তালিকা

পরীক্ষণ নং	সংখ্যা উপস্থাপন	সংখ্যার পুনরাবৃত্তি	ঠিক সংখ্যা ✓ ভুল সংখ্যা ×	প্রাপ্ত মান	সবচেয়ে বেশী মান
১	৩৬৮	৩৬৮	✓	৩	
২	৮২৫৭	৮২৫৭	✓	৪	
৩	৭২৯৪২	৭২৯৪২	✓	৫	
৪	৯৫২৮৫৩	৯৫২৮৫৩	✓	৬	
৫	৪৭৯২৭২১	৪৭৯২৭২১	✓	৭	৭
৬	৬২৮৫২৯৪৮	৬২৮৫১৪৯	×		
৭	৮৪২৫৭৯১৩২	৮৪২৪৫৩	×		

তালিকা নং—৮

২য় তালিকা

পরীক্ষণ নং	সংখ্যা উপস্থাপন	সংখ্যার পুনরাবৃত্তি	ঠিক সংখ্যা-✓ ভুল সংখ্যা-×	প্রাপ্ত মান	সবচেয়ে বেশী মান
১	২৫৮	২৫৮	✓	৩	
২	৪০৭৪	৪০৭৪	✓	৪	
৩	৫৭২৬১	৫৭২৬১	✓	৫	
৪	৬৯৪৮২৫	৬৯৪৮২৫	✓	৬	
৫	৯৫২৭৩১৮	৯৫২৭৩১৮	✓	৭	৭
৬	২৯৭৩৩৪১৯	২৯৭৩৫৭...	×		
৭	৮৫২৯৬১৭৩১	৬৪৩২...	×		

তালিকা নং—৯

৩য় তালিকা

পরীক্ষণ নং	সংখ্যা উপস্থাপন	সংখ্যার পুনরাবৃত্তি	ঠিক সংখ্যা ✓ ভুল সংখ্যা-×	প্রাপ্ত মান	সবচেয়ে বেশী মান
১	৬৯৪	৬৯৪	✓	৩	
২	৭৩৫১	৭৩৫১	✓	৪	
৩	৯৬৮৪২	৯৬৮৪২	✓	৫	
৪	৭৫৮৭৩৬	৭৫৮৭৩৬	✓	৬	
৫	৮৫৭২৬৯৪	৮৫৭২৬৯৪	✓	৭	
৬	৯৪৮৫৭৩০১	৯৪৮৫৭৩০১	✓	৮	
৭	৫৩৮২৭১৬৯৪	৫৩৮২৬৪	×		৮
৮	৯৬৩৬১৫২৮৩৭	৯৭৩৪১৫৩	×		

তালিকা নং—১০

অন্তদর্শন : ৪টি করে সংখ্যা ভাগ করে মনে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, আর শোনার সময় খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, ততই মনে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সিদ্ধান্ত অভীক্ষার্থীর স্মৃতি বিস্তার $= \frac{৭+৭+৮}{৩} = \frac{২২}{৩} = ৭.৩৩$

২। **সমস্যা :**—অক্ষর তালিকার সাহায্যে শ্রবণগত স্মৃতি বিস্তার নির্ণয়। (To determine memory span of the subject anditorily by means of alphabets)

মৌলিক তত্ত্ব :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—৩টি অক্ষর তালিকা, স্টপ ওয়াচ, কাগজ, পেন্সিল।

প্রস্তুত প্রণালী :—পূর্ব্বের ন্যায় কেবল বর্ণ নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

প্রণালী :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ।

ফলাফল :—পূর্ব্বের ন্যায়

সিদ্ধান্ত :—

৩। **সমস্যা :**—কোন কিছুর পরিচিতির সাহায্যে স্মৃতির পরীক্ষা। (To demonstrate memory using recognition method)

মৌলিক তত্ত্ব :—আমরা কোন কিছু শেখার পর মনে সংরক্ষণ করে রাখি। পরে সেই বিষয়টি দেখলে আবার চিনতে পারি। বাইরের উদ্দীপকের সাহায্যে মস্তিষ্কের সংরক্ষিত স্থান উত্তেজিত হয় ফলে আমরা চিনতে পারি।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—৫০টি গাছের ছবি বা ৫২টি তাস। স্টপ ওয়াচ।

প্রণালী :– পরীক্ষক ৫০টি ছবির থেকে ২৫টি পৃথক করে রেখে দেবে। এবার অবশিষ্ট ২৫টি ছবি একে একে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবে। ১টি ছবি ১ সেকেণ্ডের বেশী দেখান হবে না। ২৫টি ছবি দেখান হয়ে গেলে অভীক্ষক সরিয়ে রাখা ২৫টি ছবি ঐ দেখান ছবির সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। এইবার অভীক্ষক একে একে ৫০টি ছবি আবার অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করবে। অভীক্ষার্থীকে বলা হবে—এই ছবিগুলির সঙ্গে তোমাকে দেখান ছবি মিশিয়ে দিলাম। এবার একে একে সব ছবিগুলি তোমায় দেখাব, এর মধ্যে যে ছবিটি তুমি চিনতে পারবে বলবে।" অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর উত্তর লিখে রাখবে। পরীক্ষার্থী যদি ভুল করে যে ছবি দেখান হয়নি তা চিনতে পেরেছে বলে তাও লিখে রাখবে।

ফলাফল :—

পরীক্ষণ নং	দেখান ছবি (২৫+২৫)	পরিচিত—✓ অপরিচিত—×	পরিচিত ছবির সংখ্যা	ভুল করে চেনা
১	১	✓	১৮	৩
	২	✓		
২	৩	×		
	৪	✓		
৩	৫	✓		
	৬	×		

তালিকা নং—১১

অন্তর্দর্শন :—

সিদ্ধান্ত :—

প্রকৃত মান :—১৮ – ৩ = ১৫

অভীক্ষার্থীর নির্ভুল চেনার শতকরা হল $\frac{১৫}{২৫}$ = ·৬০

৪। **সমস্যা :** Learning Method এ স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা।

(To determine the capacity of memory by Learning Method) :—

মৌলিক তত্ত্ব :—সাধারণতঃ স্মৃতি শক্তির পরিমাপ করি কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করতে কতবার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন তা লক্ষ্য করে। যে যত কমবার আবৃত্তি করে শিখতে পারে, তার স্মৃতিশক্তি তত প্রখর।

উপকরণ : Jastrow যন্ত্র, স্টপ ওয়াচ, কাগজ, পেন্সিল ও বারটি অর্থহীন সিলেবলের একটি তালিকা। অভীক্ষার্থীর নাম ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :—

অর্থহীন শব্দ তালিকা প্রস্তুত প্রণালী :—

(১) তিনটি অক্ষর নিয়ে একটি অর্থহীন শব্দ তৈরী হবে।

(২) দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ দুপাশে এবং মধ্যে থাকিবে একটি স্বরবর্ণ।

(৩) শব্দগুলি অর্থহীন হবে।

(৪) একই ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দের আদিতে বা অন্তে থাকবে না।

(৫) সমগ্র তালিকাটিতেই একই ব্যঞ্জনবর্ণ বারবার ব্যবহার করা চলবে না।

(৬) অক্ষরগুলি ক্রম অনুসারে থাকবে না

পরীক্ষণ প্রণালী :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের ন্যায় একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা প্রস্তুত করিবার পর অভীক্ষক Jastrow যন্ত্রের সাহায্যে ঐ শব্দ দেখাবে। একটি শব্দ দেখানোর দুই সেকেণ্ড পর আর একটি শব্দ দেখাতে হবে। ১২টি শব্দ এইভাবে দেখানোর পর অভীক্ষক অভীক্ষার্থীকে সেগুলি লিখতে বলবে। লেখা হলে অভীক্ষক আবার ঐ শব্দগুলি পূর্ব্বের ন্যায় দেখাবে। যতক্ষণ পর্যান্ত না সমস্ত তালিকাটি অভীক্ষার্থী নির্ভুল ভাবে শিখতে পারে, ততক্ষণ অভীক্ষক এইভাবে পরীক্ষা করবে।

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :—"আমি তোমাকে কতকগুলি শব্দ এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখাব। সবগুলি দেখা হয়ে গেলে, আমি যখন বলব তখন তুমি শব্দগুলি ক্রম অনুসারে লিখতে চেষ্টা করবে।
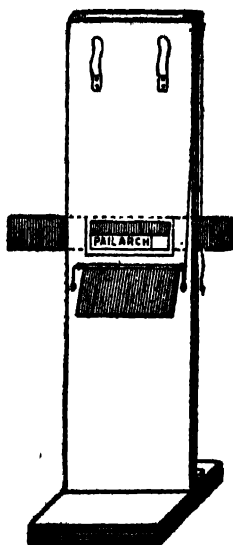
চিত্র—Jastrow যন্ত্র

জ্যাস্ট্রো যন্ত্রের বর্ণনা :—এটি একটি গবাক্ষযুক্ত কাঠের যন্ত্র। ৩০ সে.মি. লম্বা ও ২৫ সে. মি চওড়া একটি কাঠের ওপর ১৭ সেঃ মিঃ লম্বা ও ২৫ সে. মি চওড়া একটি কাঠ লম্বভাবে অবস্থিত, এই কাঠটিতে একটি গবাক্ষ আছে। এই কাঠের পেছনে ২১টি কিলকযুক্ত একটি কাঠের ফ্রেম আছে। কিলকগুলি ২·৫ সে দূরে দূরে অবস্থিত। একটি ছিটকিনির সাহায্যে ফ্রেমটিকে উঠান, নামান যায়। একটি কাগজে পরীক্ষার বিষয়গুলি লিখে এই ফ্রেমে সেঁটে দেওয়া যায়। গবাক্ষের সামনে একটি কাঠের স্ক্রীন থাকে, ঐ স্ক্রীনটি তুলে দিয়ে ছিটকিনির সাহায্যে কাঠের ফ্রেমটা ধীরে ধীরে ওঠান নামান যায় এবং গবাক্ষ দিয়ে অভিক্ষার্থী বিষয়টা দেখে মনে রাখে।

ফলাফল :—

অর্থহীন শব্দ তালিকা	পুনরুদ্রেক							
	১ম বার	২য় বার	৩য় বার	৪র্থ বার	৫ম বার	৬ষ্ঠ বার	৭ম বার	৮ম বার
DUP	DUP	DUP	DUP	DUP	DUP	DUP	DUP	DUP
CEB	CEB	CEB	CEB	CEB	CEB	CEB	CEB	CEB
PAM			PAM	PAM	PAM	PAM	PAM	PAM
NOL	NOL	NOL	NOL	NOL	NOL	NOL	NOL	NOL
SIG				SIG	SIG	SIG	SIG	SIG
TON								TON
MUV						MUV	MUV	MUV
KEN					KEN	KEN	KEN	KEN
VOZ				VOZ	VOZ	VOZ	VOZ	VOZ
LIM			LIM	LIM	LIM	LIM	LIM	LIM
DIX		DIX	DIX	DIX	DIX	DIX	DIX	DIX
BUM	BUM	BUM	RUM	BUM	BUM	BUM	BUM	BUM
ঠিক উত্তর	৪	৫	৭	৯	১০	১১	১১	১২
ঠিক উত্তরের % শতকরা	৩৩%	৪৭%	৫৬%	৭৫%	৮০%	৮৮%	৮৮%	১০০%

তালিকা—১২

মন্তব্য :—১২টি অর্থহীন শব্দ আয়ত্ত করতে অভীক্ষার্থীর ৮ বার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে।

অন্তদর্শন :—অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করার সময় অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করেছি। যেমন D U P বাংলায় অর্থ বিশিষ্ট শব্দ ডুপ হতে পারে। এই ভাবে অর্থ আরোপ করায় আমার খুব সুবিধা হয়েছিল।

৫। **সমস্যা :**—সঞ্চয় পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির পরিমাপ।

(To determine the capacity of memory using saving Method).

মৌলিক তত্ত্ব :—আমরা বারবার আবৃত্তি করে শিক্ষা করি। শিক্ষা করার পর বহুদিন পুনরাবৃত্তি না করলে ভুলে যাই। কিন্তু দেখা গেছে, তখন যদি আবার একই জিনিস শেখান হয় তাহলে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অনেক কম দরকার হয়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :—Jastrow যন্ত্র, স্টপওয়াচ, ১২টি অর্থহীন শব্দের তালিকা, কাগজ ও পেন্সিল।

পরীক্ষণ প্রণালী :—পূর্ব্বের অর্থহীন শব্দের তালিকাটি মুখস্থ করানর ৭ দিন পরে এ পরীক্ষা করতে হবে। পূর্ব্বের তালিকাটি অভীক্ষার্থীকে Jastrow যন্ত্রের সাহায্যে দেখানো হবে। প্রত্যেকটি শব্দ দেখানর পর ২ সেকেণ্ড বিশ্রাম নেবে। সম্পূর্ণ তালিকা আয়ত্ত করতে অভীক্ষার্থীর কতবার দরকার হয়েছে লিখবে।

ফলাফল :—

অর্থহীন শব্দ তালিকা	পুনরুদ্রেক		
	১ম বার	২য় বার	৩য় বার
FOT	FOT	FOT	FOT
KUV	KUV	KUV	KUV
JID	JID	JID	JID
LEX	LEX	LEX	LEX
TOX		TOX	TOX
VUD			VUD
LIV			LIV
DUH		VUD	DUH
MIB	MIB	MIB	MIB
SOR	SOR	SOR	SOR
TUD	TUD	TUD	TUD
NIS	NIS	NIS	NIS
ঠিক উত্তর	৮	১০	১২
ঠিক উত্তরের % শতকরা	৬৭%	৮৩%	১০০%

তালিকা—১৩

অন্তদর্শন :—অর্থহীন ইংরাজী শব্দের অর্থ আরোপ করতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি।

মন্তব্য :—এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে তালিকাটি মুখস্থ করতে অভিক্ষার্থীর ৮ বার লেগেছিল, এখন মাত্র তিনবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে। সুতরাং সঞ্চয় পদ্ধতিতে আটবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে। এক সপ্তাহ পরে সেই তালিকা অভিক্ষার্থীর (৮−৩)=৫ বার কম লাগল। অর্থাৎ ৫ বার লাভ (saving) হল।

৬। **সমস্যা :**—অর্থহীন শব্দ তালিকার সাহায্যে সমগ্র পদ্ধতি ও অংশ পদ্ধতি প্রয়োগের তুলনা মূলক পরীক্ষা।

(To compare part and whole methods of learning using non-sense materials).

মৌলিক তত্ত্ব :—অর্থহীন শব্দ তালিকা সমগ্র পদ্ধতি অপেক্ষা অংশ পদ্ধতিতে শিখলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত শেখা যায়।

সাধারণ বিবরণ :—

উপকরণ :—Jastrow যন্ত্র, ষ্টপওয়াচ, দুইটি ১২টি শব্দ বিশিষ্ট অর্থহীন শব্দ তালিকা।

পরীক্ষণ-প্রণালী :—দুটি অর্থহীন শব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হল। এখন Jastrow যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম চারটি শব্দ একে একে দেখাম হল। প্রত্যেকটি শব্দ ২ সেকেণ্ড ধরে দেখান হবে। এই ৪টি শব্দ মুখস্থ করানর জন্য আরও কয়েকবার ঐ একই ভাবে শব্দগুলি দেখানো হল এবার পরের ৪টি শব্দ ঐ একই ভাবে মুখস্থ করা হল। এই ৪টি শব্দ মুখস্থ হয়েছে দেখলে শেষ ৪টি শব্দ একই ভাবে মুখস্থ করাতে হবে। সমস্ত তালিকাটি শিখতে অভীক্ষার্থীর কত সময় লাগল তা অভীক্ষক লিখে রাখবেন।

এবার দ্বিতীয় তালিকাটির ১২টি শব্দ একের পর এক Jastrow যন্ত্রের সাহায্যে অভীক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত কর। সমগ্র তালিকাটি মুখস্থ করতে অভীক্ষার্থীর কত সময় লেগেছে লক্ষ্য করতে হবে।

ফলাফল :—

অংশ পদ্ধতিতে শেখা

অর্থহীন শব্দ তালিকা	পুনরুদ্রেক					
	১ম বার	২য় বার	৩য় বার	৪র্থ বার	৫ম বার	সম্পূর্ণ সময়
TOG	TOG			TOG	TOG	
VAT	VAT			VAT	VAT	
BOD	BOD			BOT	BOD	
BES	BES			BES	BES	
MER		MER			MER	
SIR		SIR			SIR	
LUT		LUT		LUT	LUT	
DIV		DIV		DIV	DIV	
SUD			SUD	SUD	SUB	
NOF			NOF	NOF	NOF	
GIL			GIL	GIL	GIL	
VIB			VIB	VIB	VIB	
ঠিক উত্তর	৪	৪	৪	১০	১২	
ঠিক উত্তরের শতকরা	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	
সময়	১ মিঃ	১ মিঃ	১ মিঃ	১ মিঃ ৪ সেঃ	১ মিঃ ১৬ সেঃ	৫ মিঃ ২০ সেঃ

তালিকা—১৪

সমগ্র পদ্ধতিতে শেখা

অর্থহীন বর্ণ তালিকা	পুনরুদ্রেক					
	১ম বার	২য় বার	৩য় বার	৪র্থ বার	৫ম বার	৬ষ্ঠ বার
GIL DUB VAL PUM ZOS TIB LOR POM GAD LUS TID PEM	GIL DUB VAL PUM ZOS TID PEM	GIL DUB VAL PUM ZOS LUS TID PEM	GIL DUB VAL PUM ZOS GAD LUS TID PEM	GIL DUB VAL PUM ZOS TIB GAD LUS TID PEM	GIL DUB VAL PUM ZOS TIB LOR GAL LUS TID PEM	GIL DUB VAL PUM ZOS TIB LOR POM GAD LUS TID PEM
ঠিক উত্তর	৬	৮	৯	১০	১১	১২
ঠিক উত্তরর শতকরা%	৫৮%	৬৭%	৭৫%	৮৩%	৯২%	১০০%
সময়	৯ মিনিট					

তালিকা—১৫

অন্তদর্শন :—৪টে, ৪টে শব্দ মুখস্থ করতে মোটেই সময় লাগেনি। কিন্তু সমগ্র তালিকাটি মুখস্থ করতে সময় বেশী লেগেছে আর বিরক্তিকর মনে হয়েছে।

মন্তব্য :—অর্থহীন শব্দ তালিকার ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতিতে শিখতে কম সময় লাগে। সমগ্র পদ্ধতিতে বেশী সময় লাগে।

৭। **সমস্যা :**—গদ্যের সাহায্যে সমগ্র পদ্ধতি ও অংশ পদ্ধতি প্রয়োগের তুলনা মূলক পরীক্ষা (To compare part and whole method of learning using Prose presented auditorily).

মৌলিক তত্ত্ব :—সমগ্র পদ্ধতিতে কোন অর্থযুক্ত বিষয় শিখতে অনেক কম সময়ের দরকার হয়। অংশ পদ্ধতিতে শিখতে দেরী হয়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্বের ন্যায়।

উপকরণ :—দুটি একই ধরণের গদ্যাংশ, স্টপ ওয়াচ।

পরীক্ষণ প্রণালী :—গদ্যাংশ দুটি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন তাদের দৈর্ঘ্য ও দুরূহতা যথা সম্ভব একই প্রকার হয়। প্রথমে পরীক্ষার্থীকে প্রথম গদ্যাংশটিকে অংশ পদ্ধতিতে শিখতে দেওয়া হল। এই গদ্যাংশটিকে দুই সমান ভাগ করে নিতে হবে। অভীক্ষার্থী প্রথম অংশটি বারবার পড়ে মুখস্থ করবে। তারপর দ্বিতীয় অংশটি অনুরূপ ভাবে মুখস্থ করবে। এই ভাবে সমস্ত গদ্যাংশটি শিখতে কতটা সময় লাগল অভীক্ষক লিখে রাখবে। পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর এবার সমগ্র দ্বিতীয় গদ্যাংশটি অভিক্ষককে মুখস্থ করতে দেবে। অভীক্ষার্থীর মুখস্থ করতে কত সময় লাগল অভিক্ষক লিখে রাখবে।

অন্তর্দর্শন :—সমস্ত গদ্যটী মুখস্থ করার সময় তার ভাবটি মনে রেখে মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু অংশ, অংশ করে মুখস্থ করার সময়, তার ভাবটি ভাল করে ধরতে পারিনি।

ফলাফল :—১ম তালিকাটি অংশ পদ্ধতিতে শিখতে লেগেছে-৭ মিনিট দ্বিতীয় তালিকাটি সমগ্র পদ্ধতিতে শিখতে সময় লেগেছে-৫ মিনিট।

অর্থাৎ সমগ্র পদ্ধতিতে অর্থপূর্ণ বিষয় শিক্ষা করে ২ মিনিট সময়ের সাশ্রয় হয়েছে।

মন্তব্য :—অর্থ বিশিষ্ট বিষয় আয়ত্ত করতে হলে সমগ্র পদ্ধতিতে কম সময়ে শেখা যায়। অংশ পদ্ধতিতে বেশী সময় লাগে।

সপ্তম অধ্যায়

রং-এর মিশ্রণ (Colour mixing)

১। **সমস্যা :**—রং সংমিশ্রনের সূত্রগুলি পরীক্ষা। (**To demonstrate the laws of colour mixtures**).

মৌলিক তত্ত্ব :—রং সংমিশ্রণের সূত্র তিনটি।

(১) অনুপূরক দুটি রং ঠিক অনুপাতে মিশ্রিত করলে পরস্পরকে বিলুপ্ত

করে এবং ধূসর রং-এর সংবেদন দেয় এবং ঠিক অনুপাতে মিশ্রিত না করলে যে রংটি বেশী থাকে সেটা বেশী ফুটে ওঠে।

(২) পরস্পরের অনুপূরক নয় এমন দুইটি রং মিশ্রিত করলে তাদের অন্তর্বর্তী রঙের সৃষ্টি হয়।

(৩) দু জোড়া অনুপূরক রং ঠিক অনুপাতে মিশ্রিত করলে ও ধূসর রং-এর সংবেদন দেয়।

সাধারণ বিবরণঃ পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণঃ সাদা, কালো, লাল, সবুজ, হলুদ ও নীল রং-এর চাকতি, রং সংমিশ্রক যন্ত্র, চাঁদা, স্ক্রীন।

পরীক্ষণ-প্রণালীঃ ১০ অথবা ৮ সেন্টিমিটার ব্যাসার্দ্ধে, চাকতিগুলি কাট। চাকতির মাঝখানটা গোল করে কাটা থাকবে, যাতে বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে লাগানো যায়। চাকতিগুলোর ব্যাসার্দ্ধ বরাবর, কাটা থাকবে; এই কাটা অংশের মধ্যে দিয়ে একটী চাকতি দিয়ে আর একটা চাকতির অংশ দরকার মত ঢাকা যায়।

প্রথমে অভীক্ষক ১৮০° সাদা ও ১৮০° কালো রং-এর একটি চাকতি ঘোরাবে এবং যে ধূসর রং-এর সৃষ্টি হবে সেটি অভীক্ষককে দেখাবে।

১ম সূত্রঃ এবার অভীক্ষক পর্দার আড়ালে যন্ত্রটি রেখে যন্ত্রে লাল ও সবুজ চাকতি দুটি এমন ভাবে আটকাবে যেন ঘূর্ণায়মান অবস্থায় তারা ধূসর রং-এর সংবেদন দেয়। অভীক্ষক অভীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করবে সে কি রং দেখছে? এবং আগের দেখা ধূসর রং-এর মত এই ধূসরটি কি না। এবার চাঁদা দিয়ে রং-এর চাকতিগুলির কৌণিক পরিমাণ মেপে নিতে হবে।

নীল ও হলুদ রং-এর ডিস্ক দুটি একসঙ্গে এমনভাবে বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে আটকানো হল যেন তারা ধূসর রং-এর সৃষ্টি করে। অভীক্ষার্থী এবার ও ধূসর রং হল কি না বলবে এবং প্রথমে দেখা ধূসর রংটি এই রং-এর অনুরূপ কিনা তাও বলবে। চাঁদা দিয়ে অভীক্ষক চাকতি দুটির কোণ পরিমাপ করে নেবে।

২য় সূত্রঃ লাল ও নীল রং দুটি বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে আটকে দেওয়া হল। অভীক্ষার্থী কি রং দেখছে বলবে। অভীক্ষক চাঁদা দিয়ে রং দুটো মেপে নেবে। অনুরূপ ভাবে লাল হলুদ এবং নীল সবুজ রং দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। অভীক্ষার্থী প্রতিবারই কি রং দেখছে বলবে অভীক্ষক চাঁদা দিয়ে রং-এর ডিস্কগুলির কোণ পরিমাপ করবে।

৩য় সূত্র : লাল, সবুজ ও নীল হলুদ রং-এর তিনটী বর্ণমিশ্রক যন্ত্রে এমনভাবে আটকান হল যে সেগুলি একসঙ্গে ঘোরালে ধূসর রং-এর সৃষ্টি করবে। অভীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হবে সে কি রং দেখছে এবং এই ধূসর বর্ণ প্রথম বার দেখানো ধূসর বর্ণের অনুরূপ কিনা তাও জিজ্ঞাসা করতে হবে। অভীক্ষক চাঁদা দিয়ে তিনগুলির কোণ পরিমাপ করবে।

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ : এই বর্ণ মিশ্রক যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে বসবে। প্রথমে যে ধূসর রংটি দেখছ ভাল করে লক্ষ্য কর। এবার আমি অন্য কতগুলি চাকতি এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘোরাব। যখনই তুমি পূর্ব্বের দেখা ধূসর রং-এর অনুরূপ ধূসর রংটি দেখবে, আমাকে বলবে। এরপর আমি অন্য কতগুলি চাকতি ঘোরাব, তখন কি রং দেখবে পরিষ্কার বলবে।

অভীক্ষকের সতর্কতা : (১) চাকতি গুলি শক্ত করে বর্ণমিশ্রকে আটকাতে হবে। দেখতে হবে সেগুলি যেন নড়াচড়া না করে।

(২) চাকতিগুলি খুব জোরে ঘোরাতে হবে।

(৩) চাকতিগুলি ঘোরানর সঙ্গে সঙ্গেই অভীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবে না। প্রথমের দিকে অন্য রং ছিটকে (flicker) দেখা দিতে পারে।

ফলাফল :

১ম সূত্র

রংএর নাম	রংএর পরিমাণ ডিগ্রি°	রংএর সংবেদন
সাদা কালো	১৮০° ১৮০°	ধূসর
নীল হলুদ	১৩০° ২৩০°	ধূসর
লাল সবুজ	১১০° ২৫০°	ধূসর

তালিকা—১৬

২য় সূত্র

রং-এর নাম	রং-এর পরিমাণ ডিগ্রি°	রং সংবেদন
লাল ও হলুদ	১৮০°+১৮০°	কমলা
লাল ও নীল	১৮০°+১৮০°	বেগুনি
সবুজ ও নীল	১৮০°+১৮০°	কচি কলাপাতা

তালিকা—১৭

৩য় সূত্র

রং-এর নাম	রং-এর পরিমাণ	রং সংবেদন
সাদা+কালো	১৮০°+১৮০°	ধূসর
লাল সবুজ নীল হলুদ	৮০° ৯০° ৮০° ১১০°	ধূসর

তালিকা—১৮

অন্তর্দর্শন : রংগুলি সব সময় ধূসর মনে হয়নি। অনেকটা বিস্কুট রং-এর মত লাগছিল। রং-এর নাম করনের সময় খুব মুস্কিল হয়েছিল। রংগুলো বেশ ভালোই লাগছিল কিন্তু ওগুলো কি রং ঠিক বলা যায় না। তাই নানাভাবে বোঝানর চেষ্টা করেছি।

মন্তব্য : পরীক্ষাগারে যে রংগুলি নিয়ে আমরা কাজ করি সেগুলি বিশুদ্ধ নয় তাই ঠিক ধূসর রং পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে প্রভেদ

১। **সমস্যা :** বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ করা। (**To demonstrate weight and height of different persons**)।

মৌলিক তত্ত্ব : বিভিন্ন ব্যক্তির দৈহিক ওজন ও উচ্চতার তারতম্য হয়ে থাকে। এবং এই তারতম্য তাদের মানসিক গঠনেও বিভিন্নতা আনে।

সাধারণ বিবরণ : পূর্ব্বের অনুরূপ।

উপকরণ : একটি উচ্চতা মাপক যন্ত্র ও একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্র।

যন্ত্রের বর্ণনা : (১) উচ্চতা মাপক যন্ত্র (Stand iometer) একটি কাঠের দণ্ড। এই দণ্ডটি আর একটি কাঠের ওপর বসানো। এই দণ্ডের গায়ে স্কেল
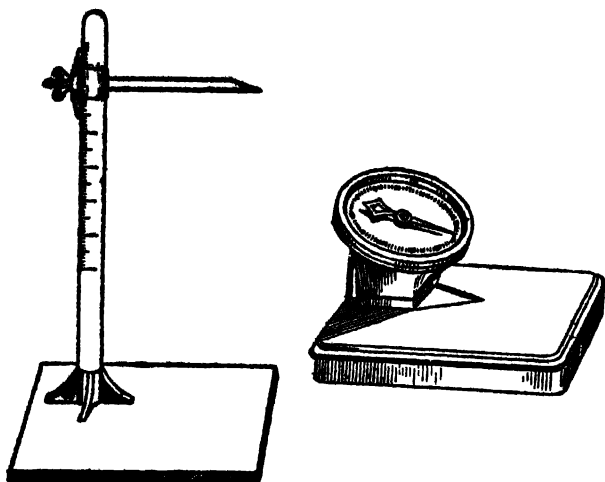
চিত্র ১০—Standiometer ও weighing scale

আঁকা আছে। আর একটি পাতলা কাঠ দণ্ডের উপর দিকে লাগানো আছে। এই কাঠটা তলার কাঠের সমান্তরাল। এই কাঠটিকে ইচ্ছামত উপরে নীচে সরান যায়। তলার কাঠটির উপর দাঁড়িয়ে ওপরের কাঠটি মাথায় স্পর্শ করিয়ে দিয়ে দণ্ডের গায়ে যে স্কেল আছে তার থেকে উচ্চতা দেখে নিতে হয়। তলার কাঠটির ওপর বাবু হয়ে অভীক্ষার্থীকে বসিয়ে বসার উচ্চতা নিতে হবে।

(২) **ওজন পরিমাপক যন্ত্র** (Weighing machine) :—ইহা গোলাকার ধাতু নির্মিত একটা যন্ত্র। যন্ত্রটা ঘড়ির মত দেখতে। এতে একটা আছে আর আছে ঘড়ির কাঁটার মত একটা কাঁটা। যার ওজন নেওয়া হবে সে ঐ যন্ত্রের উপরে উঠবে। ঐ কাঁটা স্কেলে যে দাগ নির্দেশ করবে, সেইটি হবে উক্ত ব্যক্তির ওজন।

পরীক্ষণ প্রণালী : অভিক্ষার্থীর দাঁড়ানো অবস্থার উচ্চতা নিতে হবে। খালি পায়ে স্টেডিও মিটার যন্ত্রে দাঁড়াবে, অভিক্ষককে ওপরের কাঠটি অভক্ষার্থীর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে স্কেল থেকে উচ্চতা লিখে নিতে হবে।

অভিক্ষার্থী এবার স্টানডিওমিটারের ওপর সোজা হয়ে বসবে, মাথায় কাঠটি স্পর্শ করবার পর অভীক্ষক উচ্চতা লিখবেন।

ওজনের পরিমাপ করার সময় অভীক্ষার্থী খালি পায়ে সম্মুখে দৃষ্টি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, অভিক্ষক ওজনটি দেখে লিখে রাখবে।

এইভাবে একে একে ২৫ জনের ওজন ও উচ্চতা অভিক্ষক পরিমাপ করবে।

ফলাফল :

অভিক্ষার্থীর নাম	বয়স	দাঁড়ানোর উচ্চতা	বসার উচ্চতা	ওজন	মিন	মিডিয়ান	

অভীক্ষকের সতর্কতা : ওজন নেবার সময় কারো পায়ে জুতো, গরম জামা, ভারী কোট বা জিনিষপত্র যেন না থাকে দেখতে হবে। উচ্চতা মাপবার সময় কাঠটি অভীক্ষার্থীর মাথায় সাবধানে স্পর্শ করাতে হবে, যেন তার মাথায় আঘাত না লাগে।

২। **সমস্যা :** হাতের মুঠির জোর পরীক্ষা (To measure the strength of the grip)।

মৌলিক তত্ত্ব : শারীরিক শক্তি ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন। অতএব হাতের মুঠির জোর পরীক্ষা করে আমরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নির্ণয় করি।

সাধারণ বিবরণ : পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ। ডায়নামোমিটার।

যন্ত্রের বর্ণনা : এই যন্ত্রটিতে স্প্রিং আছে। হাত দিয়ে ধরবার জন্য দুটি ষ্টিরাপ (Stirrup) আছে। বাইরের ষ্টিরাপ থেকে ভেতরের ষ্টিরাপটি মুঠি
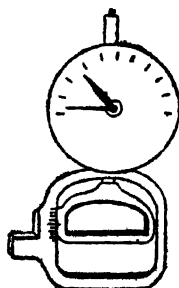
চিত্র ১১—ডায়নামোমিটার

করে ধরে চাপ দিতে হয়। সেই জন্যে বাইরের ষ্টিরাপ ও ভেতরের ষ্টিরাপের দূরত্ব এমনভাবে ঠিক করে নিতে হবে যাতে সব চেয়ে জোরে চাপ দেওয়া

যায়। সাধারণতঃ ষ্টিরাপ ছুটির দূরত্ব বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে কড়ে আঙুলের দূরত্বের অর্দ্ধেকের সমান রাখা হয়। হাতের মুঠির জোর মাপিবার জন্য এতে একটি গোলাকার স্কেল আছে এবং কাঁটা আছে। এই কাঁটা যেখানে নির্দেশ দেবে, সেইটি হবে মুঠির জোর।

পরীক্ষণ প্রণালী : ষ্টিপারটি ঠিক করে নিয়ে মুঠির জোর পরীক্ষা সুরু করতে হবে। মুঠির চাপে কাঁটাটি যে অঙ্ক নির্দেশ করবে সেইটিই হবে হাতের মুঠির জোর। একবার ডান হাতে ও একবার বাম হাতে পরীক্ষা করতে হবে। ১০ সেকেণ্ডের ব্যবধানে এই পরীক্ষা করা হবে। অন্ততঃ তিনবার ডান হাতে এবং তিনবার বাম হাতে পরীক্ষা করবে। ২০ জন ব্যক্তির হাতের মুঠির জোর পরীক্ষা করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

অভীক্ষাথীর প্রতি নির্দেশ : "এই ষ্টিরাপটি একবার ডান হাতে ও একবার বাম হাতে চাপ দিতে হবে। আমি যখন যে হাতে চাপ দিতে বলব, তুমি সেইমত চাপ দেবে। যত জোরে পার চাপ দেবে।"

ফলাফল :

অভীক্ষার্থীর নাম	বয়স	ডান হাত			সবচেয়ে বেশী জোর	বাম হাত			সবচেয়ে বেশী বাম হাতের জোর	দুই হাতে সবচে[illegible] বেশী জো[illegible]
		১	২	৩		১	২	৩		
শর্মিলা চ্যাটার্জি	১৪	১০ kg.	১২ kg.	১২ kg.	১২ kg.	১০ kg.	৯ kg.	১০ kg.	১০ kg.	১২ kg.
পারমিতা বসু	১৪	১১ kg.	১১ kg.	১১ kg.	১১ kg.	১০ kg.	১০ kg.	১০ kg.	১০ kg.	১১ kg.

তালিকা-২০

৩। **সমস্যা :**—মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাপ করা (To determine the cephalic index of the subject)।

মৌলিক তত্ত্ব :—মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ থেকে cephalic index বার করা যায়। cephalic index এর সূত্র হল cephalic index = $\frac{\text{প্রস্থ}}{\text{দৈর্ঘ্য}} \times ১০০$। এই index দেখে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নিরূপন করা হয়।

সাধারণ বিবরণ :— পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—ক্যালিপার (Caliper)।

Caliper যন্ত্রের বর্ণনা :—এই যন্ত্রটি অনেকটা বেড়ীর মত দেখতে। মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এর সাহায্যে মাপা হয়। এতে একটা স্কেল লাগানো থাকে। যন্ত্রের দু দিকটা মাথায় শক্ত করে চেপে স্কেল থেকে মাথার মাপ দেখে নিতে হয়।
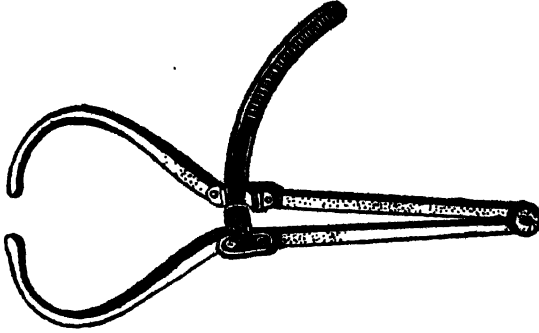
চিত্র ১২—ক্যালিপার

পরীক্ষণ প্রণালী :—অন্ততঃ ১৫ জনের মাথার মাপ নিতে হবে। প্রথমে মাথার প্রস্থের মাপ নিতে হবে। দুই কানের উপরের দিকে ক্যালিপারের দুই দিক আটকে দিতে হবে। এর পর যন্ত্রে লাগানো স্কেলের সাহায্যে মাথার সব চেয়ে চওড়া অংশের মাপ নিতে হবে। তারপর মাথার দৈর্ঘ্যের মাপ নিতে হবে। দুই ভ্রূর মাঝখানে ক্যালিপারের একদিক শক্ত করে ধরে মাথার উপর দিয়ে পেছন দিকে চেপে ধরে মাপ নিতে হবে।

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :—মাথা সোজা রেখে বসবে। নড়বে না। আমি তোমার মাথার মাপ নেব।

ফলাফল :

পরীক্ষার্থীর নাম	মাথার প্রস্থ	মাথার দৈর্ঘ্য	Cephali index $\frac{\text{প্রস্থ}}{\text{দৈর্ঘ্য}} \times ১০০$	মাথার শ্রেণীকরণ
	১২০ মিঃ মিঃ	১৫০ মিঃ মিঃ	৮০ mm.	Meso cephalic
মীরা সেন	১২০ মিঃ মিঃ	১৪০ মিঃ মিঃ	৮৫·৭১	Brachy cephalic
শিখা ঘোষ	১০০ মিঃ মিঃ	১৫০ মিঃ মিঃ	৬৬·৬৭	Dolicho cephalic
অরুন্ধতী মুখার্জি	১৪০ মিঃ মিঃ	১৯০ মিঃ মিঃ	৭৩·৬৮	Dolicho cephalic

মন্তব্য :— cephlic index এর সাহায্যে মাথার খুলির শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যাদের cephalic index ৭৫ এর কম তাদের বলে লম্বা মাথা, ডলিকো সেফালিক (Dohcho cephalic)। index যদি ৭৫ থেকে ৮১ এর মধ্যে হয় তাহলে তাকে বলা হয় মাঝামাঝি মাথা (Meso cephalic), যদি ৮১ এবং ৮১ থেকে ৮৭ এর মধ্যে থাকে তাহলে তাকে বলা হয় চওড়া মাথার দলে (Brachy cephalic)। ৮৭ এবং ৮৭ এর বেশী হলে অত্যন্ত চওড়া মাথার দলে (Hyper Brachy cephelic) পড়বে।

অষ্টম অধ্যায়

রং পছন্দ

১। **সমস্যা** :—অনুক্রমিক তুলনা পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষার্থীর বিভিন্ন বর্ণের প্রতি অনুরাগ নিরূপণ করা। (To demonstrate colour preference using serial method)।

মৌলিক তত্ত্ব :—নানা পরিবেশিক এবং ব্যক্তিগত কারণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রংএর প্রতি অনুরাগ জন্মে।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—ছয়টি বিভিন্ন বর্ণ সম্পন্ন রঙিন কার্ড।

পরীক্ষণ প্রণালী :—লাল, নীল, হলুদ, কমলা, বেগুনি ও সবুজ রংএর কয়েকটি কার্ড নেওয়া হবে। অভীক্ষক বিভিন্ন কার্ডগুলি অভিক্ষার্থীকে দেখতে দেবেন। অভীক্ষার্থীর যে রংটি সব চেয়ে ভালো লাগে তুলে নেবে। পছন্দ করা কার্ডটি সরিয়ে রেখে অভীক্ষক অবশিষ্ট কার্ডগুলির থেকে আবার যে রংটি সব চেয়ে পছন্দ বেছে রাখবে। অভীক্ষক এ কার্ডটিও সরিয়ে রাখবে। এই ভাবে অভীক্ষক অবশিষ্ট কার্ডগুলি দেখাবে। অভীক্ষার্থী যে রংটি প্রথমে পছন্দ করেছিল সেইটি হবে বর্ণানুরাগের প্রথম রং, তার পরেরটি হবে দ্বিতীয় রং। পরীক্ষার সুবিধার জন্য রংগুলির পিছনে A, B, C, D, E, F, লিখে রাখবে।

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দ্দেশ :—আমি তোমাকে রঙিন কার্ডগুলি দেখাব। খুব ভাল করে দেখে তোমার যে রংটি সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে সেটি বেছে নেবে। এরপর আবার অবশিষ্ট রংগুলি তোমায় দেখাব। আবার তুমি যে রংটা সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে বেছে নেবে। এই ভাবে আমি যতবার তোমায় রঙিন কার্ড দেখাব, ততবার তুমি একটি করে রং পছন্দ করবে।

লাল—A, নীল—B, হলুদ—C, কমলা—D, বেগুনি—E, সবুজ—F, এইভাবে অভীক্ষক কার্ডের পেছনে লিখে রাখবে।

ফলাফল :—

অভীক্ষার্থীর পছন্দের অনুরূপ :—

ABCDEF	D
ABCEF	A
BCEF	C
BEF	B
EF	E
F	F

তালিকা—২২

মন্তব্য :—অভীক্ষার্থীর সবচেয়ে বেশী পছন্দ হল D অর্থাৎ কমলা রং ; তার পর পছন্দ A অর্থাৎ লাল, তারপর যথাক্রমে হলুদ, নীল, বেগুনি ও সবুজ।

অন্তর্দর্শন :—প্রথমের দিকে রংগুলি ভালোই লেগেছিল। কিন্তু শেষের দিকের রং আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তাই ইচ্ছা না থাকলেও বেছে নিয়েছি।

২। **সমস্যা :—**যুগ্ম পদ্ধতিতে অভীক্ষার্থীর বর্ণানুরাগ নির্ণয়। (To demonstrate colour perference using paired comparison method).

মৌলিক তত্ত্ব :—নানা কারণে আমাদের রংএর উপর অনুরাগ জন্মায়। দুটি রং একসঙ্গে দেখালে যেটি সব চেয়ে ভালো লাগে তুলনা করে সেটি বেছে নেওয়া যায়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের অনুরূপ।

উপকরণ :—ছয়টি রঙিন কাগজের কার্ডবোর্ড এবং রঙিন কার্ডগুলি দেখাবার জন্য উপযুক্ত ফ্রেম।

পরীক্ষণ প্রণালী :—একটি কার্ডবোর্ডের মাঝখানে একইঞ্চি ব্যবধানে দুটি ছিদ্র করা হল। ছিদ্রগুলির পরিমাপ হবে এক বর্গইঞ্চি। এই ফ্রেমের ছিদ্র দ্বারা যুগ্ম রং দেখান যায়। কার্ডবোর্ডের ফ্রেমটি সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। সাদা পশ্চাদপটে রংগুলি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠবে। লাল, নীল, হলুদ, কমলা, বেগুনি ও সবুজ কার্ডের পেছনে যথাক্রমে A, B, C, D, E, ও F লিখে রাখতে হবে।

এইবার ছয়টি রং নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করতে হবে। জোড়ার সংখ্যার সূত্র হল, $\frac{N(N-1)}{2}$। N = মোট রংএর সংখ্যা। অতএব ৬টি রংএর সম্ভাব্য জোড়া হবে $= \frac{6(6-1)}{2} = 15$ এবার রংগুলিকে ইচ্ছামত উল্টে পাল্টে সাজিয়ে নিয়ে অভীক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করতে হবে। ১ম ছকে রংগুলি কিভাবে উপস্থাপিত করা হবে দেখান হবে। দ্বিতীয় ছকে পরীক্ষার্থীর রংএর পছন্দ লেখা হবে। তৃতীয় ছকে অভীক্ষার্থী কতবার কোন রংটি পছন্দ করল লেখা হবে।

১ম ছক (রং উপস্থাপন)

	A	B	C	D	E
B	1				
C	3	2			
D	5	6	7		
E	10	11	12	13	
F	4	8	9	14	15

AB প্রথমে, BC দ্বিতীয় বারে, AC তৃতীয় বারে দেখান হবে ইত্যাদি।

২য় ছক (রংএর পছন্দ)

	A	B	C	D	E
B	B				
C	A	C			
D	A	B	D		
E	A	F	C	E	
F	A	B	F	F	E

রং পছন্দ

৩য় ছক (পছন্দ রংএর সংখ্যা)

রং	A	B	C	D	E	F
পছন্দের সংখ্যা	৪	৩	২	১	২	৩

দশম অধ্যায়

মনোযোগ

১। **সমস্যা** :—মনোযোগের পরিসর নির্ণয় (To determine the span of attention of the subject)·

মৌলিক তত্ত্ব :—এক মুহূর্তের জন্য দেখে যে কয়টি বস্তু বা বিষয় মনে রাখা যায় তাকে বলে মনোযোগের পরিসর।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্বের ন্যায়।

উপকরণ :—ট্যাচিস্টোস্কোপ, ষ্টপওয়াচ, তিনটি সংখ্যা তালিকা, কাগজ ও পেন্সিল।

সংখ্যা তালিকা প্রস্তুত প্রণালী :—সংখ্যা তালিকাগুলি প্রস্তুত করিবার সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলির অনুসরণ করতে হবে।

(১) সংখ্যার মধ্যে কোন ক্রম ব্যবহার হইবে না।

(২) কোন অঙ্ক পর পর ব্যবহার করবে না।

(৩) একই অঙ্ক সংখ্যা সারির প্রথমে এবং শেষে ব্যবহৃত হবে না।

(৪) কোথাও 0 শূন্য ব্যবহার চলবে না।

(৫) দুই অঙ্ক থেকে আরম্ভ করে আট অঙ্ক পর্য্যন্ত সংখ্যার সারি হবে। প্রত্যেক সারিতে একটি করে অঙ্ক বাড়বে।

ট্যাচিস্টোস্কোপের বর্ণনা :—এই যন্ত্রটিতে একটি গবাক্ষ আছে। এই গবাক্ষ দিয়ে মুহূর্তের জন্য কোন বিষয় দেখান যায়। বিষয়টি পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরীক্ষণ প্রণালী :—সংখ্যা তালিকা প্রস্তুত করা হলেপরীক্ষা আরম্ভ হবে। অভীক্ষার্থী ট্যাচিস্টোস্কোপ যন্ত্রের যে দিকে গবাক্ষ আছে, সেই দিকে বসবে। ট্যাচিস্টোস্কোপ যন্ত্র থেকে ৪০ সেন্টিমিটার দূরে অভীক্ষার্থীকে বসানো হবে। প্রথমে অভীক্ষার্থীকে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সারিটি এক মুহূর্তের জন্য দেখান হবে এবং তাকে বলা হবে ঐ সংখ্যাগুলি নির্ভুল ভাবে লিখতে। এইবার প্রত্যেক বারে একটি করে সংখ্যা বাড়িয়ে অভীক্ষার্থীকে দেখান হল। প্রত্যেক বারই অভীক্ষক এক লহমায় যা দেখেছে লিখবে। ১ম তালিকা এইভাবে শেষ হলে

প্রতীকার্থী ৫ মিনিট বিশ্রাম করবে। তারপর ২য় তালিকা দেখান হবে। এইভাবে তিনটি তালিকা দেখান হবে। পরীক্ষার্থী যতগুলি সংখ্যা নির্ভুল ভাবে লিখতে পারবে তত মান তাকে দেওয়া হবে। প্রতীকার্থী পর পর দুবার ব্যর্থ হলে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে।
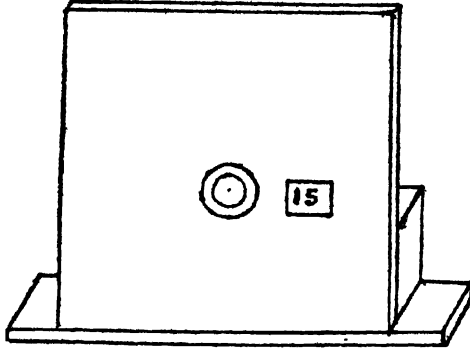
চিত্র ১৩—ট্যাচিস্টোকোপ

পরীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ :—এই যন্ত্রের সামনে স্থির হয়ে বোস। এই গবাক্ষ দিয়ে আমি তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য কিছু দেখাব :—তুমি একমনে দেখবে। তারপর যা দেখলে এই কাগজে লিখবে। এইভাবে আমি যতবার প্রস্তুত বলব তুমি মন দিয়ে দেখবে আর কি দেখেছ লিখবে।

অন্তদর্শন :—এত অল্প সময়ের জন্য সংখ্যাগুলি দেখানো হয়েছে যে ইচ্ছা থাকলেও বেশী সংখ্যা দেখতে পাইনি। প্রথমে সংখ্যা দেখেছি, মুহূর্ত্তের মধ্যে গবাক্ষ বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর কটি সংখ্যা দেখেছি মনে মনে গুণে লিখেছি।

ফলাফল :—

১ম তালিকা

পরীক্ষণ নং	সংখ্যা উপস্থাপিত	সংখ্যা পুনরাবৃত্ত	ঠিক সংখ্যা √	মান	সবচেয়ে বেশী মান
১	৩৯	৩৯	√	২	
২	৭৫২	৭৫২	√	৩	
৩	৮১৬৪	৮১৬৪	√	৪	৪

অনুরূপ ভাবে ২য় ও ৩য় তালিকা লিখতে হবে।

অভীক্ষার্থীর মনোযোগের পরিসর $= \frac{৪+৪+৪}{৩} = \frac{১২}{৩} = ৪$

মন্তব্য : মনোযোগের বিস্তার ৪—৫ এর মধ্যে হয়। এত অল্প সময়ের জন্য দেখান হয় বলে এতে স্মৃতির সাহায্য নিয়ে মুখস্থ করা যায় না। এক মুহূর্তে মানুষ যতটুকু দেখতে পারে তত টুকুই তার মনোযোগের পরিসর। এর বেশী কোন বিষয়ে সে চেষ্টা করলেও মন দিতে পারবে না।

২। **সমস্যা :**—মনোযোগের বিচলণ ও স্থায়িত্ব পরিমাপ করা (To measure fluctuation and duration of attention).

মৌলিক তত্ত্ব :—আমাদের মন কখনও একটি বিষয়ের উপর বহুক্ষণ থাকতে পারে না। মন সদা চঞ্চল। একটি বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে মন সর্ব্বদাই বিচলন করে একে বলে মনোযোগের বিচলন।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের অনুরূপ।

উপকরণ :—ম্যাসন চক্র, কাইমো গ্রাফ, (Kymograph) বিদ্যুৎ চুম্বক সম্পন্ন ষ্টাইলাস (Electro magnetic stulus), ক্রোনোমিটার, ইলেকট্রিক রেগুলেটার (Electro regulator), সেল (cell), তার, ড্রাম, কাগজ, কেরোসিন ল্যাম্প ও বার্ণিশ ইত্যাদি, মেক কি (make key)।

যন্ত্রের বর্ণনা :—ম্যাসন চক্র একটি গোলাকার কার্ডবোর্ড, এর কেন্দ্রে গোল করে কাটা ছিদ্র আছে। কার্ডবোডটি সাদা কিন্তু এর একটি ব্যাসার্দ্ধে কালো মোটা রেখা টানা থাকে। এই রেখাটি মাঝে মাঝে কাটা বা ভাঙ্গা। ইলেকট্রিক রেগুলেটারে চাকতিটি ঘোরালে এই খণ্ডিত রেখাটি অদৃশ্য হয় এবং পরিবর্ত্তে কতগুলি ধূসর গোলাকার বৃত্ত মনে হয়।

কাইমোগ্রাফ হল একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র, এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি ড্রাম ঘোরান যায়, এই ড্রামে একটি ভূসা কালি মাখান কাগজ সেঁটে দিতে হয়। কেরোসিন ল্যাম্পের শিখায় কাগজটি ধরলে কাগজে ভুসা পড়ে।

ক্রোনোমিটার হল একটি ঘড়ি। এর সাহায্যে $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত সময় পরিমাপ করা যায়। এই ঘড়িটি ধুম্রান্বিত ঘূর্ণায়মান ড্রামে রেখা টানে।

মেক কি (make key) টিপলে বিদ্যুৎ চুম্বক ষ্টাইলাসটি ধুম্রান্বিত ড্রামের কাগজে আর একটি রেখা আঁকে। ষ্টাইলাসটি চলে ব্যাটারির সাহায্যে।

প্রণালী : কাইমোগ্রাফের ড্রামে সাদা মার্বেল কাগজ জড়িয়ে একটু আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হল। কেরোসিন ল্যাম্পের কালো ভুসা এই কাগজে

ফেলা হল। এবার ভুসা মাখান ড্রামটি সাবধানে ধরে কাইমোগ্রাফ যন্ত্রে লাগিয়ে দেওয়া হল। বিদ্যুৎ চুম্বক সম্পন্ন ষ্টাইলাস, মেক কী-ও ব্যাটারি তার দিয়ে যোগ করা হল। এবার ষ্টাইলাস ও ক্রোনোমিটার ড্রামে স্পর্শকের ন্যায় রাখা হল। অভীক্ষার্থী মেক কী-তে হাতের আঙুলটি লাগিয়ে বসবে। অভীক্ষার্থীর থেকে কিছু দূরে ম্যাসন চক্রটিকে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে ঘোরান হল। ক্রোনোমিটারটি চালিয়ে দেওয়া হল (ক্রোনোমিটারটি যেন সেকেণ্ডে ১টি দাগ কাটে, কাইমোগ্রাফ যন্ত্রও একটি সুইচ টিপে চালান হল।

অভীক্ষার্থী এক দৃষ্টিতে ম্যাসন চক্রের দিকে চেয়ে থাকবে। ম্যাসন চক্রের প্রান্তের দিকের একটি বৃত্তে তার চোখ থাকবে। যে মুহূর্তে এই দৃশ্য তার চোখ থেকে অদৃশ্য হবে, সেই মুহূর্তে অভীক্ষার্থী মেক কে টিপবে। বৃত্তটি পুনরায় না দেখতে পাওয়া পর্য্যন্ত অভীক্ষার্থী এইভাবে চাবি টিপে থাকবে, বৃত্তটি আবার দেখতে পেলে অভিক্ষার্থী চাবি ছেড়ে দেবে। এইভাবে ধূমায়িত ড্রামটি একবার পরিক্রমা না করা পর্য্যন্ত অভিক্ষার্থী চাবি টিপবে, ছাড়বে। ড্রামটি এক মিনিটে একবার ঘুরবে। অতএব ১ মিনিট কাল ধরে অভীক্ষার্থীর মনোযোগের বিচলন রেখায়িত করা হবে।

এবার ধূমায়িত কাগজে একটি সরু কাঁটার সাহায্যে অভিক্ষার্থীর নাম, তারিখ, সময় (ঘড়ি ১টি দাগ=১ সে.) এবং অমনোযোগ ও মনোযোগ চিহ্নিত করা হল।
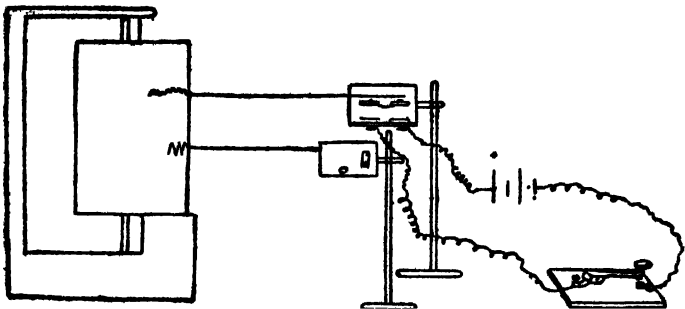
চিত্র ১৪—কাইমোগ্রাফ

এবার ঐ কাগজ সাবধানে ড্রাম থেকে খুলে বার্ণিশে ডুবিয়ে তুলে নিয়ে বাতাসে শুকনো করা হল।

এবার ঐ চিহ্ন থেকে অভীক্ষার্থীর ১ মিনিটে কতবার মনোযোগ ছিল,

কতবার অমনোযোগ ছিল, কতক্ষণ এই মনোযোগ ও অমনোযোগ স্থায়ী ছিল নির্ণয় করা হল। মনোযোগ ও অমনোযোগ গড়ে কতক্ষণ স্থায়ী ছিল তাও নির্ণয় করা হল।

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দ্দেশ ঃ এই চাবিতে তোমার তর্জ্জনি রেখে ঘূর্ণায়মান চক্রের দিকে তাকাও। প্রান্তের দিকের একটি বৃত্তের দিকে তাকিয়ে থাক। যখনই ঐ বৃত্ত তোমার চোখ থেকে অদৃশ্য হবে, তখনই তুমি চাবিটি টিপবে আবার যখন বৃত্তটি তোমার চোখে পড়বে চাবি ছেড়ে দেবে। এইভাবে আমি যতক্ষণ না থামতে বলব তুমি চাবিতে একবার চাপ দেবে একবার ছাড়বে। আমি প্রস্তুত বললে আরম্ভ করবে আর থাম বললে থামবে।

অভীক্ষকের সাবধানতা ঃ—(১) ভুসা মাখান ড্রামটি সাবধানে ধরবে, যেন কালি না উঠে যায়।

(২) কাগজে ভুসা মাখানো যেন সর্বত্র সমান হয়।

(৩) ক্রোনোমিটার ও স্টাইলাস ড্রামকে স্পর্শ করবে মাত্র, স্টাইলাসটি adjusting stand দিয়ে ড্রামকে স্পর্শ করবে।

অন্তদর্শন ঃ—আমি চেষ্টা করছিলাম বৃত্তের পরিধিটি সব সময় দেখতে কিন্তু অবাক হয়ে একটু পরেই আবিষ্কার করলাম হঠাৎ বৃত্তটি দেখতে পাচ্ছি না।

ফলাফল ঃ—

মনোযোগের স্থায়িত্ব—সেকেণ্ডে	অমনোযোগের স্থায়িত্ব—সেকেণ্ডে	মনোযোগের স্থায়িত্বের গড়	মনোযোগের স্থায়িত্বের গড়
১১	৬		
৭	৮		
৯'৫	৯	$\frac{৪৩}{৫}$ = ৮'৭ সে.	$\frac{৪৭}{৫}$ = ৯'৪ সে.
৯	১০		
৭	১৪		
৮'৭	৯'৪		

মন্তব্য ঃ উদ্দীপক দুর্ব্বল বা আবছা হলে মনোযোগের বিচলন সহজেই ধরা যায়। মনোযোগ ও অমনোযোগের স্থায়িত্ব সাধারণতঃ গড়ে ৬—৭ সে, অর্থাৎ সাধারণতঃ আমরা একটি জিনিষে ৬—৭ সে মন দিতে পারি।

একাদশ অধ্যায়

প্রতিক্রিয়া কাল।

১। সমস্যা :—দর্শন ও শ্রবণ মূলক উদ্দীপকের সাহায্যে অভীক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয় (To determine the Natural Reaction time of the subject with reference to sound and light.

মৌলিক তত্ত্ব :—

কোন উদ্দীপনা দ্বারা ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হওয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়কে বলে প্রতিক্রিয়া কাল। অভীক্ষার্থীর মনোভাবের উপর এই প্রতিক্রিয়া কাল নির্ভর করে।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের স্থায়।
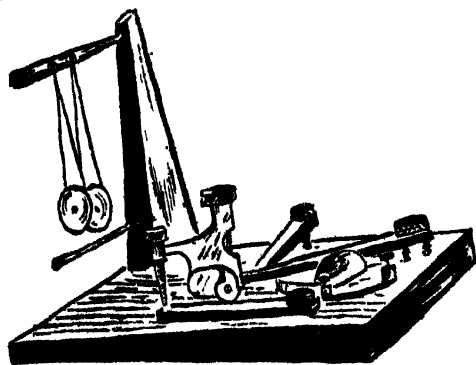
চিত্র ১৫—ভার্নিয়ার ক্রোনোস্কোপ

উপকরণ :—ভার্নিয়ার ক্রোনোস্কোপ (vernier chronoscope), স্ক্রুডাইভার, ষ্টপওয়াচ, বাল্ব, ব্যাটারি, তার, স্ক্রীন, সুতো।

যন্ত্রের বর্ণনা :—একটা চৌকো ধাতব পাদভূমির উপর একটি লোহার দণ্ড থাকে। এই দণ্ডের উপর সরু একটি রড আড়াআড়ি ভাবে লাগানো থাকে। এই সরু দণ্ডে ছুটো ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র থেকে সুতোর সাহায্যে ছুটি দোলক ঝোলান আছে। খাড়া দণ্ডটির গায়ে নীচের দিকে ছুটো অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র

আছে। এই ছিদ্র দিয়ে একটি দণ্ড প্রবেশ করিয়ে দোলক দুটির চাকার ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ইহাদের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা হয়। ঐ চৌকো ধাতব পাদভূমির অপর প্রান্তে ৩টি চাবি (key) আছে। পরীক্ষার সময় ঐ চাবিতে দোলক দুটি আটকে রাখা হয়। খাড়া লৌহ দণ্ডের কাছের বড় দোলকটিকে বলে দীর্ঘ দোলক এবং যে চাবিতে ঐ দোলকটি আটকান থাকে তাকে বলে পরীক্ষকের চাবি (Experimetner's key)। লৌহ দণ্ডের কাছে ছোট দোলকটিকে বলে ক্ষুদ্র দোলক (Shorter pendulum) এবং যে চাবিতে ঐ দোলকটি আটকান থাকে তাকে বলে পরীক্ষার্থীব চাবি। পরীক্ষকের চাবির সঙ্গে বিদ্যুৎ চলাচলের ব্যবস্থা আছে, তার ব্যাটারী প্রভৃতি সংযুক্ত করলে ঐ চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে আলো জলে ওঠে।

পরীক্ষার আগে সুতো কমিয়ে বাড়িয়ে দোলক দুটির দৈর্ঘ্য ঠিক করে নিতে হয়। বড় দোলকটি মিনিটে ৭৫ বার দোলে, অর্থাৎ একবার দুলতে লাগে ৮০ সেকেণ্ড। ছোট দোলকটি মিনিটে ৭৮ বার দোলে অর্থাৎ একবার দুলতে সময় লাগে ·৭৮ সেকেণ্ড। সুতো দুটির দৈর্ঘ্য এমনভাবে ঠিক করতে হয় যেন ছোট দোলকটির ৪০ বার দোলনের সময় ও বড়টির ৩৯ বার দোলনের সময় পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। অতএব ভার্নিয়ার কনস্টাণ্ট (vernier constant হল :—

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোট দোলকটি ৪০ বার দোলে

নির্দ্দিষ্ট „ বড় „ ৩৯ বার দেলে

অর্থাৎ ছোটটির যখন একটি দোলন সম্পূর্ণ হয় তখন বড়টির একটি দোলনের $(১ - \frac{৩৯}{৪০}) = \frac{১}{৪০}$ অংশ বাকী থাকে।

বড় দোলকের ১ বার দুলতে সময় লাগে ৮০ সেকেণ্ড

„ „ $\frac{১}{৪০}$,, ,, ,, ,, $৮০ \times \frac{১}{৪০} =$ ·02 সে।

এই ·02 সেকেণ্ডকে ভার্নিয়ার কনস্টাণ্ট (V.C) বলে।

পরীক্ষণ প্রণালী :—দোলক দুটিকে ঠিক মত আটকে ব্যাটারী, বাল্ব, ও যন্ত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক বর্তনী স্থাপিত হল। কাঠের স্ক্রীনটি দিয়ে এমনভাবে আড়াল করা হল যে বাল্বটিও পরীক্ষার্থীর চাবিটি পরীক্ষার্থীর দিকে রইল।

পরীক্ষণের রীতি পরীক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিয়ে পরীক্ষক নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দেবেন "আমি প্রস্তুত বললে চাবির ওপর তুমি আঙুল রাখবে। তারপর

আমি শব্দ করব, শব্দ শুনলে তুমি চাবিটি টিপে দেবে। এরকম আমি যতবার প্রস্তুত বলব আর শব্দ করব তুমি ততবার চাবি টিপবে। এইভাবে শব্দের ওপর কয়েকবার পরীক্ষা করে আমি আবার যখন প্রস্তুত বলব তুমি তোমার সামনের বাল্বটি জ্বলতে দেখবে। আলো দেখলে তুমি চাবিটি টিবে দেবে। যতবার আমি আলো জ্বালবো, ততবার তুমি চাবি টিপবে।"

এইরূপ নির্দ্দেশ দেবার পর অভীক্ষক পরীক্ষা আরম্ভ করবে। ২৫ বার শব্দ এবং ২৫ বার আলো উপস্থাপন করা হবে।

পরীক্ষক চাবি টিপলে দোলকটি দুলতে থাকবে, অভীক্ষার্থীর দোলকও একটু পরেই দুলবে। কতবার দোলার পর অভীক্ষকের দোলক অভীক্ষার্থীর দোলকের সঙ্গে মিলে যাবে অভীক্ষক গণনা করবে। দোলক সংখ্যাকে ভার্নিয়ার কনস্টাণ্ট দিয়ে গুণ করে প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয় করা হয়।

ফলাফল : স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কাল :—

পরীক্ষণ নং	দুটি দোলকের মিলনকাল পর্যন্ত দোলন সংখ্যা		দোলন সংখ্যা × ভার্ণিয়ার কনস্টাণ্ট		গড় প্রতিক্রিয়া	
	শব্দ	আলো	শব্দ	আলো	শব্দ	আলো
১	১১	৯	১১ × ·০২ = ·২২	৯ × ·০২ = ·১৮		
২	১১	১০	১১ × ·০২ = ·২২	১০ × ·০২ = ·২০		
৩	১২	১০	১২ × ·০২ = ·২৪	·২০		
৪	১৩	৯	১৩ × ·০২ = ·২৬	·১৮		
৫	১৪	১১	১৪ × ·০২ = ·২৮	·২২		
৬	১১	১০	১১ × ·০২ × ·২২	·২০		

অন্তদর্শন পরীক্ষার সময় শব্দ শুনে আলো দেখে চাবি টিপছিলাম। এই পরীক্ষা আমার খুব ভাল লেগেছে।

মন্তব্য :—সাধারণতঃ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কাল হয় ·23 সে

২। সমস্যা :—দর্শন ও শ্রবণ মূলক উদ্দীপকের সাহায্যে অভিক্ষার্থীর পেশী মূলক প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয় (To determine the muscular Reaction Time of the subject with reference to sound and light.)।

মৌলিক তত্ত্ব :—অভীক্ষার্থীর মনোভাবের উপর প্রতিক্রিয়া কাল নির্ভর করে। অভীক্ষার্থীর নির্দ্দেশের উপর এই মনোভাব নির্ভর করে। অতএব অভীক্ষকের নির্দ্দেশের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া কাল হবে।

সাধারণ বিবরণ।—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ।

প্রণালী :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ।

অভীক্ষকের নির্দ্দেশ :—"আমি প্রস্তুত বললে তুমি তোমার আঙুলটি আলতো করে চাবির ওপর রাখবে। তারপর আমি শব্দ করব, তুমি শব্দটি শোনা মাত্র চাবিটি টিপবে। যত তাড়াতাড়ি পার তুমি চাবি টিপবে। কয়েকবার শব্দ করার পর আমি আলো জ্বালব। আলোটি দেখা মাত্রই তুমি চাবি টিপবে।"

উপরি উক্ত নির্দ্দেশ দেবার পর অভীক্ষক ২৫ বার শব্দ করবে ও ২৫ বার আলো জ্বালবে। অভীক্ষার্থী প্রতিবার চাবি টিপবে। অভিক্ষাথী ছুটি দোলকের মিলন পর্য্যন্ত দীর্ঘ দোলকের সংখ্যা গণনা করবে।

৩। **সমস্যা :**—দর্শন ও শ্রবণ মূলক উদ্দীপকের সাহায্যে অভিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়মূলক প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয় (To determine the sensorial Reaction time of the subject with reference to sound and light.)

মৌলিক তত্ত্ব :—অভীক্ষার্থীর মনোভাবের (attitude) উপর প্রতিক্রিয়া কাল নির্ভর করে। অভীক্ষকের নির্দ্দেশ এই মনোভাবকে পরিচালিত করে।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ।

পরীক্ষণ প্রণালী :—পূর্ব্ব পরীক্ষণের অনুরূপ।

অভিক্ষার্থীর প্রতি নির্দ্দেশ :—"আমি তোমায় প্রস্তুত বললে তুমি তোমার আঙুলটি চাবির ওপর আলতো করে রাখবে তাপর আমি শব্দ করবো, শব্দটি ভালো করে শুনে তবে তুমি চাবি টিপবে।" আমি যতবাব শব্দ করব তুমি ততবার ভাল করে শব্দ শুনে চাবি টিপবে। শব্দের পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি আলো জ্বালব। পূর্ব্বের মত তুমি আলোটা ভালো করে দেখে তবে চাবি টিপবে। যতবার আমি আলো জ্বালব, ততবার তুমি এইভাবে চাবি টিপবে।

মন্তব্য :—সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মূলক প্রতিক্রিয়া কাল হয় '২৭সে

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ

১। সমস্যা :—অভীক্ষার্থীর স্থৈর্য্যের পরীক্ষা (To determine the steadines of the subject by steadiness apparatus).

মৌলিক তত্ত্ব :—ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে পেশীর স্থৈর্য্যের পার্থক্য বর্তমান। সকলে সমান ধীর স্থির নয়।

উপকরণ :—স্থৈর্য পরীক্ষার যন্ত্র (Steadiness apparatus), বাল্ব; তার ব্যাটারী।
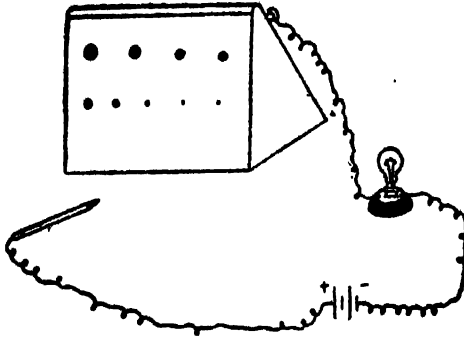
চিত্র ১৬—স্টেডিনেস যন্ত্র

Steadiness যন্ত্রের বর্ণনা :—এই যন্ত্রটি ধাতু নির্মিত। এতে ৯টি ছিদ্র আছে ছিদ্রগুলির ব্যাস বিভিন্ন। সবচেয়ে ছোট ছিদ্রটির ব্যাস ২.৫ মিলিমিটার আর সবচেয়ে বড় ছিদ্রটির ব্যাস ১২ মিলিমিটার। এর সঙ্গে একটি ধাতব পেন্সিল বৈদ্যুতিক তার দিয়ে লাগান আছে। ঐ পেন্সিলটি যন্ত্রের গায়ে লাগলেই আলো জ্বলে উঠবে।

পরীক্ষণ প্রণালী :—বাল্ব, ব্যাটারী ও ধাতব পেন্সিল এবং যন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎচলাচলের ব্যবস্থা করা হল। এবার অভীক্ষার্থী ডান হাতের ধাতব পেন্সিলটি ধরে steadiness যন্ত্রের বড় ছিদ্রতে প্রবেশ করিয়ে ১০ সে. রাখবে। এরপর ১৫ সে. বিশ্রাম করে অভীক্ষক বাম হাতে পেন্সিলটি উক্ত বড় ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে ১০ সেকেণ্ড রাখবে। এরপর অনুরূপ ভাবে এর পরবর্তী ছোট

ছিদ্রতে ধাতব পেন্সিল ১০ সেকেণ্ডের জন্য রাখবে। পূর্বের ন্যায় প্রথমে ডান হাতে ও পরে বাম হাতে পরীক্ষা হবে। এইভাবে একে একে বড়র থেকে ক্রমশঃ ছোট ছিদ্রগুলিতে পরীক্ষা করা হবে। ৯টি ছিদ্রে ওইভাবে ধাতব পেন্সিল প্রবেশ করাতে হবে। ছিদ্রে পেন্সিল প্রবেশ করানর সময় সেকেণ্ডে কতবার আলো জ্বলল অভীক্ষক লক্ষ্য করবে এবং কতক্ষণ আলো জ্বলেনি তারও হিসাব রাখবে স্টপ ওয়াচের সাহায্যে।

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ ঃ—"তুমি ডান হাতে পেন্সিলটি ধরে ছিদ্রে পেন্সিল প্রবেশ করাবে যেন পেন্সিলটি যন্ত্রের গায়ে না লাগে। যন্ত্রের গায়ে লাগলেই আলো জ্বলে উঠবে। একবার ডান হাতে ও একবার বাম হাতে পেন্সিলটি প্রবেশ করাবে। বড় ছিদ্র থেকে ক্রমশঃ ছোট ছিদ্রে পেন্সিল প্রবেশ করাবে।"

অভীক্ষকের সতর্কতা ঃ—অভীক্ষার্থীর হাত কোন কিছুর ওপর থাকবে না শূন্যে অবস্থান করবে।

অন্তর্দর্শন ঃ—পেন্সিল ছিদ্রে প্রবেশ করানোর সময় আমার ভালোই লাগছিল। আলো যাতে না জ্বলে তার জন্য খুব সাবধানে পেন্সিল ধরেছিলাম। তবুও যন্ত্রে ঠেকে যাওয়ায় আলো জ্বলছিল।

ফলাফল :—

ছিদ্র	ডান		বাম হাত	
	কত সময় পরে জলেছে (সেকেণ্ড)	আলো জলার সংখ্যা	কত সময় পরে জলেছে (সেকেণ্ড)	আলো জলার সংখ্যা
১ম	—	—	—	—
২য়	—	—	—	—
৩য়	—	—	৭	১
৪র্থ	—	—	৬	১
৫ম	—	—	৬	১
৬ষ্ঠ	৬	১	৫, ৫	২
৭ম	৭	১	৫, ৩, ২	৩
৮ম	৩, ৪	২	৩, ২, ২, ১	৪
৯ম	৫, ৩	২	৩, ৩, ২	৩

২। সমস্যা :—টোকা দেওয়ার পরীক্ষা (To find out the tapping rate of the subject).

মৌলিক তত্ত্ব :—বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন হারে টোকা দিতে পারে।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—টোকাদেবার যন্ত্র (Tapping Board), ধাতব পেন্সিল, বিদ্যুৎ চুম্বক যুক্ত স্টাইলাস, কাইমোগ্রাফ, ক্রোনোমিটার, তার, ব্যাটারী স্টপওয়াচ, স্ক্রীন, স্ট্যাণ্ড, বার্নিশ, স্পিরিট।

Tapping Boardএর বর্ণনা : এই যন্ত্রটি কাঠের। এর দুই প্রান্তে দুটি ধাতব ফলাকা আছে একটি ধাতব পেন্সিল এই যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো থাকে। তারের

সাহায্যে এই যন্ত্র, ও স্টাইলাসের মধ্যে বৈত্যুতিক বর্ত্তনীর (Circuit) সৃষ্টি করা হল। ঐ পেন্সিল দিয়ে যন্ত্রের ধাতব ফলাকায় টোকা দিলে কাইমোগ্রাফের ভুসা মাখানো ড্রামে স্টাইলাসের দাগ পড়ে।
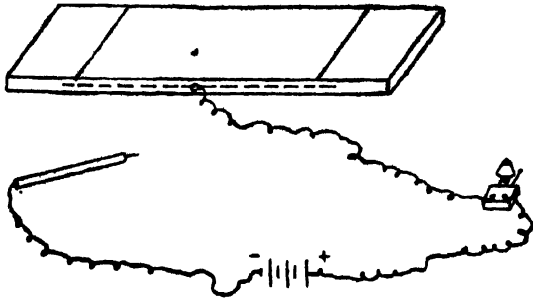
চিত্র ১৭—টাপিং বোর্ড

পরীক্ষণ প্রণালী :—কাইমোগ্রাফের ড্রামে একটি সাদা মার্বেল কাগজ আটকান হল। এইবার কেরোসিন ল্যাম্পের সাহায্যে ঐ কাগজে ভুসা মাখান হল। ভুসামাখান ড্রামটি এবার কাইমোগ্রাফে আটকে দেওয়া হল। Tapping Board, ধাতব পেন্সিল, ও স্টাইলাস ও ব্যাটারী তার দিয়ে যুক্ত করে বৈত্যুতিক বর্ত্তনী (Circuit) স্থাপন করা হল। ধাতব পেন্সিল দিয়ে Tapping Board এর ধাতব ফলাকায় টোকা দিলেই স্টাইলাসটি নড়ে ওঠে। স্টাইলাসও ক্রোনোমিটার ড্রামের গায়ে স্পর্শ করিয়ে রাখা হল। ক্রোনোমিটারটি প্রতি সেকেণ্ডে ১ বার দাগ কাটবে এবং কাইমোগ্রাফটি মিনিটে ১ বার একটি পরিক্রমা শেষ করবে। এবার কাইমোগ্রাফটি চালিয়ে দেওয়া হল। অভীক্ষার্থী ৫ মিনিট ধরে টোকা দেবে। এরপর দ্বিতীয় অভীক্ষার্থী আবার অনুরূপভাবে ৫ মিনিট ধরে টাকা দেবে।

পরীক্ষা হয়ে গেলে ড্রামের ভুসা মাখান কাগজটি সাবধানে নামিয়ে বার্নিশে ডুবিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। বার্নিসে ডোবাবার আগে অভীক্ষার্থীর নাম ইত্যাদি লেখা যেতে পারে।

অভিক্ষার্থীর প্রতি নির্দ্দেশ :—"আমি প্রস্তুত বললে তুমি ডান হাতে পেন্সিল ধরে থাকবে। আরম্ভ কর বললে দ্রুত টোকা দিতে আরম্ভ করবে যত তাড়াতাড়ি পার টোকা দেবে।

অভীক্ষার্থী :—৫ মিনিট ধরে টোকা দিতে ভাল লাগছিল না, হাত ব্যথা করছিল। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল টোকা দেওয়া বন্ধ করলে ভালো হয়।

অভীক্ষক সংখ্যা	অভীক্ষকের নাম	প্রতি মিনিটে টোকার সংখ্যা					৫ মিনিটে টোকার সংখ্যা	গড় সংখ্যা
		১	২	৩	৪	৫		১ মিনিট
১	প্রতিমা বসু	২০০	১৭০	১৬৬	১৬০	১৪৮	৮৪৪	১৬৮·৮
২	সবিতা সুর	১৮০	১৭২	১৬৩	১৫২	১৫০	৮১৭	১৬৩·৪

মন্তব্য :—বিভিন্ন ব্যক্তির টোকা দেবার ক্ষমতা বিভিন্ন, ফলাফল দেখলে তা বোঝা যায়।

৩। **সমস্যা :**—অক্ষর কাটার হার নিরূপন (to find out the rate per minute of Cancelling letters on a Cancellation test.

মৌলিক তত্ত্ব :—কোন কাজ করতে হলে মনোযোগের দরকার হয়, অধ্যবসায়েরও প্রয়োজন হয়। এই কর্মদক্ষতা সকলের সমান নয়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ—Cancellation form, স্টপওয়াচ, পেন্সিল।

Cancellation form তৈরীর নিয়ম :—

(১) অক্ষরগুলির মধ্যে ক্রম থাকবে না।

(২) অক্ষরগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হবে।

(৩) অক্ষরগুলি পরস্পরের থেকে সমান দূরে থাকবে।

পরীক্ষণ প্রণালী : কয়েকজন ব্যক্তির উপর এই পরীক্ষা করা চলে। অভীক্ষকদের একটি করিয়া পেন্সিল ও cancellation form দেওয়া হল। form গুলি পরীক্ষা আরম্ভ করার পূর্ব্বে উল্টে রাখতে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে। A, I, C, F অক্ষরগুলি কাটতে বলা হল। অভীক্ষার্থী ৩০ সেকেণ্ড অন্তর ॥ এইরূপ দুটি রেখা দিয়ে চিহ্ন দেবে। এইভাবে ৫ মিনিট অক্ষর কাটবার পর অভীক্ষক ভুলগুলি গণনা করবে এবং কতগুলি অক্ষর অভীক্ষার্থী কেটেছে তাও গণনা করবে।

অভীক্ষকের সতর্কতা :—৩০ সে. অন্তর অভীক্ষককে দাগ (॥) দিতে বলবে।

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ : আমি যখন প্রস্তুত বলব, তুমি এই পেন্সিলটি নিয়ে বসবে। আরম্ভ কর বললেই তুমি কেবল A, I, C ও F অক্ষরগুলি কাটতে সুরু করবে। দাগ যখন দাও বলব তখন যতদূর কেটেছ তার পাশে ॥ এইরূপ দাগ দেবে। যখন থাম বলব তখন কাটা বন্ধ করবে।

Cancellation পরীক্ষার ইনডেক্স $A = \frac{C-W}{C+O}$

এখানে C = নির্ভুল কাটা অক্ষর, W = ভুল করে কাটা অক্ষর, O = ছেড়ে দেওয়া অক্ষর।

ফলাফল :—

অভীক্ষার্থীর নাম	বয়স	প্রতি মিনিটে নির্ভুল কাটা অক্ষরের সংখ্যা					C ৫ মিনিটে নির্ভুল কাটা অক্ষরের সংখ্যা	W ভুল করে কাটা অক্ষরের সংখ্যা	O ছেড়ে যাওয়া অক্ষরের সংখ্যা	ইনডেক্স $A = \frac{C-W}{C+O}$
		১	২	৩	৪	৫				
জলি বসু	১৩	১৭	২২	২০	১৯	২৩	১১৪	৬	২	$\frac{১১৪ - ৬}{১১৪ + ২}$ = ·৯৪
মিত্রা মুখার্জি	১৩	১৫	১৪	১৭	১৬	১৫	৭৭	৫	৩	$\frac{৭৭ - ৫}{৭৭ + ৩}$ = ·৯২
পার্বতি অধিকারী	১২	১৮	২২	২৬	২৭	৩০	১২৩	৩	২	$\frac{১২৩ - ৩}{১২৩ + ২}$ = ·৯৫
সুলেখা সরকার	১৩	১২	১০	১৪	১৩	১২	৬১	৪	৫	$\frac{৬১ - ৪}{৬১ + ৫}$ = ·৮৬
শ্বেতা মণ্ডল	১২	১৮	১৯	২২	২০	২০	৯৯	৭	২	$\frac{৯৯ - ৭}{৯৯ + ২}$ = ·৯০

৪। **সমস্যা :**—যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ।

মৌলিক তত্ত্ব :—নানারূপ মানসিক কার্য্য সমাধানের দ্বারা ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য বুদ্ধির অভীক্ষার ২৫টি কপি, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডাঃ গৌরবরণ কপাট কর্তৃক রচিত যৌথ বুদ্ধি অভীক্ষা) স্টপওয়াচ, পেন্সিল।

পরীক্ষণ প্রণালী :—অভীক্ষক অভীক্ষার্থীদের একটি করে অভীক্ষার কপি ও পেন্সিল দেবে। অভীক্ষকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক অভীক্ষার্থী অভীক্ষার পাতা না খুলে রেখে দেবে। এই অভীক্ষায় ৫টি বিভাগ আছে। অভীক্ষক অভীক্ষার নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রথম উদাহরণগুলি বুঝিয়ে দেবে। তারপর অভীক্ষকের নির্দ্দেশ পেলে অভীক্ষার্থীগণ পাতা উল্টে প্রথম অভীক্ষার সমস্যা-গুলি সমাধান করবে। এবার অভীক্ষক সকলকে থামতে বলে দ্বিতীয় অভীক্ষার উদাহরণগুলি বুঝিয়ে দেবে। তারপর অভীক্ষার্থীগণ দ্বিতীয় অভীক্ষা সম্পাদন করবে। এইভাবে অভীক্ষক প্রত্যেকবার নির্দ্দেশ দিলে অভীক্ষার্থী অভীক্ষা সম্পাদন করবে। প্রত্যেক বিভাগের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে। নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হলে অভীক্ষক প্রত্যেকবার অভীক্ষকদের থামবার নির্দ্দেশ দেবে। অভীক্ষা শেষ হলে সব কপিগুলি সংগ্রহ করে অভীক্ষক অভীক্ষায় উল্লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী নম্বর দেবে এবং নামের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যেকটি অভিক্ষার্থীর মানসিক বয়স পাওয়া যাবে।

অভিক্ষার্থীর প্রতি নির্দ্দেশ :—আমি পাতা ওল্টাতে না বললে কেউ পাতা ওল্টাবে না। আমি যখন যা নির্দ্দেশ দেব, তোমরা তাই করবে।

ফলাফল :—

ক্রমিক নং	অভীক্ষার্থীর নাম	বয়স	প্রাপ্ত মান	নর্ম	মন্তব্য
১	মিতালী বসু	১২	৬৫	৪২ এর উপরে	উচ্চ মেধা
২	লিলি চৌধুরী	১১	৬৩	হইলে	উচ্চ মেধা
৩	সুপ্রভা দে	১১	৬১	উচ্চ মেধা	উচ্চ মেধা
৪	মদালসা ব্যানার্জি	১১	৪২	২৮—৪২ পর্যন্ত	সাধারণ মেধা
৫	দেবযানী মৈত্র	১১	৬৫	সাধারণ মেধা	উচ্চ মেধা

৫। **সমস্যা** :—ব্যক্তিগত অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির পরীক্ষা।

মৌলিক তত্ত্ব :—মনোবিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়।

উপকরণ :—টার্মান মেরিল বিনেসিমন টেস্টের বাংলা অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ছবি, নক্সা ও অন্যান্য উপকরণের বাক্স।

প্রণালী :—অভীক্ষার্থীর বয়স সাত। অতএব তাকে ৫ বৎসর বয়সের অভীক্ষা থেকে পরীক্ষা করতে হবে ৫, ৬ ও ৭ বৎসরের পরীক্ষায় সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হল। অতএব তার মৌলিক বয়স (Basal age) হল ৭ × ১২ = ৮৪ মাস। তারপর তাকে ৮ বছরের, ৯ বছরের এবং তার পরের অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে দেওয়া হল। কিন্তু এবার সে ৮ বছরের অভীক্ষার মাত্র ৪টে পারল বাকীগুলো পারল না। এই ভাবে যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ ভাবে কোন বছরেরর অভীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে ততক্ষণ পরীক্ষা করতে হবে।

ফলাফল :—

অভীক্ষা	সাফল্য	মানসিক বয়স (মাস)	মোট মানসিক বয়স
৭ বৎসর	সমস্তটা	৭ × ১২ = ৮৪ মাস	১০৪ মাস
৮ বৎসর	৪টি প্রশ্ন	৪ × ২ = ৮ মাস	= ৮ বৎসর
৯ বৎসর	৪টি প্রশ্ন	৪ × ২ = ৮ মাস	৮ মাস
১০ বৎসর	২টি প্রশ্ন	২ × ২ = ৪ মাস	
১১ বৎসর	×		
১২ বৎসর	×		

অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স = ১০৪ মাস

" প্রকৃত বয়স = ৭ × ১২ = ৮৪ মাস

$$\text{অতএব বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০ = ১২৪$$

৬। **সমস্যা** :—আলেকজাণ্ডারের পাস এ্যালং (Pass along) নামক সম্পাদনী অভিক্ষার সাহায্যে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করা (To determine the concrete intilligence of the subject by Alexander-s Pass along test.)

মৌলিক তত্ত্ব :—নানা সমস্যার সমাধানের মধ্যে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্ত্ত জিনিষ নাড়াচাড়া করার মধ্যে যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে বলে মূর্ত্ত বুদ্ধি।

সাধারণ বিবরণ :—পূর্ব্বের ন্যায়

উপকরণ :—পাস এ্যালং টেস্ট, নক্সা, স্টপওয়াচ ও স্কোর তালিকা।

পাস এ্যালং টেস্টের বর্ণনা :—একটি পাস এ্যালং অভীক্ষার বাক্সে কয়েকটি কাঠের ছক থাকে। ৯টি সমস্যার ছবি থাকে। আর থাকে তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঠের ট্রে। ট্রের একটি প্রান্তে নীল রং দেওয়া। ছকগুলির কোনটা লাল, কোনটি নীল। প্রত্যেকটি নক্সায় যেভাবে ছকগুলি সাজান আছে তার বিপরীত ভাবে ছকগুলি সাজাতে হয়। অর্থাৎ লালপ্রান্তে নক্সার নীল প্রান্তের ছকগুলি সাজাতে হয় এবং নীল দিকে লাল প্রান্তের ছক সাজাতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভীক্ষার্থী ছকগুলি না উঠিয়ে কেবল সরিয়ে সরিয়ে নক্সা অনুযায়ী সাজাতে পারলে সে স্কোর তালিকার সবচেয়ে বেশী মান পাবে।

পরীক্ষণ প্রণালী :—প্রথম নক্সাটির বিপরীতভাবে ট্রে সাজিয়ে অভীক্ষক সমস্যার সমাধান করে দেবে। তারপর একে একে অপর নক্সাগুলির বিপরীত ভাবে ছক সাজিয়ে অভীক্ষার্থীকে সমাধান করতে দেবে। অভীক্ষার্থী যে সময়ে সমস্যার সমাধান করল তা স্টপওয়াচের সাহায্যে অভীক্ষক লক্ষ্য করবে।

পরপর দুটি অভীক্ষায় ব্যর্থ হলে অভীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

স্কোর তালিকা থেকে এবার অভীক্ষার্থীর প্রাপ্য স্কোর নির্ণয় করা হল। প্রত্যেকটি অভীক্ষায় প্রাপ্ত মান যোগ করে অভীক্ষার্থীর মূর্ত্ত বুদ্ধি পরিমাপ করা হল।

অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দ্দেশ :—"আমি তোমাকে প্রথম নক্সাটি কিরূপে সমাধান করতে হয় দেখিয়ে দেব। এরপর আমি নক্সার বিপরীত ভাবে ছকগুলি সাজিয়ে দেব। তুমি নক্সা অনুযায়ী লাল ছকগুলি ট্রের লাল দিকে

এবং নীলগুলি নীল দিকে নিয়ে যাবে। ছকগুলি তুলবে না, সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি পার সমস্তার সমাধান করবে।"

অন্তকর্শন :—প্রথমে মনে হয়েছিল কাজটা খুবই সহজ। পরপর কয়েকটি নক্সা খুব সহজেই সমাধানও করেছিলাম। কিন্তু শেষের দিকে সবগুলি পারলাম না। চেষ্টা করেও হতাশ হলাম।

নক্সা নং	নির্দিষ্ট সময়	প্রাপ্য মান	বাদ
১	২′	২	১′ এর বেশী সময় লাগলে ১ নম্বর বাদ যাবে।
২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭	২′ ৩′ ৩′ ৩′ ৩′ ৩′	৩ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫	১′ এর বেশী সময় লাগিলে প্রতি ৩০″ বা তার ভগ্নাংশের জন্য ১ নম্বর বাদ যাবে।
৮	৪′	৭	১′-৩০″ এর বেশী সময় লাগিলে প্রতি ৩০″ সেকেণ্ড বা তার ভগ্নাংশের জন্য ১ নম্বর বাদ যাবে।
৯	৫′	৮	২ মিনিটের বেশী সময় লাগিলে প্রতি ৩০″ সেকেণ্ড বা তার ভগ্নাংশের জন্য ১ নম্বর বাদ যাবে।

পরীক্ষাগারের নর্ম = ২৬ + (আদর্শ বিচ্যুতি) ৭

নক্সা নং	১	২	৩	৫	৫	৬	৭	৮	৯	মোট নম্বর
সময় লেগেছে	৩′	১৮′	১৬′	১″৪২′	২৩′	৩০′	২১′	×	×	
প্রাপ্ত মান	২	৩	৫	৩	৫	৪	৫	×	×	২৭

অভিক্ষার্থীর মূর্ত্ত বুদ্ধি — ৭

মন্তব্য :—মূর্ত্ত বুদ্ধির মান সাধারণতঃ (২৬ – ৭)—১৯ থেকে (২৬ + ৭)—৩৩ পর্য্যন্ত হয়। এখানে অভীক্ষার্থীর মূর্ত্ত বুদ্ধি সাধারণ।

৭। **সমস্যা :**—ডিয়ার বর্ণের ফর্ম বোর্ডের(Dear born's form Board) সাহায্যে অভীক্ষার্থীর মূর্ত্ত বুদ্ধির পরিমাপ করা।

মৌলিক তত্ত্ব :—নানাবিধ মূর্ত্তবস্তু নাড়াচাড়া করে যে বুদ্ধির প্রকাশ হয় তাকেই আমরা বলব মূর্ত্ত বুদ্ধি।

সাধারণ বিবরণ : পূর্বের ন্যায়

অভীক্ষার্থীর নাম, বয়স ইত্যাদি।

উপকরণ :—ডিয়ার বর্ণের ফর্ম বোর্ড, ৫টি নক্সাযুক্ত একটি চার্ট, স্টপওয়াচ ও স্কোর তালিকা।

ফর্মবোর্ডের বর্ণনা :—একটি চারকোনা কাঠের ওপর নানাপ্রকার জ্যামিতিক চিত্র খোদাই করা আছে। ঐ চিত্রে বসানো যায় এরূপ কতগুলি কাঠের ছকও আছে। ছকগুলি কাঠের খোদাই করা স্থানে ঠিকমত বসালে একটিও বাকী থাকে না, সব ধরে যায়। নক্সা আঁকা ৫টি সমস্যা আছে। ঐ সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে।

প্রণালী :—অভীক্ষক প্রথম নক্সাটি সমাধান করে অভীক্ষার্থীকে অভীক্ষা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবে। তারপর অভীক্ষক সে নক্সা অনুযায়ী বোর্ডটি সাজিয়ে দিয়ে অভীক্ষার্থীকে নির্দ্দেশ দেবে বাইরে রাখা ছক খোদাই করা অংশে রাখতে। যথা সম্ভব কম বার সরিয়ে এবং কম সময়ে এই কাজ করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে। অভীক্ষার্থী সমস্যাগুলি সমাধান করতে কত সময় নিয়েছে এবং প্রত্যেক সমস্যায় কতবার ছক সরিয়েছে অভীক্ষক লক্ষ্য করে লিখে রাখবে। তারপর স্কোর তালিকা দেখে নম্বর দেবে।

অভীক্ষার্থির প্রতি নির্দ্দেশ :—"আমি তোমাকে একটি সমস্যার সমাধান করে দেখিয়ে দেব। পরবর্তী সমস্যাগুলি তুমি সমাধান করবে। ছকগুলি যথা সম্ভব কম নাড়াচাড়া করবে এবং যত কম সময়ে পার করবে।"

অন্তর্দর্শন :—প্রথম ২টি সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি করেছিলাম। শেষের

গুলিতে সব গোলমাল হয়ে গেল। অনাবশ্যক ছক সরিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে সময়ও বেশী লাগল।

সমস্যা	ছক সরানোর সংখ্যা				স্কোর	সময় সেকেণ্ডে		স্কোর	নর্ম
	১	২	৩	৪		১+২	৩+৪		
	০	০	০	৮	৫	০–১০″	০– ২০″	৫	
	–	–	৯	৯	৪	১১–২০″	২১– ৪০″	৪	১৯ ± (σ)৫
	৩	৫	১০	১০–১১	৩	২১–৪০″	৪১– ৭০″	৩	
	৪	৪	১১–১৪	১৩–১৪	২	৪১–৭০″	৭১–১১০″	২	
	৫–৭	৭–১০	১৫–২০	১৫–২০	১	৭১–১২০″	১১১–১৮০″	১	

ফলাফল—

সমস্যা নং	সময় লেগেছে সেকেণ্ডে	ছক সরানোর সংখ্যা	স্কোর		মোট স্কোর
১	২৭ সেকেণ্ড	৩	৩	৩	
২	৮৭ "	৯	১	১	১৫
৩	১২৫ "	১৪	১	২	
৪	৬৮ "	১৮	৩	১	

মন্তব্য :—এই অভীক্ষায় সমবয়স্কদের সাফল্যের নম্বর হয় সাধারণতঃ ১৯ +৫=২৪ থেকে ১৯–৫=১৪। এখানে অভীক্ষার্থীর স্কোর ১৫। অতএব অভীক্ষার্থীর বুদ্ধি সাধারণ।